শিবহরি দত্ত

কোষ শারীরবৃত্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

কোষ শারীরবৃত্ত

[Cell Physiology]

অধ্যাপক শিব হরি দত্ত
এম. এস্. সি., এম. ফিল.
এস. এ জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

KOSH SHARIR BRITTA
By Sib Hari Dutta

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর—১৯৮২

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, নবম তল,
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
শ্রীজয়কৃষ্ণ ঘোষ
পাইওনীয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৭/এফ্ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

[সরকারী আনুকূল্যে প্রাপ্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

প্রচ্ছদ : কমল শেঠ

Published by Prof Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books & literature in regional languages at the University level by the Government of India in the Ministry of Education & Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

উৎসর্গ

স্বর্গত ডঃ শিব নারায়ণ চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাভাজনেষু

বিদ্যালয়ের আঙিনা ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগোনোর মুখেই আমরা টের পেয়ে যাই পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপারে আমরা কত দীন। ভারতীয় ভাষাগুলো ছাড়া সম্ভবতঃ আর কোন বিষয়েই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। আর যে কোন বিষয়েই উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ের কথা দূরে থাক, সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতেই আমাদের পড়াশুনো বিদেশী বইয়ের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল। কোন ভারতীয় ভাষায় তো নয়ই, এমনকি এখনো পর্য্যন্ত আমাদের যে উচ্চ শিক্ষার ভাষা ইংরাজী, সেই ইংরাজীতেও ভারতীয় লেখকরা বিচ্ছিন্ন দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া তেমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন নি। অথচ এমন দৈন্যদশা তো ভারতের ছিলো না। ভারতবর্ষ একদা বিদ্যাচর্চ্চার পীঠস্থান ছিলো। এদেশে জন্মেছিলেন কণাদ, আর্য্যভট্ট, চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন প্রভৃতি মহামনীষীরা। এঁরা কী গ্রীক-ল্যাটিনে ভাবতেন ? না। এরা ভাবতেন নিজের প্রাণের ভাষায় শিক্ষা দিতেন মুখের ভাষায়, লিখতেন নিজের ভাষায়। প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ তাইতো প্রায় সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছিলো। একই কথা খাটে অ্যারিস্টটল্, প্লেটো কিংবা সক্রেটিস বা কোপার্নিকাসের বেলা। 'ভিক্ষালব্ধ ধনে' কতই বা ধনী হওয়া যায় ? একথা আজ আমরা ভুলে গেছি।

তাই যদি দেখি ভারতীয় কোন বিজ্ঞানী উন্নততর বিদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্য্যাদা পাচ্ছেন আশ্চর্য হবার নেই। 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'। সমস্যাটা সাদা চামড়া কালো চামড়ার নয়। সমস্যাটা হল উন্নত আর অনুন্নত দুই মনুষ্য শ্রেণীর। জাতির উন্নতি ছাড়া ব্যক্তির উন্নতি মেকী। মস্তিষ্কের উন্নতিটাকে সারাদেহে চালান দিতে না পারলে তাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা চলে না।

বিদ্বানের কাজ কেবল বিদ্যাসৃষ্টি নয়, বিদ্যা বণ্টনও। আমরা দেখি বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ সুলেখক হন না, তার কারণ এই নয় তারা লেখনী ধারণে অপটু ; কারণ তারা এবিষয়ে মনোযোগ দেন না। কিন্তু এতো হবার কথা

নয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা যেমন বিদ্যাসৃষ্টি করতেন, তেমনি তৈরী করতেন একদল উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলী, আর নিজের ধ্যানধারণা লিপিবদ্ধ করে যেতেন নিজের ভাষাতেই। সঙ্গীতের ভাষায় যাকে বলে 'ঘরাণা', সেই এক একটি ঘরাণার মাধ্যমে বিদ্যার ক্রমবিকাশ ঘটতো। ভারতে এই ব্যাপারটি এখন প্রায় লুপ্ত।

আচার্য্য সত্যেন বোস এক সময় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তেন, বলতেন—যারা বলেন বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করা যায় না তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না। এতে খুব যে বৈপ্লবিক সাড়া কিছু মিলেছে তা কিন্তু নয়। তার কারণ হয়তো নানাবিধ। দীর্ঘদিন দেশ পরাধীন ছিলো। স্বকীয় চিন্তাধারার ধমনী প্রবাহ গেছে বদলে। আর স্বাধীনতার পরেও সরকারী বা বেসরকারী পর্য্যায়ে এনিয়ে ভাবনা চিন্তা বা প্রয়াস তেমন বিশেষ কিছু লক্ষিত হয় নি। কোন ধনশালী প্রকাশকও এগিয়ে আসেন নি ঝুঁকি নিতে। এত সব নিরুত্তাপ পরিবেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের প্রয়াস নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয়, তারা যে এগিয়ে এসেছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলায় গ্রন্থরাজি সৃষ্টি করতে তার জন্য অসংখ্য সাধুবাদ তাদের। এদের গ্রন্থ নির্বাচন পদ্ধতিও ভালো। লেখকের 'ওজন' মাপকাঠি নয়। মূল্যায়ণ সমিতি মূল্যায়ণ করেন পুস্তকের। এ পরীক্ষাটি কিঞ্চিৎ শক্ত এবং সময়সংহারী হলেও ভালো। নতুনদের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 'জীবাশ্মে' পরিণত হবার আগেই কিছু করার সুযোগ মেলে।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর গোড়াতেই আমার যে অনুভূতি হয়েছিলো, আর যে ছটফটানি আমায় দীর্ঘদিন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দেয় নি তার সামান্য প্রতিফলন আমার এ প্রয়াস। এ কাজে আমায় এগিয়ে দিয়েছেন যিনি, তিনি আমার মাস্টারমশাই ডঃ শিবনারায়ণ চক্রবর্তী; আর পথে চড়াই উৎরাইয়ে সাহায্য করেছেন যিনি তিনি স্বনামখ্যাত, রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানলেখক ডঃ তারক মোহন দাস। রচনা-উত্তর পর্বে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা বইটির উন্নতি বিধানে সাহায্য করেছে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ শৈলেশ চন্দ্র রায়। আর যার কিছু কিছু চিন্তাধারা পরোক্ষে আমার কাজে সহায়তা করেছে তিনি আমার গবেষণা-

নির্দেশক ডঃ সুধাময় ঘোষ। বইটির নামকরণের সমস্যা মিটিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' ডঃ ক্ষুদিরাম দাশ। এঁরা সকলেই আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।

পুস্তক পর্ষদের সকলের বিশেষতঃ বর্তমান মুখ্য প্রশাসন অধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতার সক্রিয় সহযোগিতা প্রশংসনীয়। বইটির ছবি এঁকেছেন শ্রীএস. মিত্র এবং প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রী কমল শেঠ। এঁদের কাছেও আমি ঋণী। খুব কম সময়ে বইটি যথাযথভাবে ছেপে দিয়ে পাইওনিয়ার প্রিণ্টিংস্-এর কর্মী বন্ধুরা এবং কর্তৃপক্ষ আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তবুও যদি কোন মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে থাকে তার সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার।

বইটির পাণ্ডুলিপি প্রেস-উপযোগী করতে এবং প্রুফ দেখার অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজে সহকর্মিনী হয়েছেন আমার স্ত্রী নমিতা দত্ত। কৃতিত্বের ভাগ তাই তারও প্রাপ্য।

সবশেষে বলি, বইটির উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা নানাবিধ। তার খানিকটাও পূরণ হলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

বিনীত—

গ্রন্থকার

মহালয়া, ১৩৮৯
করুণাময়ী এস্টেট
সল্টলেক, কলিকাতা।

সূচীপত্র

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

কোষ শারীরবৃত্ত হ'ল জীবকোষের গঠনশৈলী, ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে অনেক নতুন নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োগ এবং বিভিন্ন সুসমঞ্জস পরীক্ষা প্রণালীর উদ্ভাবনের ফলে কোষের গঠনশৈলী এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেড়েছে অনেক। একদিকে যেমন ইলেকট্রণ মাইক্রোসকোপ প্রোটোপ্লাজম এবং নানা কোষযন্ত্রের বিভিন্ন জটিলতা উন্মোচন করেছে, অন্যদিকে তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রাণ-রসায়ন বিদ্যা ও সাইটোলজী কোষীয় ক্রিয়াকলাপের জটিল দিকগুলি পরিষ্কার করেছে এবং গঠনশৈলীর সঙ্গে ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করেছে।

আমরা এখন জানি, ইউক্যারিওটিক কোষের আভ্যন্তরীণ গঠনশৈলী খুবই সুনির্দিষ্ট এবং সুগঠিত। কোষ আধাপ্রবেশ্য প্লাজমা পর্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত—এই পর্দাই কোষ এবং তার পরিবেশের মধ্যে বস্তু সমূহের আসাযাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। কোষাভ্যন্তর এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকার নমনীয় পর্দাতন্ত্র দ্বারা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে বিভক্ত থাকে। বিভিন্ন কোষীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত এনজাইম, কোএনজাইম এবং অন্যান্য 'পদার্থ' সমূহ পর্দাঘেরা বিভিন্ন কোষযন্ত্রে বিদ্যমান থাকে।

কোষের সকল অঙ্গের মধ্যে নিউক্লিয়াসই মুখ্য। কেননা বংশধারাগত বার্তা এই নিউক্লিয়াসেই ডি এন এ-র নিউক্লিওটাইড পর্য্যায়ক্রমের মধ্যে নিহিত থাকে; আর আছে এক সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া প্রণালী যার সাহায্যে প্রয়োজনীয় জেনেটিক বার্তা 'বার্তাবহ আর এন এ'-তে রূপান্তরিত হতে পারে। এই বার্তাবহ আর এন এ-র সাহায্যেই সাইটোপ্লাজমে প্রোটিন সংশ্লেষণ নিউক্লিয়াস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

স্বনির্ভর ইউক্যারিওটিক কোষের সালোক সংশ্লেষী ক্লোরোপ্লাস্টও সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জীবজগতে শক্তি ব্যবহারের সমগ্র প্রক্রিয়াটিই নির্ভর করছে সালোক সংশ্লেষের উপর। ক্লোরোপ্লাস্টের সুগ্রন্থিত পর্দাসমূহে

বিভিন্ন এনজাইম এবং ক্লোরোফিলের উপস্থিতি অজৈব কার্বনডাই অক্সাইড এবং জল থেকে কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণের মাধ্যমে আলোকশক্তি বিধৃত হতে সাহায্য করছে। কোষীয় ক্রিয়াকলাপ সমূহ সম্পন্ন করতে শক্তি চাই ; তাই সকল কোষেরই চাই শ্বাসক্রিয়ায় ইন্ধন যোগাতে সক্ষম এমন পদার্থ সকল। যে সকল কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট নেই, অর্থাৎ যারা সালোক সংশ্লেষ করতে পারে না তাদের জন্য বাইরের কোনো অটোট্রফিক উৎস থেকে রেসপিরেটরী সাবস্ট্রেট সমূহ অবশ্যই পাওয়া চাই।

শ্বাসক্রিয়া সংঘটিত হয় মূলতঃ **মাইটোকনড্রিয়ায়**। বহুতর পর্য্যায় বিশিষ্ট এই জারণ মূলক শ্বাসক্রিয়া বিভিন্ন জটিল জৈব যৌগ সমূহের অভ্যন্তরে নিহিত রাসায়নিক শক্তি নির্মুক্ত করে আর কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য কোষীয় জ্বালানী সমূহকে রূপান্তরিত করে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলে। এই প্রক্রিয়ায় নির্মুক্ত শক্তি 'শক্তি মুদ্রা' এ টি পি র শক্তি সমৃদ্ধ যোজকে বিধৃত হয়, যা কিনা সহজেই বিভিন্ন কোষীয় ক্রিয়াকলাপে ব্যবহার করা চলে।

অতিকায় জৈব অণুসমূহের বিভঞ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্র . বিশ্লেষণী এনজাইম সমূহের আধার হল **লাইসোজোম**। এই সকল এনজাইম বিশেষ ধরণের পর্দার সুরক্ষিত অভ্যন্তরে নিহিত থাকে, নইলে কোষ নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করে ফেলতো। তবে এই এনজাইমগুলির সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষরণ কোষের জীর্ণ ও অব্যবহার্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের অপসারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর পিনোসাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে যে বস্তু সকল তাদের পরিপাকেও এরা কার্যকরী হয়।

ঝিল্লীময় কোষযন্ত্র **গলজি অ্যাপারেটাস**-এর কাজ হল প্রোটিন ও পলিস্যাকারাইডের গ্রন্থনা, সঞ্চয় এবং ক্ষরণ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু জটিল পলিস্যাকারাইডের সংশ্লেষণের সঙ্গেও গলজি অ্যাপারেটাস যুক্ত।

কোষের পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং মেরামত কার্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরণের প্রোটিন দরকার ; আর প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ অনুঘটিত করে যে এনজাইম সমূহ তারাও প্রোটিন। তাই **প্রোটিন সংশ্লেষণ** কোষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজ নিয়ন্ত্রিত করে নিউক্লিয়াসে নিহিত **জেনেটিক সংকেত**। আর প্রোটিন সংশ্লেষণ সংঘটিত হয় সাইটোপ্লাজমের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

রাইবোজোম দানার উপর। যখন কোন প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, ডি এন এ নিহিত জেনেটিক নির্দেশের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু মুদ্রিত হয়ে যায় বার্তাবহ আর এন এ-তে এবং বার্তাবহ আর এন এ নিউক্লিয়াস ত্যাগ করে চলে যায় সাইটোপ্লাজমে, প্রোটিন সংশ্লেষণের অকুস্থলে। সেখানে রাইবোজোমীয় আর এন এ-র সহায়তায় বার্তাবহ আর এন এ যথাযথ রূপে অবস্থিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য ছাঁচ রূপে কাজ করে। এইবার অ্যামিনো অ্যাসিডদের বার্তাবহ আর এন এ টেমপ্লেটের (ছাঁচের) উপর এক এক করে ঠিক ঠিক স্থানে এনে হাজির করে দেয় ট্রান্সফার আর এন এ। প্রোটিন সংশ্লেষণের এই পদ্ধতিটি খুবই সুনিয়ন্ত্রিত এবং ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। অন্তঃকোষীয় প্রয়োজনে প্রোটিন সাইটোপ্লাজমের মুক্ত রাইবোজোম দানার উপর সংশ্লেষিত হয়। কিন্তু অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে যে প্রোটিন তা সংশ্লেষিত হয় অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার রাইবোজোমে এবং সংশ্লেষণের পর তা এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার মাধ্যমে গল্‌জি অ্যাপারেটাসে স্থানান্তরিত হয়। শেষোক্ত স্থানে যথোপযুক্ত গ্রন্থনার পর প্রোটিন বিশেষ কাজে অন্যত্র প্রেরিত হতে পারে।

কোষীয় ক্রিয়াকলাপ সমূহ নীচে একনজরে দেখে নেওয়া যাক ঃ

সরলতর অজৈব পদার্থ সমূহ
↓ সালোক সংশ্লেষ
জৈব পদার্থ সমূহ (কোষের খাদ্য)
শ্বাসক্রিয়ায় ↓ ভেঙ্গে গিয়ে উৎপন্ন করে
শক্তি
↓ এই শক্তি নানান
কাজ করে। যেমন,

(এক) **জৈব সংশ্লেষণ ঃ**
সকল কোষই কম বেশি পরিমাণে নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন এবং কোষীয় গঠন ও ক্রিয়াকলাপের জন্য অপরিহার্য জৈব পদার্থ সকল তৈরী করে।

(দুই) **সংজনন ঃ** প্রায় সকল নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নিজের প্রতিলিপি গঠন করতে পারে। এই কোষ বিভাজন দুই প্রকার ঃ মাইটোসিস—সাধারণ দেহকোষ বিভাজন এবং মিয়োসিস—জনন কোষ বিভাজন।

(তিন) **বিশেষ ক্রিয়াসমূহ ঃ** কোষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হতে পারে।

(ক) আকার পরিবর্তন, যেমন পেশীকোষের সংকোচন বা ক্ষণপদ সৃষ্টি

(খ) পদার্থের পরিবহন

(গ) স্নায়ু তাড়নার প্রেরণ

(ঘ) আলোক প্রভা উৎপাদন

(ঙ) বৈদ্যুতিক তাড়নার সৃষ্টি

(চ) হাড়, মোম ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের গঠন

(ছ) অন্যান্য বিশেষ ক্রিয়া।

ইলেকট্রণ মাইক্রোস্কোপের সুবাদে আমরা কোষের গঠনশৈলী বিস্তারিত ভাবেই জানতে পেরেছি, কিন্তু কোষে নিরন্তর যে সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে তা অনুধাবন করাই অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। কোষ খুবই **কর্ম চঞ্চল**—এর পুনর্গঠন ও মেরামতির কাজও চলছে অনবরত। পর্দাসমূহও খুবই দ্রুতলয়ে পরিবর্তিত ও পুনর্গঠিত হচ্ছে, এরা আবার নমনীয়ও বটে। মাইটোকন্ড্রিয়াও আকার পরিবর্তন করে এবং বিভাজিত হয় নিরন্তর। কোষীয় শক্তির প্রয়োজনে যকৃত কোষে এরা খুবই সক্রিয়ভাবে নিজেদের প্রতিলিপি তৈরী করে। আলোর অভাবে সালোক সংশ্লেষী কোষ সমূহ তাদের ক্রিয়া তৎপরতা সাময়িক ভাবে হারিয়ে ফেলে বটে, কিন্তু আলোর উপস্থিতিতে এরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। কোষের এই সদাসক্রিয় স্বভাব কোষকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।

পরবর্তী দশটি অধ্যায়ে কোষীয় ক্রিয়াকলাপের এই সুসংহত রূপটি যতদূর সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবকোষ ঃ গঠনশৈলী ও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

জীবকোষই দেহ গঠনের একমাত্র উপাদান ও জৈবনিক ক্রিয়ার একান্ত আধার। কোষের গঠন এবং কার্যাবলী—কোষপর্দা এবং আস্রাবণ পরিবেশ—সক্রিয় পরিবহন—পিনোসাইটোসিস এবং ফ্যাগোসাইটোসিস।

জীবদেহের ক্ষুদ্রতম অংশ তথা মূল উপাদান হল কোষ। একটি বাড়ী যেমন অজস্র ইটের সাহায্যে তৈরী, তেমনি সব জীবদেহ সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। বস্তুতঃ, জীবকোষই দেহ গঠনের একমাত্র উপাদান ও জৈবনিক ক্রিয়ার একান্ত আধার। এ প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের উক্তি স্মরণীয়—All animals and plants, however complicated, are constituted by few elements which are repeated in each one of them. প্রাণী এবং উদ্ভিদ, এদের গঠন যতই জটিল হোক না কেন, এদের পরস্পরের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন প্রত্যেকেই কতিপয় নির্দিষ্ট পুনরাবৃত্তিমূলক গঠনগত একক দ্বারা গঠিত। অ্যারিস্টটলের এই বক্তব্যের সত্যতা প্রায় আঠারো শ বছর বাদে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর প্রমাণিত হয়। রবার্ট হুক নিজের উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বোতলের ছিপি হিসেবে যে কর্ক (cork) বা শোলা ব্যবহৃত হয় সেই শোলার গঠন পরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে শোলা একই ধরণের অনেকগুলি ছোট ছোট 'কক্ষ' দ্বারা সৃষ্ট। এই কক্ষগুলোকে তিনি 'কোষ' বা 'সেল' (cell) বলে অভিহিত করেন। তিনি যে শোলা পরীক্ষা করেছিলেন তা হ'ল মৃত গাছের অংশ। সুতরাং জীবিত কোষে যে সমস্ত বস্তু থাকে সেগুলো তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। কোষের মৃত প্রাচীরগুলিই তিনি সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেন। তবে একথা সত্যি যে তিনিই 'কোষ' বা 'সেল' কথাটির স্রষ্টা।

রবার্ট হুকের পর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের গঠনের একক হিসেবে কোষকে চিহ্নিত করতে প্রায় দেড়শো বছর লেগে যায়। রবার্ট হুক কোষ প্রাচীরের দিকেই লক্ষ্য করেন। কোষ প্রাচীরের ভেতরে যে সমস্ত উপাদান আছে সে সম্পর্কে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহগঠনে কোষের সার্বজনীনতা স্বীকৃত হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন অর্কিডের (Orchid) কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতির কথা বলেন এবং নিউক্লিয়াসের বর্ণনা দেন। আর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডুজার্ডিন (Dujardin) কোষের ভেতরকার জেলীর মতো থকথকে পদার্থটিকে 'সারকোড' (Sarcode) আখ্যা দেন। পরে হুগো ফন মোল (Hugo Von Mohl) সারকোড কথাটির পরিবর্তে 'প্রোটোপ্লাজম' (Protoplasm) শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে কারো কারো মতে পারকিনজিই (Purkinjie) প্রথম প্রোটোপ্লাজম কথাটি ব্যবহার করেন। সে যাই হোক, কোষই যে জীবনের ক্রিয়াগত ও গঠনগত একক একথা প্রথম বলেন দুই জার্মান বিজ্ঞানী স্লাইডেন (Schleiden) এবং সোয়ান (Schwann)—এরাই তাই কোষবিদ্যার জনক হিসাবে স্বীকৃত।

কোষের নানা প্রকারভেদ আছে। আকৃতি, আয়তন আর ক্রিয়াকলাপে আছে অনেক বিভিন্নতাও। কিন্তু ওদের অধিকাংশেরই অন্তঃকোষীয় গঠন-প্রণালী (intracellular organisation) মোটামুটি একই ধরণের। কোষের অন্তঃস্থলে আছে একটি নিউক্লিয় আবরণী (nuclear membrane) বেষ্টিত কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস (ব্যাকটিরিয়া এবং নীলাভ-সবুজ শৈবালে এই নিউক্লিয় আবরণী থাকে না)। আর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আছে এক তরল জৈব পদার্থ (cytoplasm) ; কোষের একেবারে বহির্ভাগে এই জৈব পদার্থ বা সাইটোপ্লাজম-কে বেষ্টন করে আছে কোষ-আবরণী বা সেল মেমব্রেণ (cell membrane)। নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমে রয়েছে আবার অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জৈব কণা। 'সাধারণ কোষ' আলোচনার সময় এদের কথা বলবো।

অসংখ্য প্রকারের সব কোষের অগণিত বৈচিত্র্যের মাঝেও কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই প্রাণরাসায়নিক পর্যায়ে কোষীয় গঠনভঙ্গিমা এবং ক্রিয়াকলাপে একের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্যই পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। এই জন্য বিভিন্ন প্রকার

কোষের বিভিন্নতা আলোচনার পূর্বে একটি কাল্পনিক সাধারণ কোষের (a mythical generalised cell) গঠন কাঠামো আলোচনা অধিকতর সঙ্গত।
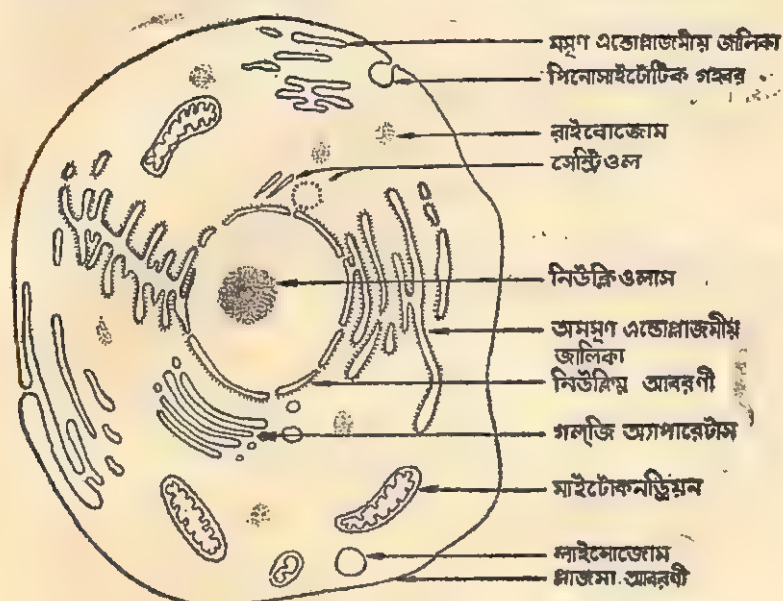
চিত্র ১-১

একটি সাধারণ ইউক্যারিওটিক কোষের প্রতিচিত্র ঃ ইলেকট্রন মাইক্রোস্‌কোপে দৃশ্য কোষীয় সাধারণ উপাদানসমূহ

একটি সাধারণ কোষ নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ দ্বারা গঠিত (চিত্র ১-১), যার প্রায় প্রতিটিই বিশেষ কোনো প্রকার বাস্তব কোষে বিদ্যমান।

১। কোষ প্রাচীর (cell wall)—মুখ্যতঃ, ছত্রাক, ব্যাক্‌টিরিয়া এবং উদ্ভিদ কোষে থাকে।

২। প্লাজমা আবরণী (plasma membrane)

৩। সাইটোপ্লাজম (cytoplasm), এতে আছে ঃ

(ক) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (endoplasmic reticulum, ER)

(খ) গল্‌জি অ্যাপারেটাস (golgi apparatus)

(গ) মাইটোকন্‌ড্রিয়া (ঙ) রাইবোজোম

(ঘ) ক্লোরোপ্লাস্ট (চ) লাইসোজোম

(ছ) সেণ্ট্রিওল (centrioles) (ঝ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা (granules)
(জ) ভ্যাকুওল (vacuoles) (ঞ) সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নলাকৃতি ও তন্তু-আকৃতি পদার্থসমূহ (microtubules & microfilaments)

৪। কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস, এতে আছে ঃ

(ক) নিউক্লিয় আবরণী (nuclear membrane)
(খ) নিউক্লিওলাস (nucleolus)
(গ) ক্রোমোজোম (chromosome) বা বংশবীজ

কোষীয় উপাদান সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী সারণী ১-১-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সারণী ১-১ ঃ

উপাদান	আকার এবং আয়তন	অবস্থিতি	ক্রিয়াকলাপ
কোষপ্রাচীর	নানারকম	প্লাজমা আবরণীর বাইরের দিকে, থাকে মূখ্যতঃ উদ্ভিদ কোষে	ধারণ ও রক্ষণ এবং বিশেষ ক্রিয়াসমূহ।
প্লাজমা আবরণী	লিপোপ্রোটিন একক, ৮-১০ n.m. পুরু	কোষের বাইরের দিকে, থাকে সব কোষেই	কোষের সীমা নির্দেশ-কারী পর্দা, কোষাভ্যন্তরে এবং কোষ থেকে বাইরে পদার্থ সমূহের যাতা-য়াত নিয়ন্ত্রণ করে।
এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা	লিপোপ্রোটিন দিয়ে গঠিত ; (ক) মসৃণ জালিকা, কোনো রাইবোজোম নেই	সাইটোপ্লাজমের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে	অনেক এনজাইম রয়েছে এতে, জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপযুক্ত স্থল ; কোষের অনেক f : নির্বাহ করে। মসৃণ

	(খ) অমসৃণ জালিকা—এতে রাইবোজোম আছে		জালিকা স্টেরয়েড সংশ্লেষণ আর অমসৃণ জালিকা প্রোটিন সংশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত।
গল্‌জি অ্যাপারেটাস	পর্দাবিশিষ্ট থলে আকৃতি পদার্থের গাদা, নানা আকারও আয়তনের	সাইটোপ্লাজমে	জটিল পলিস্যাকারাইড সমূহের সংশ্লেষণ, পলিস্যাকারাইড ও প্রোটিনের সঞ্চয়করণ
মাইটো কন্‌ড্রিয়ন	কাবাব আকৃতি আয়তন ঃ ~500 × 2000 n.m.	সাইটোপ্লাজমে, স্বল্প সংখ্যক থেকে প্রায় হাজার পর্যন্ত	কোষের 'শক্তির আগার' (power house of cell) কার্বোহাইড্রেট বিভঞ্জন করে শক্তি নির্মুক্ত করে।
ক্লোরোপ্লাস্ট	ডিম বা চাক্‌তির মতো, 5000 থেকে 10,000 n.m. ব্যাস	সবুজ উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে,	সালোক সংশ্লেষের অকুস্থল, সৌরশক্তি ক্লোরোফিল কর্তৃক বিধৃত হয়ে CO_2 এবং জল থেকে কার্বো-হাইড্রেট তৈরী করে।
রাইবোজোম	গোলাকার, ব্যাস 20—25 n.m.	সাইটোপ্লাজমে, কখনো কখনো অমসৃণ এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়	প্রোটিন সংশ্লেষণের অকুস্থল
লাইসোজোম	গোলাকার ~500 n.m. ব্যাস	অনেক কোষের সাইটোপ্লাজমে	পাচক এনজাইম সমূহের (digestive enzymes) আধার

সেণ্ট্রিওল	জটিল, দণ্ডাকৃতি, 400 n. m. লম্বা, ব্যাস প্রায় 200 n. m.	প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে নিউক্লিয় পর্দার কাছাকাছি সেণ্ট্রিওল যুগলের সদস্যরা একে অন্যের সাথে সমকোণে অবস্থান করে।	কোষ-বিভাজনের সময় সেণ্ট্রিওল যুগলের উভয়েই নিউক্লিয় স্পিণ্ডলের (nuclear spindle) একটি মেরু (pole) গঠন করে।
ভ্যাকুওল	নানাপ্রকার	উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমেই এর অবস্থান সুস্পষ্ট।	টার্গিডিটি (turgidity) রক্ষা করা এবং খাদ্যদ্রব্য বা বর্জ্য পদার্থ ধারণ
গ্র্যানুলস্ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা)	নানাপ্রকার	সাইটোপ্লাজমে	নানারকম, মুখ্যতঃ সঞ্চয় এবং এবং রেচনে অংশ নেয়
মাইক্রোটিউবুলস্ এবং ফিলামেণ্টস্	নলাকৃতি এবং তন্তু আকৃতি গড়ন, 5 থেকে 20 n. m. ব্যাস	সাইটোপ্লাজমে	নানা প্রকার
নিউক্লিয় আবরণী	দুই-একক বিশিষ্ট পর্দা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে তাতে	নিউক্লিয়াস ঘিরে থাকে	নিউক্লিয়াসের ভেতরে ও বাইরে পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে।
নিউক্লিওলাস	গোলাকার ঘনবস্তু, কোন পর্দা দ্বারা বেষ্টিত নয়	প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে একটিথেকে চারটি থাকে	r-RNA সংশ্লেষণের স্থান

বংশগতি বাহক পদার্থ	সূক্ষ DNA-স্ট্র্যান্ড রূপে ছড়ানো থাকে. কখনো বা জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকে	নিউক্লিয়াসে	ডি এন এ-র জেনেটিক সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষণ করে কোষীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

গঠনানুসারে কোষকে মোটামুটি ভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—প্রোক্যারিওটিক কোষ (procaryotic cells) এবং ইউক্যারিওটিক কোষ (eucaryotes)। ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল ইত্যাদি সরলতর জীবের কোষ হ'ল প্রোক্যারিওটিক পর্যায়ভুক্ত। এদের বংশবীজ নিউক্লিয় আবরণী দ্বারা বেষ্টিত নয়, পর্দা-ঘেরা কোষযন্ত্র সমূহও (membrane-bounded organelles) এদের থাকে না এবং এই কোষ সমূহ সাধারণতঃ দৃঢ় কোষ-প্রাকার দ্বারা আবৃত থাকে।

ছত্রাক, প্রোটোজোয়া এবং উচ্চতর উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষসমূহ ইউক্যারিওটিক শ্রেণীভুক্ত। এদের নিউক্লিয় আবরণী আছে, আছে সাইটোপ্লাজমীয় 'কোষযন্ত্র সমূহও—সাধারণ কোষের সাহায্যে এদের মোটামুটি বর্ণনা করা যায়। প্রোক্যারিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক এই দুই শ্রেণীর কোষের একটি তুলনা-মূলক আলোচনা সারণী ১-২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ১ ২ ঃ

কোষীয় উপাদান	প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
নিউক্লিয়াস	নিউক্লিয় আবরণী নেই, হিস্টোন (histone) বিহীন এক বা একাধিক ভাঁজ করা DNA স্ট্র্যান্ড দিয়ে বংশবীজ গঠিত।	নিউক্লিয় আবরণী আছে. বংশগতি বাহক পদার্থ একাধিক ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত। DNA হিস্টোন যুক্ত।

কোষ-প্রাকার	ক্ষুদ্রতম শ্রেণীর প্রোক্যারিওট ছাড়া সকল প্রোক্যারিওটিক কোষেই কোষ-প্রাকার আছে।	নানারকম, পরিবর্তনশীল
প্লাজমা-আবরণী	আছে	আছে
এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা	নেই	সব ইউক্যারিওটেই আছে
কোষযন্ত্র সমূহ (ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকনড্রিয়ন, ইত্যাদি)	পর্দা-ঘেরা কোষ-যন্ত্র এদের নেই	আছে
সালোক-সংশ্লেষ যন্ত্র	থাকতে পারে, ক্লোরোফিলও থাকতে পারে ; কিন্তু কখনই পর্দা-ঘেরা নয়	ক্লোরোপ্লাস্টরূপে বর্তমান থাকতে পারে
রাইবোজোম	সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় থাকে	সাইটোপ্লাজমে মুক্তাবস্থায় বা এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকার সঙ্গে যুক্তাবস্থায় বর্তমান
সেণ্টিওল	নেই	প্রাণিকোষে আছে।
ফ্লাজেলা (flagella)	কখনও কখনো থাকে, একটি একক তন্তু দিয়ে গঠিত।	কখনো কখনো থাকে, বিশেষ আকৃতির ন'টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলাকৃতি বস্তু চোঙে সজ্জিত অবস্থায়
আয়তন	100 থেকে 2000 n.m.	দশ হাজার থেকে এক লক্ষ n.m.

উচ্চতর জীবের ইউক্যারিওটিক কোষ আবার দুশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যথা, উদ্ভিদকোষ (plant cell) এবং প্রাণিকোষ (animal cell)। সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর এবং ক্লোরোপ্লাস্ট যাদের আছে তারা হল উদ্ভিদ কোষ,

আর এই দুইই যাদের নেই তারা হল প্রাণিকোষ। সাধারণতঃ, উদ্ভিদকোষ ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে অটোট্রফিক (autotrophic) শ্রেণীভুক্ত অথবা এমন কোনো বহুকোষী জীবের (multicellular organism) অংশ, যার বিশেষ ধরণের সালোকসংশ্লেষ যন্ত্র আছে এবং এর ফলে জীবটি অটোট্রফিক জীবরূপে জীবনধারণ করতে পারে। প্রাণিকোষে সালোকসংশ্লেষ যন্ত্র থাকে না, ফলে এরা সর্বদাই হেটারোট্রফিক শ্রেণীভুক্ত। সারণী ১-৩ এ উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

সারণী ১-৩ :

কোষীয় উপাদান	উদ্ভিদ কোষ	প্রাণি কোষ
কোষ প্রাচীর	সেলুলোজ কোষ প্রাকার সাধারণতঃ বিদ্যমান।	কোষ প্রাকার কখনো কখনো থাকে কিন্তু সেলুলোজ দিয়ে তৈরী নয়।
ক্লোরোপ্লাস্ট	সালোকসংশ্লেষীয় কোষ-সমূহে (Photosynthetic cells) বিদ্যমান	নেই
ভ্যাকুওল	প্রায়শঃই আকারে বেশ বড়ো, পরিণত কোষে বিশেষভাবেই সুস্পষ্ট এবং কোষের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ দখল করে থাকে। টোনোপ্লাস্ট (tono-plast) পর্দা দ্বারা বেষ্টিত।	সাধারণতঃ থাকে না, আর থাকলেও ক্ষুদ্রায়তন
সেন্ট্রিওল	শৈবাল কোষে দেখা যায়, কিন্তু উচ্চতর উদ্ভিদ কোষে থাকে না	বিদ্যমান

কোষ-প্রাকার	ক্ষুদ্রতম শ্রেণীর প্রোক্যারিওট ছাড়া সকল প্রোক্যারিওটিক কোষেই কোষ-প্রাকার আছে।	নানারকম, পরিবর্তনশীল
প্লাজমা-আবরণী	আছে	আছে
এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা	নেই	সব ইউক্যারিওটেই আছে
কোষযন্ত্র সমূহ (ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকনড্রিয়ন, ইত্যাদি)	পর্দা-ঘেরা কোষ-যন্ত্র এদের নেই	আছে
সালোক-সংশ্লেষ যন্ত্র	থাকতে পারে, ক্লোরোফিলও থাকতে পারে ; কিন্তু কখনই পর্দা-ঘেরা নয়	ক্লোরোপ্লাস্টরূপে বর্তমান থাকতে পারে
রাইবোজোম	সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় থাকে	সাইটোপ্লাজমে মুক্তাবস্থায় বা এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকার সঙ্গে যুক্তাবস্থায় বর্তমান
সেণ্টিওল	নেই	প্রাণিকোষে আছে।
ফ্লাজেলা (flagella)	কখনও কখনো থাকে, একটি একক তন্তু দিয়ে গঠিত।	কখনো কখনো থাকে, বিশেষ আকৃতির ন'টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলাকৃতি বস্তু চোঙে সজ্জিত অবস্থায়
আয়তন	100 থেকে 2000 n.m.	দশ হাজার থেকে এক লক্ষ n.m.

উচ্চতর জীবের ইউক্যারিওটিক কোষ আবার দুশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যথা, উদ্ভিদকোষ (plant cell) এবং প্রাণিকোষ (animal cell)। সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর এবং ক্লোরোপ্লাস্ট যাদের আছে তারা হল উদ্ভিদ কোষ,

আর এই দুইই যাদের নেই তারা হল প্রাণিকোষ। সাধারণতঃ, উদ্ভিদকোষ ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে অটোট্রফিক (autotrophic) শ্রেণীভুক্ত অথবা এমন কোনো বহুকোষী জীবের (multicellular organism) অংশ, যার বিশেষ ধরণের সালোকসংশ্লেষ যন্ত্র আছে এবং এর ফলে জীবটি অটোট্রফিক জীবরূপে জীবনধারণ করতে পারে। প্রাণিকোষে সালোকসংশ্লেষ যন্ত্র থাকে না, ফলে এরা সর্বদাই হেটারোট্রফিক শ্রেণীভুক্ত। সারণী ১-৩ এ উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

সারণী ১-৩ ঃ

কোষীয় উপাদান	উদ্ভিদ কোষ	প্রাণি কোষ
কোষ প্রাচীর	সেলুলোজ কোষ প্রাকার সাধারণতঃ বিদ্যমান।	কোষ প্রাকার কখনো কখনো থাকে কিন্তু সেলুলোজ দিয়ে তৈরী নয়।
ক্লোরোপ্লাস্ট	সালোকসংশ্লেষীয় কোষ-সমূহে (Photosynthetic cells) বিদ্যমান	নেই
ভ্যাকুওল	প্রায়শঃই আকারে বেশ বড়ো, পরিণত কোষে বিশেষভাবেই সুস্পষ্ট এবং কোষের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ দখল করে থাকে। টোনোপ্লাস্ট (tono-plast) পর্দা দ্বারা বেষ্টিত।	সাধারণতঃ থাকে না, আর থাকলেও ক্ষুদ্রায়তন
সেন্ট্রিওল	শৈবাল কোষে দেখা যায়, কিন্তু উচ্চতর উদ্ভিদ কোষে থাকে না	বিদ্যমান

কোষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ :

পুষ্টি ও বৃদ্ধির প্রয়োজনে কোষকে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব খাদ্যদ্রব্য, অক্সিজেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ গ্রহণ করতে হয় আর বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ বের করে দিতে হয়। বিশেষ নির্বাচনী ক্ষমতাসম্পন্ন পর্দা 'সেল মেম্ব্রেণ' বিভিন্ন পদার্থের আগমনির্গম নিয়ন্ত্রণ করে কোষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখে। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলোর সাহায্যে কোন পদার্থ কোষে প্রবেশ করতে পারে বা কোষ থেকে নির্গত হতে পারে :

(ক) ব্যাপন ক্রিয়া ও আস্রাবণ (খ) সক্রিয় পরিবহন এবং (গ) পিনো-সাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস।

এখন কোষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত এই বিষয় কটি নিয়ে আলোচনা করবো।

কোষ আবরণী ও আস্রাবণ পরিবেশ (Cell membrane and the osmotic environment) :

উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ ও পুষ্টির মাধ্যমে কোষ প্রথমে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং পরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে (জনক কোষের সাথে আপাত সদৃশ) দুটি অপত্য কোষের (daughter cell) সৃষ্টি করে। তবে, খাদ্যদ্রব্য কাছে থাকার অর্থ এই নয় যে জীব (organism) তা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা, এজন্য বস্তুটিকে প্রথমতঃ কোষ প্রাকার অতিক্রম করে যেখানে (যে দেহযন্ত্রে) কোষের উপাদানসমূহ সংশ্লেষিত হয় সেখানে পেঁছোতে হবে। কোষের খাদ্য এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু (waste) দুই-ই কোষাবরণীর মাধ্যমে যাতায়াত করে। কোষাবরণী অতিক্রমকারী এই সকল বস্তুকে তাই কোষের অন্তর্গত তরল পদার্থে (fluid-এ) বা কোষের প্রোটোপ্লাজমে নির্দিষ্ট মাত্রায় অবশ্যই দ্রবণীয় হতে হবে। দ্রবীভূত বস্তু সকল আবার সমান দক্ষতায় (with equal ease) কোষাবরণী অতিক্রম করতে পারে না। কারণ, কোষাবরণীর একটা নিজস্ব গ্রহণ বর্জনের ক্ষমতা আছে। এবং এই নির্বাচন করবার ক্ষমতার উপর কোষের জীবন একান্তভাবে নির্ভর করে। এক কথায়, কোষাবরণী জীবকোষের দৌবারিক বা প্রহরী স্বরূপ। কোষাবরণীই কোষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের

প্রধান নিয়ামক। তবে কোষের অন্যান্য উপাদান, যথা—নিউক্লিয়াস, মাইটো-কনড্রিয়া, মাইক্রোজোমস্ ইত্যাদিরও নির্বাচনী ক্ষমতা সম্পন্ন (selective) আবরণী আছে যা ওদের নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই সকল আবরণীর ভেদ্যতা (permeability) আবার কতকগুলি প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল, যেমন—হরমোণ (hormones), আয়নীয় পরিবেশ (ionic environment), বিপাকীয় শক্তি (metabolic energy), অম্লতা, তাপাংক, ইত্যাদি। দুটি ভিন্ন দ্রবণকে আগম নির্গম নিয়ামক বিশেষ নির্বাচনক্ষম পর্দা (selectively permeable membrane) দ্বারা পৃথক করলে সর্বদাই এক দ্রবণ চাপের (osmotic pressure) উদ্ভব হয়। এই জন্য প্রতিটি কোষকেই দ্রবণ চাপের এক একটি একক (osmotic unit) বলা চলে। কেননা, বাইরের দ্রবণ আর কোষের ভিতরকার প্রোটোপ্লাজম সর্বদাই এক একটি বিশেষ নির্বাচনক্ষম আবরণী দ্বারা পৃথকীকৃত ; এবং প্রচুর পরিমাণ জল অনবরত আবরণীর মধ্য দিয়ে কোষে প্রবেশ করে এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ দ্রবীভূত পদার্থ একই ভাবে কোষ থেকে নির্গত হয়। দ্রবণ চাপের জটিল প্রক্রিয়া (osmosis) বিশ্লেষণের আগে একক দ্রবণে (single solution) অণুর স্বতঃস্ফূর্ত গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা দরকার।

দ্রবণের কণাগুলো সর্বদাই উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। দ্রব ও দ্রাবকের মিশ্রণে কণাগুলির এই অবিরাম ছুটাছুটির ফলে দ্রবটি দ্রুত মিশ্রণের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে যতক্ষণ না মিশ্রণটি সমসত্ত্ব দ্রবণে পরিণত হয় ; অর্থাৎ দ্রবের ঘনত্ব দ্রবণের সর্বাংশে সমান হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ব্যাপন ক্রিয়া (diffusion) এবং এই ব্যাপন ক্রিয়া দ্রবণের কণাগুলির অবিরাম গতির জন্যই সম্ভব হয়ে থাকে। দ্রবণের উপাদান-কণাগুলির (দ্রব এবং দ্রাবক উভয়েরই) এই অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি ওদের গতীয় শক্তির (kinetic energy) বহিঃপ্রকাশ। আধার গাত্রের সংগে অনবরত ঠোকাঠুকির ফলে আধেয় কণা-গুলির গতি মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন একটি বিশেষ কণার গতি সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না ঠিকই, কিন্তু পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দ্রবণের প্রত্যেক প্রকার কণার গতি সামগ্রিকভাবে (mass movement) বলা সম্ভব। কেননা, এই গতি (mass movement) ব্যাপন ক্রিয়ার মূল-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নীতি অনুসারে, দ্রবণের কণাগুলো বেশী

ঘনত্ব ছেড়ে সর্বদা কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয় এবং এই ব্যাপন ক্রিয়া (diffusion) চলতে থাকে যতক্ষণ না দ্রবণের সর্বাংশে উপাদানগুলির ঘনত্ব সমান হয়।

দ্রবণের কোন একটি উপাদানের ব্যাপন ক্রিয়া (diffusion) কোন দিকে হবে তা নির্ণয়ের জন্য প্রতিটি উপাদানেরই আপেক্ষিক ঘনত্ব (দ্রবণের প্রতি একক আয়তনে কণার সংখ্যা) জানা দরকার। একই স্থানে একাধিক বস্তু ঠেসাঠেসি ভাবে থাকতে পারে না। দ্রবণে কোন একটি উপাদানের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে অন্যান্য উপাদান গুলির কণা অবশ্যই তুল্যহারে স্থানচ্যুত হবে। কাজেই দ্রবণে যখন দ্রবের (solute) সামগ্রিক ঘনত্ব অধিক তখন দ্রাবকে (solvent) র ঘনত্ব নিশ্চয়ই কম থাকবে। একই কারণে কোন একটি দ্রবের ঘনত্ব বাড়লে অন্যান্য দ্রব এবং দ্রাবকের ঘনত্ব সমহারে কমে যায়।

ব্যাপন ক্রিয়ার গতি কতকগুলি প্রভাবকের (factors) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেহেতু সমগ্র প্রক্রিয়াটাই তাপাংকের উপর নির্ভরশীল, অতএব উষ্ণতর দ্রবণে সাম্যাবস্থা (equilibrium) দ্রুত স্থাপিত হয় ; কেননা, উষ্ণতর দ্রবণে অণুগুলির গতীয়শক্তি বেশী থাকায় ওরা অধিকতর দ্রুতগামী এবং কার্যকরী। ঘনত্ব-পার্থক্য বেশী হলে দ্রবণের অধিকতর ঘন অংশ থেকে দ্রব-কণা গুলির নিঃসরণ প্রবণতা বেশী হয়। বৃহদাকার কণাগুলি আবার ক্ষুদ্রতর কণার চেয়ে অনেক মন্থর গতিতে ব্যাপ্ত (diffused) হয় এবং মাধ্যমটি যত বেশী সান্দ্র (viscous) ব্যাপনের (ডিফিউশনের) গতি ও হবে তত ধীর। স্থূলে ব্যবধান যত বেশী সাম্যাবস্থা স্থাপিত হতে তত দেরী হয় ; কিন্তু আণু-বীক্ষণিক ও অতি আণুবীক্ষণিক ব্যবধানের মধ্যে (within microscopic and ultramicroscopic limits) প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘনত্ব সমান হয়ে যায়।

জীববিদ্যায় জলীয় দ্রবণই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাই অস্‌মোসিস বলতে আমরা সাধারণতঃ কোষের প্রোটোপ্লাজম এবং পারিপার্শ্বিক তরলের মধ্যে জলের বিনিময়কেই বুঝিয়ে থাকি। একটি সাধারণ আস্রাবণ প্রণালী (osmotic system) নেওয়া যাক, যাতে জল হচ্ছে দ্রাবক (solvent) এবং এই জলকে শর্করা দ্রবণ থেকে একটি বিশেষ নির্বাচনক্ষম পর্দা (Selectively permeable membrane) দ্বারা পৃথক করে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্রব (চিনি) এবং দ্রাবক (জল) উভয়েই নিজ নিজ অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে

অন্যত্র পরিব্যাপ্ত খুঁজছে। একটি আদর্শ প্রণালীতে, যেখানে চিনি পর্দা ভেদ করতে পারে না কেবল জলই পারে, সেক্ষেত্রে, কেবলমাত্র এক দ্রবণ থেকে অন্য দ্রবণে জলের স্থানান্তর দ্বারাই সাম্যাবস্থা স্থাপিত হতে পারে।

যেহেতু জলের ঘনত্ব পর্দার (মেমব্রেণের) এক পার্শ্বে অধিকতর, জলের অণুগুলো ক্রমশঃ পর্দা ভেদ করে শর্করা দ্রবণে প্রবেশ করতে থাকবে এবং এই প্রকোষ্ঠে জলের পরিমাণ বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না জলস্তম্ভের চাপ পাশের প্রকোষ্ঠ থেকে জলের অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারে। দ্রবণ কর্তৃক প্রদত্ত এই চাপকে বলে আস্রাবণীয় চাপ (osmotic pressure)। আমরা জানি, জল থেকে এই রকম কোন ভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথকীকৃত চিনির আণব বা মোলার দ্রবণের (প্রতি লিটার দ্রবণে এক গ্রাম-অণু পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে সেই দ্রবণকে বলা হয় মোলার দ্রবণ বা আণব দ্রবণ) আস্রাবণীয় চাপ শূন্য ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড ($0^\circ C$) তাপাংকে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রায় ২২·৪ গুণ অর্থাৎ ২২·৪ অ্যাটমোসফিয়ার। আস্রাবণীয় চাপের সাথে গ্যাসের সূত্রের সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব। কেননা, স্বাভাবিক বায়ুচাপে (এক অ্যাটমোস্‌ফিয়ার) $0^\circ C$ তাপাংকে এক গ্র্যাম-অণু পরিমাণ সকল আদর্শ গ্যাসেরই আয়তন 22·4 লিটার এবং এই পরিমাণ গ্যাসকে যদি এক লিটারে সংকুচিত করা যায় তবে উক্ত গ্যাস ২২ ৪ একক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করে। অতএব, আমরা নিম্নলিখিত সম্পর্ক ব্যবহার করে কোন দ্রবণের অসমোটিক চাপ নির্ণয় করতে পারি ঃ

আস্রাবণ চাপ (বায়ুমণ্ডলীয় এককে) = CRT.

এখানে, C = আণব ঘনত্ব (molar concentration)

R = গ্যাস ধ্রুবক = ০·০৮২ লিটার-অ্যাটমোসফিয়ার/ডিগ্রী/মোল

T = পরম তাপাংক (২৭৩ + $t^\circ C$)

সুতরাং, শূন্য ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১-মোলার চিনির দ্রবণের আস্রাবণীয় চাপ (π) = CRT = ১ × ·০৮২ × ২৭৩ = ২২·৪ বায়ুমণ্ডলীয় একক।

গ্যাসের সূত্রসমূহ আদর্শ গ্যাসের (perfect gas) জন্য উদ্ভাবিত ; তাই দ্রবণের ক্ষেত্রে গ্যাসের সূত্র পুরোপুরি খাটে না। কিন্তু, কোষের সাথে সম আস্রাবণীয় (isosmotic) দ্রবণের (অর্থাৎ যেসকল দ্রবণের আস্রাবণীয় চাপ কোষীয় উপাদানের আস্রাবণীয় চাপের সমান) চাপ নির্ণয়ে গ্যাসের সূত্র যথেষ্ট সন্তোষজনক।

ঘনত্ব এবং আস্রাবণীয় চাপের এই পারস্পরিক সম্পর্ক কেবলমাত্র তড়িদ্-অবিশ্লেষ্য পদার্থের (non-electrolytes) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তড়িদ্-বিশ্লেষ্য (electrolytes : তড়িৎ প্রবাহের ফলে যেসকল যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়) পদার্থের আণব দ্রবণের আস্রাবণীয় চাপ তড়িদ্-অবিশ্লেষ্য পদার্থের আণব দ্রবণের আস্রাবণীয় চাপের চাইতে বেশী। কেননা, দ্রবণে দ্রবের কণার সংখ্যা দ্বারা এই চাপ নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ লবণ (NaCl) জলীয় দ্রবণে যদি সম্পূর্ণরূপে (১০০%) বিয়োজিত (dissociated) থাকে তবে উহার আণব দ্রবণের আস্রাবণীয় চাপ ইক্ষু শর্করার (Sucrose) আণব দ্রবণের আস্রাবণ-চাপের দ্বিগুণ হবে। কারণ, সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl) প্রতিটি অণু জলীয় দ্রবণে বিশ্লিষ্ট হয়ে দুটি করে কণা তথা আয়নের সৃষ্টি করে ($NaCl \rightleftharpoons Na^+ + Cl'$), কিন্তু ইক্ষু শর্করার অণু অবিয়োজিত থাকে। অতএব, তড়িদ্-বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণের আস্রাবণীয় চাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিয়োজনের মাত্রা (degree of dissociation) দ্বারা গুণ করতে হবে। অর্থাৎ, π (আস্রাবণ চাপ) $= iCRT$, এই 'i' হ'ল তড়িদ্-বিশ্লেষ্য পদার্থটির একটি অণু বিয়োজিত হয়ে গড়ে যে কটি আয়ন দেয় তার সংখ্যা।

স্পষ্টতঃই, কোষ আদর্শ আস্রাবণ প্রণালী (ideal osmotic system) নয়। জল ভিন্ন প্রোটোপ্লাজমে এবং কোষের পারিপার্শ্বিক তরলে দ্রাব্য আরো অনেক পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে কোষ আবরণী ভেদ করে চলাচল করতে পারে। ফলে কোষ এবং পারিপার্শ্বিক তরলের মধ্যে জল ছাড়াও আরো অনেক পদার্থের বিনিময় ঘটে থাকে। অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসদ্বয় সহজেই কোষে গমনাগমন করতে পারে। জটিল কোষ আবরণীর (Complex cell membrane) ভেদ্যতা কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক বস্তুকণাসমূহের প্রকৃতির উপরেই নয়, কোষের ভিতর এবং বাইরেকার পরিবর্তনশীল পরিবেশের উপরও নির্ভর করে।

যদিও বিভিন্ন কোষে এবং কখনও কখনও একই কোষ-আবরণীর অন্তর ও বাহিরের ভেদ্যতার বিভিন্নতা দেখা যায়, তবুও এ সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সূত্র দাঁড় করান যেতে পারে। যেমন, জল প্রায় সকল কোষ আবরণীই দ্রুত ভেদ করতে পারে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস এবং অ্যালকোহল, ইথার, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি স্নেহ-দ্রাবক (fat solvent) তরল

পদার্থ সহজেই সকল প্রকার কোষ পর্দা ভেদ করে। গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acids), গ্লিসেরল (glycerol), স্নেহজ অম্ল (fatty acids) প্রভৃতি জৈব যৌগ কিছুটা ধীরে, এবং অজৈব অম্ল, ক্ষারক, লবণ (Inorganic acids, bases and salts) ইত্যাদি তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ সকল (strong electrolytes), এবং সুক্রোজ, মল্টোজ ও ল্যাক্টোজ এই ডাই-স্যাকারাইড (disaccharides) ত্রয়ের বৃহদাকার অণুসকল আরো ধীরে কোষ পর্দা অতিক্রম করতে পারে। কোন কোন কোষ আবার সুবৃহৎ ও জটিল যৌগ-সমূহের (very large and complex compounds) অণু গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু প্রায় কোন কোষই প্রোটিন (proteins) পলিস্যাকারাইড্‌স্ (Poly saccharides) বা ফসফোলিপিড্‌স্ (Phospholipids) গ্রহণ করতে পারে না।

এই সাধারণ নিয়মগুলিরও বহু ব্যতিক্রম আছে। বেশীর ভাগ শর্করা (sugars), প্রোটিন ও অজৈব লবণ সহ প্রোটোপ্লাজমের অধিকাংশ দ্রবই অতি ধীরে কোষ পর্দা অতিক্রম করে (যদি আদৌ তা করতে পারে)। পক্ষান্তরে দ্রাবক-জল (solvent water) কিন্তু খুব দ্রুত কোষে গমনাগমন করে। ফলে জলের পরিমাণ কোষের অন্য সকল উপাদানের পরিমাণের (একত্রে) চাইতে অনেক বেশী। এর অর্থ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক দ্রবণের সাথে কোষের আস্রাবণীয় সাম্যাবস্থা (osmotic equilibrium) স্থাপনে জলেরই মুখ্য ভূমিকা। যদি একটি কোষকে এমন কোন মাধ্যমে রাখা হয় যার জলের ঘনত্বের সাথে প্রোটো-প্লাজমের জলের ঘনত্বের আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তাহলে এত বেশী জল কোষে প্রবেশ করবে অথবা কোষ থেকে নির্গত হবে যে কোষটি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে। যাহোক, উদ্ভিদ এবং জীবাণুর বা মাইক্রোঅর্গানিজমের, (microorganism) কোষপ্রাচীর (cell wall) সাধারণতঃ খুব দৃঢ় এবং জলের প্রবেশজানতস্ফীতি রোধ করবার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত।

সম আস্রাবণীয় (isosmotic) দ্রবণের জলের ঘনত্ব প্রোটোপ্লাজমের জলের ঘনত্বের সমান। এবং এই অবস্থায় আসা তখনই সম্ভব যখন দ্রব-পদার্থগুলির সামগ্রিক ঘনত্ব প্রোটোপ্লাজমের অন্যান্য উপাদানের (জল ব্যতীত) সামগ্রিক কার্যকরী ঘনত্বের সমান হয়। জলের এই সমতা (water balance) সৃষ্টি হওয়ার কারণ একই সময়ে যতগুলি জলকণা (অর্থাৎ জলের অণু) কোষ ত্যাগ করছে, ঠিক ততগুলিই আবার কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। অতএব প্রকৃত

সমআস্রাবণীয় (আইসোসমোটিক) দ্রবণে অনতিক্রমণযোগ্য বা অতি ধীর গতিতে অতিক্রমণকারী দ্রবের ঘনত্ব প্রোটোপ্লাজমের 'কোষ আবরণী অতিক্রমণে অক্ষম দ্রবের' ঘনত্বের প্রায় সমান। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোষের ভিতরে ও বাইরে জলের ঘনত্ব সমান হতে পারে না।

সম আস্রাবণীয় (আইসোসমোটিক) দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য লবণের মিশ্রণ (যাতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন যথোপযুক্ত অনুপাতে আছে) ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ; কেননা. উপরিউক্ত আয়নগুলি কোষ আবরণীর স্বাভাবিক ভেদ্যতা (normal permeability) বজায় রাখতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। অনুচাপ (hypotonic) দ্রবণে কোষের প্রোটোপ্লাজমের (যে কোষটিকে দ্রবণ বেষ্টন করে আছে) তুলনায় 'কোষাবরণী অতিক্রমণে অক্ষম দ্রবের' ঘনত্ব কম থাকে ; এবং জলের ঘনত্ব থাকে অনেক বেশী। কাজেই হাইপোটোনিক দ্রবণে রাখা কোন কোষ ব্যাপনক্রিয়া ও আস্রাবণের মূল নীতি অনুসারে জলগ্রহণ করে স্ফীত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। বাইরে দ্রবের পরিমাণ খুব কম থাকলে কোষটি ক্রমাগত স্ফীত হতে থাকে এবং অবশেষে কোষ আবরণী বিদীর্ণ হয়ে যায়। ।মনুষ্যদেহের লোহিত কণিকা সাধারণলবণের ০·২% দ্রবণে রাখলে (যেক্ষেত্রে সমআস্রাবণীয় দ্রবণে ০·৮৪% সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে) ওটি এত তাড়াতাড়ি ফুলে ফেঁপে ফেটে যায় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা সম্ভব হয় না।

পক্ষান্তরে অতি চাপ (hypertonic) দ্রবণে রাখা কোষকে সংকুচিত হতে দেখা যায়। কেননা, এক্ষেত্রে কোষের প্রোটোপ্লাজমের তুলনায় উক্ত দ্রবণের দ্রব-কণাগুলোর ঘনত্ব অধিক এবং জলের ঘনত্ব কম। উদ্ভিদ কোষের দৃঢ় প্রাকারটি (rigid wall) কোষের নিজস্ব আকৃতি বজায় রাখে, এবং প্রোটো-প্লাজম কোষ প্রাকার (cell-wall) থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু জীব কোষ (animal cells) অতিচাপ দ্রবণে রাখলে এত বেশী কুঞ্চিত হয় যে ওর মূল আকৃতি কি ছিল বোঝা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ, লোহিত রক্ত কণিকা গাঢ় ইক্ষু শর্করার দ্রবণে রাখলে জল নির্গত হবার দরুণ কুঞ্চিত হয়। এই প্রক্রিয়া বেশীদূর অগ্রসর না হলে কোষ পূর্বাবস্থা ফিরে পেতে পারে। এইরূপে, কোন উদ্ভিদ কোষকে যদি এমন কোন অতিচাপ দ্রবণে রাখা যায় যার দ্রব কণাগুলি ধীরে ধীরে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে

পারে, তাহলে প্রথমে কোষের সূক্ষ্ম পর্দা (সেল মেমব্রেণ) সংকুচিত হয়ে কোষপ্রাকার (cell wall) থেকে দূরে সরে আসবে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্লাজমোলিসিস (plasmolysis)। কিন্তু, পরে দ্রব-কণাগুলির ধীর গতিতে
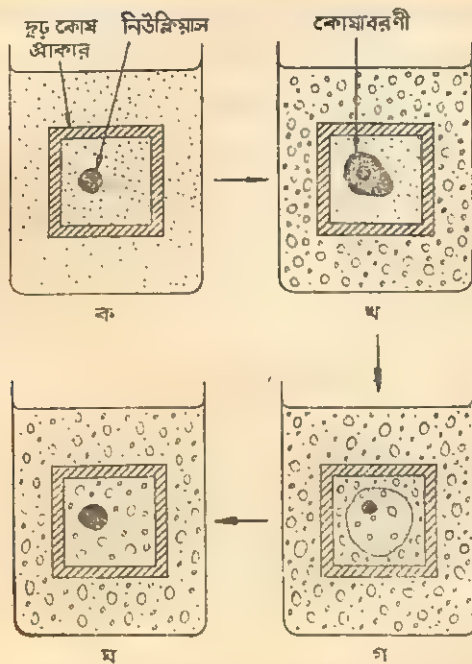
চিত্র ১-২

প্লাজমোলিসিস ঃ যখন কোন উদ্ভিদ কোষ (ক) ধীর গতিতে অতিক্রমণকারী দ্রবের অতি চাপ দ্রবণে রাখা হয় তখন কোষটি থেকে দ্রুত জল নির্গত হয় এবং কোষ আবরণী সংকুচিত হয়ে কোষ প্রাকার থেকে দূরে সরে যায় (খ)। আবার যখন দ্রবকণাগুলি ধীরে ধীরে কোষে প্রবেশ করে এবং জলেরও প্রত্যাবর্তন ঘটে (গ) কোষটি পূর্বাবস্থা ফিরে পায় (ঘ)।

প্রবেশ এবং জলের প্রত্যাবর্তনের ফলে কোষটি আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পাবে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ডিপ্লাজমোলিসিস (deplasmolysis) [চিত্র নং ১-২ দ্রষ্টব্য]। ডিপ্লাজমোলিসিস লক্ষ্য করে আমরা উদ্ভিদ কোষে

২

দ্রবকণাগুলোর প্রবেশের হার নির্ণয় করতে পারি ; কেননা, স্পষ্টতঃই ডিপ্লাজমোলিসিসের হার দ্রবকণাগুলির প্রবেশের হারের সমানুপাতিক।

ব্যাকটেরিয়া বা উদ্ভিদ কোষের দৃঢ় কোষপ্রাকারটি সরিয়ে ফেললে দেখা যাবে যে প্রাণীকোষের (animal cell) মতই ওটি আর নিজস্ব আকৃতি বজায় রাখতে সক্ষম নয়। উদাহরণ স্বরূপ, হাইপোটোনিক দ্রবণে ওটি বিদীর্ণ হবে। যাহোক, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, হাইপোটোনিক দ্রবণ থেকে জল উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করবে যতক্ষণ না প্রোটোপ্লাজম অপরাজেয় কোষ প্রাচীরের বিরুদ্ধে বাইরের দিকে চালিত হয়। কোষে যথেষ্ট পরিমাণ আভ্যন্তরীণ চাপের [যাকে বলা হয় টারগার প্রেসার (turgor pressure)] সৃষ্টি হলে আর কোন জলকণা প্রবেশ করতে পারে না। এই টারগার প্রেসার কখনো কখনো বেশ কয়েক বায়ুমণ্ডলীয় একক (atmosphere) চাপের সমান হয়।

বিভিন্ন ঘনত্বের শর্করা দ্রবণে কোষ রেখে আমরা কোষের অভ্যন্তরে আস্রাবণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় (osmotically active) বস্তু সমূহের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি। কোন উদ্ভিদ কোষকে ০·৫ মোলার শর্করা দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে যদি দেখা যায় ওটি স্ফীত বা সংকুচিত কিছুই হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে ঐ কোষে ০·৫ মোলার দ্রবণের তুল্য আস্রাবণ সক্রিয় বস্তু কণা (তড়িদ্-বিশ্লেষ্য এবং অবিশ্লেষ্য উভয়প্রকার) আছে যা বস্তুতঃ ১১·২ বায়ুমণ্ডলীয় একক চাপ প্রদান করে। ব্যাকটেরিয়া সহ বহু উদ্ভিদকোষের আস্রাবণ সক্রিয় বস্তু কণার ঘনত্ব এই প্রকার। কোষ প্রাকার বিহীন ব্যাকটেরিয়ার মত কোন কোষ জলে ডুবিয়ে রাখা হলে স্ফীত হয়ে অবশেষে সেটি বিদীর্ণ হবে। কেননা, ১১·২ অ্যাটমোসফিয়ার চাপ সহ্য করার মত ক্ষমতা এদের নেই। পেনিসিলিন (penicillin) নতুন কোষপ্রাচীর গঠনে বাধা দান করে ব্যাকটেরিয়া নিধন করে। কোষ প্রাচীর গঠিত না হওয়ার ফলে পারিপার্শ্বিক হাইপোটোনিক দ্রবণ থেকে জল ঢুকে ব্যাকটেরিয়ার কোষকে অত্যধিক স্ফীত করে তোলে এবং অবশেষে বিদীর্ণ হয়। কোষপ্রাচীর বিহীন এই ব্যাকটেরিয়া (যাদের বলা হয় প্রোটোপ্লাস্ট—protoplasts) গুলিকে রক্ষার জন্য পারিপার্শ্বিক দ্রবণের দ্রবের ঘনত্ব বাড়ানো হয়—এই ঘনত্ব সাধারণতঃ ০·৪ থেকে ০·৫ মোলার সুক্রোজ দ্রবণের ঘনত্বের সমান।

সক্রিয় পরিবহণ (Active Transport)

কোষের নির্বাচনক্ষম পর্দাটি (selective membrane) নিষ্ক্রিয় এবং পারি-পার্শ্বিক তরলের সাথে কোষের যা কিছু বিনিময় তার সকলই সরল ব্যাপনক্রিয়া এবং আস্রাবণ প্রক্রিয়ার দরুণ ঘটে একথা মনে করা ঠিক হবে না। কেননা, দেখা গেছে অনেক কোষই স্বাভাবিক ব্যাপন-স্রোতের বিরুদ্ধে যেমন বিশেষ কোন পদার্থকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে, তেমনি কতকগুলিকে আবার বিদায় করেও দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো সামুদ্রিক শৈবাল সমুদ্র-জলের ঘনত্বের দশ লক্ষ গুণেরও বেশী পরিমাণ আয়োডিন সঞ্চয় করে রাখতে পারে। আবার অনেক কোষের (যেমন মানুষের এরিথ্রোসাইট) সাইটো-প্লাজমে পারিপার্শ্বিক রস বা লসিকার (sap or lymph) তুলনায় পটাসিয়ামের ঘনত্ব অনেক বেশী কিন্তু সোডিয়ামের ঘনত্ব অনেক কম। এই অবস্থা ব্যাপন ক্রিয়া বা আস্রাবণের সাধারণ সূত্রাবলী দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কোষ নিজেই বিশেষ বিশেষ পদার্থের অণুগুলিকে বিন্যাস ঘনতার (concentration gradient) বিরুদ্ধে চালিত করতে পারে। একেই বলে কোষের সক্রিয় পরিবহন (active transport)। বিন্যাস ঘনতার বিরুদ্ধে অণুগুলিকে চালিত করবার শক্তি কোষ বিপাকক্রিয়া থেকে পেয়ে থাকে। তাই, কিছুক্ষণের জন্য অস্থায়ীভাবে বিপাকক্রিয়া বন্ধ রাখলে, দেখা গেছে, কোষ আস্রাবণ ও ব্যাপন প্রবাহের বিরুদ্ধে কাজ করবার সামর্থ্য (capacity) হারিয়ে ফেলে। তখন পারিপার্শ্বিকের সাথে কোষের সকল প্রকার বিনিময় (exchanges) ব্যাপনক্রিয়া ও আস্রাবণের সাধারণ সূত্রাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সনাক্তকরণের জন্য আমরা সাধারণতঃ চালনাকারী যন্ত্রটিকে (moving machinery) 'পাম্প' (pump) আখ্যা দিয়ে থাকি ; যেমন সোডিয়াম ও পটাসিয়াম পাম্প।

বর্তমানে আমরা জানি কোষীয় পর্দায় এমন কিছু সুনির্দিষ্ট অঙ্গ (specific structures) রয়েছে যা পাম্পিং (pumping) পদ্ধতিতে কোষাভ্যন্তরে বস্তুকণার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। কোষীয় পর্দার এই মাত্রাগুলি (units) বংশাণুর (জেনেটিক) নিয়ন্ত্রণাধীন এবং বিশেষ কোন একটি বংশাণুর (জীনের) রূপান্তর দ্বারা এগুলোর অপনয়ন সম্ভব। পরে আমরা দেখব যে কোন একটি বিশেষ পদার্থের বিপাক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট

এনজাইম কোষাভ্যন্তরে থাকা সত্ত্বেও কোষ ঐ পদার্থটিকে গ্রহণ করতে পারে না ; এর কারণ হচ্ছে কোষ পর্দা দিয়ে উক্ত পদার্থটি কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। অতএব, অনুঘটক এনজাইমটি কেবলমাত্র কোষাভ্যন্তরে উৎপন্ন অণুগুলির উপরই কাজ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশাণুর (জীনের) রূপান্তর ও যথাযথ নির্বাচনের (gene mutation and selection) দ্বারা প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে যে কোষটি পাওয়া যাবে তার বিশেষ পাম্পটি (specific pump) হবে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। অতএব, একথাটি এখন সুস্পষ্ট যে কোষ-আবরণীটি নিছক একটি আগম নিগমের নিয়ামকই নয় বরং বিপাক-যন্ত্রের (metabolic machine) এক সক্রিয় অংশীদার, যার অনেক ধর্মই আমরা সাধারণতঃ কোষের রাসায়নিক অনুঘটক উৎসেচকের উপর আরোপ করে থাকি।

এই সক্রিয় পাম্পের ক্রিয়া প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হল ব্যাকটেরিয়ার প্রোটোপ্লাস্ট (কোষ-বেষ্টনী বিহীন ব্যাকটেরিয়া)। বিশেষ এক জাতের ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটোজ শর্করা (lactose) এত বেশী পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারে যে প্রোটোপ্লাস্ট (protoplasts) স্ফীত হয়ে ওঠে এবং বহুগুণ বর্দ্ধিত আভ্যন্তরীণ আস্রাবণীয় চাপের দরুণ বিদীর্ণ হয়ে যায়। যেহেতু, এক্ষেত্রে ল্যাকটোজ শর্করার গ্রহণ স্পষ্টরূপেই বিন্যাস ঘনতার বিরুদ্ধে হচ্ছে, অতএব এটা মোটেই আশ্চর্য্যের নয় যে, যে যৌগগুলো (যথা অ্যাজাইড, সায়ানাইড, ইত্যাদি) কোষীয় বিপাকক্রিয়ায় বাধাদান করে সে যৌগগুলো শর্করাটির সঞ্চয়েও বাধাদান করে।

সক্রিয় পরিবহনের আরো অনেক উদাহরণ আছে। এদের মধ্যে মাছের অনুচাপ নিয়ন্ত্রণ (osmoregulation) তথা লবণ-ক্ষরণ (salt secretion), বৃক্কের নলাকৃতি অঙ্গ (tubules) কর্তৃক লবণ ও শর্করার পুনর্শোষণ (reabsorption), এবং উদ্ভিদমূল কর্তৃক লবণ-সঞ্চয় (salt-accumulation) ও ফলস্বরূপ আভ্যন্তরীণ আস্রাবণীয় চাপের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এখন তাহলে একথা পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে নানা প্রকারের জৈবিক প্রক্রিয়া জৈব এবং অজৈব যৌগ সমূহের (organic and inorganic compounds) সক্রিয় ও নির্বাচনপূর্বক গ্রহণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ফলে, কোন পদার্থের বাহ্যিক ঘনত্বের উপর কোষকে নির্ভর করতে হয় না, কারণ, সক্রিয়
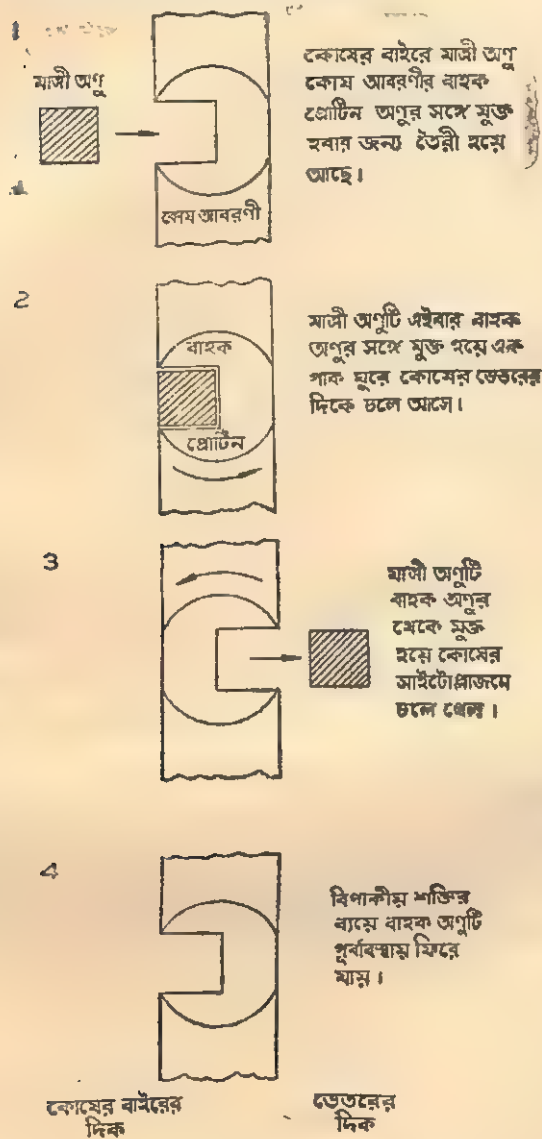
চিত্র ১-৩
সক্রিয় পরিবহনে 'যাত্রী ও বাহক' মতবাদ

পরিবহনের সাহায্যে কোষের প্রয়োজনানুসারে পদার্থের কোষে অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমরা সক্রিয় পরিবহনের সঠিক ক্রিয়াপ্রণালী তথা আভ্যন্তরীণ কৌশল (mechanism) সম্পর্কে খুব সামান্যই জানি। এ সম্পর্কে যাত্রী ও বাহক মতবাদ (passenger anl carrier concept) প্রচলিত আছে। এই মতবাদ অনুযায়ী কোষীয় পর্দায় একটি বাহক অণুর (carrier molecule) অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। সক্রিয় পরিবহনের সাহায্যে যে অণু বা আয়নটিকে কোষাভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হবে বাহক অণুটি প্রথমে তার সঙ্গে যুক্ত হয় (combines) এবং কোষাবরণীর দেয়াল ডিঙিয়ে ওকে পার করে দেয়। বাহক-অণুটি প্লাজমা-আবরণীর (plasma membrane) লিপো-প্রোটিন (lipo protein) উপাদানের প্রোটিন অঙ্গের একটি অংশ বিশেষ। সকল এনজাইমীয় ক্রিয়ার মতো এই বাহক-প্রোটিনের ক্রিয়াও খুবই সুনির্দিষ্ট।

ই. কলি. ব্যাকটিরিয়ার প্লাজমা-আবরণীতে একটি ল্যাকটোজ-বাহক প্রোটিনের সন্ধান মিলেছে যেটি বাইরের মাধ্যমের চেয়ে ৫00 গুণ বেশি ঘনত্বের ল্যাকটোজ কোষাভ্যন্তরে ধরে রাখতে সহায়তা করে। এই বাহক অণু একটি আবর্তনশীল দরজার (revolving door) মতো কাজ করে যেটি কেবল সুনির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের অণুকে প্রবেশ করতে দেয় (চিত্র ১-৩)। কোষাবরণীর বাহক অণুটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাত্রী অণুটি তখন এক পাক ঘুরে কোষের ভেতরের দিকে চলে আসে এবং মুক্ত হয়ে কোষাভ্যন্তরে চলে যায়। এই বার এই ঘূর্ণনশীল দরজাটিকে ঘুরিয়ে আবার পূর্বাবস্থায় আনতে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়। বিপাকীয় শক্তির ব্যয়ে আবর্তনশীল দরজাটি পূর্বাবস্থায় ফিরে এলে ওটি আবার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। এইভাবে বিপাকীয় শক্তির ব্যয়ে সক্রিয় পরিবহন চলতে থাকে।

পিনোসাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস (Pinocytosis and Phagocytosis)

অ্যামিবা এবং অ্যামিবা জাতীয় কোষ যেমন, রক্তের শ্বেত কণিকা (W.B C), অন্ত্র এবং অন্যান্যর আচ্ছাদক কোষ (epithelial cell) ইত্যাদি কোষীর পর্দায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের (invaginations) সৃষ্টি করে বিভিন্ন বস্তু কণা ভিতরে টেনে নিতে পারে এবং অবশেষে এই বস্তুকণাগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে অবাধে ভাসতে থাকে। এই ক্ষুদ্র গহ্বরগুলোকে (vacuoles) বলে পিনোজোম্‌স্ (pinosomes) এবং সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পিনোসাইটোসিস। ফ্যাগোসাইটোসিসও প্রায় একই রকম প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অ্যামিবা এবং রক্তের শ্বেত কণিকা দেহ থেকে ক্ষণপদ (pseudopods) বার করে বৃহদাকার বস্তুকণাকে সাঁড়াশীর মতো আঁকড়ে ধরে এবং অবশেষে গ্রাস করে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে কেবলমাত্র বিশেষ অনুকূল পরিস্থিতিতেই পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়া সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, জলীয় মাধ্যমে প্রোটিন বা লবণ যোগ করলে কোষ এই প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু প্রক্রিয়াটি চলে সীমিত সময় ধরে। কোষের বহির্ভাগের (surface) সুনির্দিষ্ট কতকগুলি স্থানেই (specific sites) কেবলমাত্র পিনোজোম্ গঠন করতে পারে এবং মাধ্যমটিতে পিনোসাইটোসিস একবার শুরু হলেও তার সময়কাল সীমিত। পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হওয়ার জন্য কোষীয় পর্দার ঐ স্থান-গুলির (sites) পুনরুদ্ধার তথা পুনর্গঠন প্রয়োজন।

এখন একথা উপলব্ধি করা আবশ্যক যে পিনোজোমের মধ্যেকার পদার্থগুলি বিপাকীয় বিচারে ঠিক কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত নয়। পিনোজোমে গৃহীত বস্তুটিকে বেষ্টন করে থাকে যে পর্দাটি তার অবস্থিতি ও আচরণ কোষীয় পর্দারই অনুরূপ। তাই ক্ষুদ্র অণুগুলি সহজেই সাইটো-প্লাজমে ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে : কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার অণুগুলিকে আটকে থাকতে দেখা যায় এবং এই বুদ্বুদাকৃতির গহ্বর (vesicle) গুলি ক্রমশঃ আকারে ছোট হতে থাকে এবং অবশেষে সাইটো-প্লাজমীয় দানার (cytoplasmic granules) অংশ বিশেষে পরিণত হয়।

ঠিক এখনই কোষের কার্যপ্রণালীতে পিনোসাইটোসিসের গুরুত্ব পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় এমন গ্রহণযোগ্য

বৃহৎ অণুগুলিকে (macromolecules) কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর এটি একটি উপায় বিশেষ বলে জানা গেছে এবং যে সকল ক্ষেত্রে বহিঃস্থ কোষ পর্দা দ্বারা কোষাভ্যন্তরে পদার্থের অনুপ্রবেশ সহজ সাধ্য নয় সেক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নিষিক্ত ডিম্বকোষ (fertilised egg cell) কর্তৃক শুক্রাণুর (sperm) অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটিও পিনোসাইটোসিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোষ রসায়ন : প্রোটিন

প্রোটিনের গঠন সংযুতি—অম্ল এবং ক্ষারক—প্রোটিনের অম্ল ও ক্ষারকধর্মিতা—প্রোটিন পৃথকীকরণ—বিশুদ্ধতার নিরূপক সমূহ—প্রোটিনের গঠন—প্রোটিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা।

সকল প্রকার জীবই (biological systems), তা মানুষই হোক বা জীবাণুই হোক, বেঁচে থাকবার তাগিদে তথা বৃদ্ধি ও প্রজনন প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ও তাদের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এই সকল জীবের মূল জৈব এককের (অর্থাৎ কোষের) পারিপার্শ্বিক তরল (fluid) থেকে পুষ্টিকারক দ্রব্যাদি গ্রহণ করবার ক্ষমতা অবশ্যই থাকা চাই আর কোষের অভ্যন্তরে এমন ব্যবস্থাদি থাকা আবশ্যক যার সাহায্যে কোষের মধ্যে গৃহীত দ্রব্যাদি থেকে নতুন অঙ্গ গঠন করে নিজের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করতে পারে। গৃহীত পুষ্টিকারক দ্রব্যের কিয়দংশ কোষের অঙ্গীভূত হয় এবং বাকীটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে গিয়ে নতুন অণুগঠনের জন্য শক্তি যোগায়। সাধারণভাবে সকল পুষ্টিকারক দ্রব্যকেই কোষের খাদ্যদ্রব্যরূপে অভিহিত করা হয়। শ্বেতসার ও শর্করা, স্নেহপদার্থ, আমিষ (প্রোটিন), ভিটামিন, খনিজ-দ্রব্য এবং জল কোষের খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিক ভাবে কোষীয় প্রক্রিয়া-গুলি বিশেষ জটিল ধরণের ঠিকই কিন্তু আমরা যদি সুগঠিত কোষযন্ত্রকে পরীক্ষানলে (test tube) নিয়ে বিশদভাবে পরীক্ষা করি তবে বিভিন্ন জটিল যৌগ সংশ্লেষণের প্রতিটি ধাপ (step)-ই অনুধাবন করতে পারবো।

গত ত্রিশ বছরে জীবরসায়নবিদ্‌রা দেহকোষ বা কলা (cells or tissues) থেকে বিপাকযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পৃথকীকরণে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছেন। সমগ্র কোষটির জটিলতা থেকে মুক্ত করে একবার বিশেষ কোন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরীক্ষানলে অনুধাবন করতে পারলে ওটির প্রভাবক-সমূহের (factors) নিরূপণ খুবই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এই সকল গবেষণায়

জীবরসায়নবিদ্‌রা বিশুদ্ধ রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত সকলপ্রকার তত্ত্ব ও তথ্যাদি কাজে লাগিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে, জীবরসায়নবিদ্যা (Biochemistry)-কে বলা যেতে পারে কোষীয় ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয়দিকসমূহের (Physiological aspects) ব্যাখ্যায় রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদির সম্মিলিত প্রয়াস। জীব রসায়নবিদ্‌রা বিভিন্ন কোষীয় ক্রিয়া প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করে দেখেছেন যে বিশেষ ধরণের কিছু বৃহদাণু (ম্যাক্রোমলিকুল) আছে যা জীবের পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এরা হল প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড (proteins and Nucleic acids)। প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনাকালে নবম অধ্যায়ে নিউক্লিক অ্যাসিড সম্বন্ধে আলোচনা করবো। ঐ সময়ে প্রোটিন সম্পর্কে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। কারণ, প্রোটিন সজীব কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহের অনুঘটক (catalyst) উৎসেচকের দলভুক্ত। খুব সামান্য পরিমাণ এনজাইমই বিক্রিয়া ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট এবং এইসকল বিক্রিয়ায় এনজাইম সাধারণতঃ নিজে অপরিবর্তিত থাকে। কয়েক মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যেই কোষ নিজের অনুরূপ আরেকটি কোষ গঠন করতে পারে কেননা জীবন-প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়াই কোষের এনজাইমসমূহ ঘটাতে সক্ষম যেহেতু কোষীয় বিক্রিয়া সমূহের প্রায় প্রতিটিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট (specific) এনজাইম দ্বারা সংঘটিত হয় অতএব এনজাইমের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আমাদের বিশদভাবে জানা দরকার।

কোষ বা দেহকলার গঠন, কার্যপ্রণালী এবং বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ (metabolic activity) বিশেষ প্রোটিন অণুর উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল, কেননা জীবনের (life) সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপের (ভৌত বা রাসায়নিক) সকল দশায় (phase) প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উৎসেচকের (এক শ্রেণীর প্রোটিন) সংশ্লেষণ ও কার্যপ্রণালী কোষীয় বিক্রিয়াজাত পদার্থের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করে। পেশী সংকোচন (muscular contraction), স্নায়বিক পরিবহন (nerve conduction), রেচন (excretion), পরিশোষণ (absorption) প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সাথেও উৎসেচক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কোষ এবং কলাতন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ামক অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ

হরমোনের মতো বাইরেকার (foreign) বা রোগ সৃষ্টিকারী পদার্থের সাথে যুক্ত হতে সক্ষম বিশেষ অ্যান্টিবডিগুলি (antibodies) ও প্রোটিন। তাই কোষীয় কার্যকলাপের শারীরবৃত্ত ও প্রাণরসায়ন বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অতিকায় অণুগুলির (macromolecules) সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জানা দরকার। এ অধ্যায়ে প্রথমে প্রোটিনের গঠন (structure) এবং পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধীকরণের প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করবো। এবং পরবর্তী অধ্যায়ে উৎসেচক-কৃত অনুঘটনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন-সংযুক্তি (Composition of Proteins) ঃ

প্রোটিন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট এক জটিল ধরণের যৌগ। অম্ল, ক্ষার বা উৎসেচকের সাহায্যে প্রোটিন -আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে নাইট্রোজেন ঘটিত একপ্রকার সরলতর জৈব যৌগের মিশ্রণ উৎপন্ন করে। এদের বলা হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযুতি নিম্নরূপ ঃ

$$R-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle NH_2}{\overset{|}{\underset{|}{\overset{\alpha}{C}}}}}-C\begin{matrix}\nearrow O \\ \searrow OH\end{matrix}$$
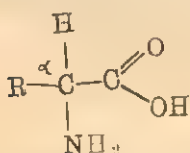
আলফা (α-) অ্যামাইনো কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড—অর্থাৎ '$-NH_2$' মূলকটি (অ্যামাইনো মূলক) '$-COOH$' (কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড) মূলকের ঠিক পাশের কার্বনেই থাকবে। তবে R-গ্রুপটি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতিতে প্রায় পঁচিশ রকমের 'R' গ্রুপ দেখা গেছে ; এবং এই 'R'-এর বিভিন্নতার জন্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডও প্রায় পঁচিশ রকমের। এদের মধ্যে কেবল দুইটি (প্রোলিন এবং হাইড্রোক্সি প্রোলিন) ব্যতিক্রম—এরা ইমিনো অ্যাসিড (imino-acids), আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড নয়। এই পঁচিশটির মধ্যে দশটি আবার অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (essential amino acids)। কেননা দেহযন্ত্র এইসকল অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী করতে পারে না। ফলে, খাদ্যের (diet) সাথে এদের গ্রহণ অপরিহার্য (indispensable) হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় বৃদ্ধি (growth) বিঘ্নিত হয় এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নাইট্রোজেন ও কার্বনঘটিত যৌগ এবং অন্যান্য পুষ্টিকারক দ্রব্য পাচ্ছে এমন

প্রাণী অবশিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি (dispensable) দেহযন্ত্রে তৈরী করে নিতে পারে। সারণী ২-১-এ অ্যামাইনো অ্যাসিডের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে বিশটি 'স'—অর্থাৎ সব প্রোটিনেই পাওয়া যায়; দশটি 'অ'—মানুষের পক্ষে 'অত্যাবশ্যকীয়' এবং কয়েকটি 'ক'—কদাচিৎ কোনো প্রোটিনে দেখা মেলে।

সারণী ২-১ : অ্যামাইনো অ্যাসিডের শ্রেণীবিভাগ :

সাধারণ সংকেত : $R{-}\underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{CH}}{-}COOH$
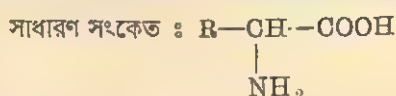
প্রশম (neutral) অ্যামাইনো অ্যাসিড (এতে আছে একটি কার্বোক্সিল ও একটি অ্যামিনো গ্রুপ) :

অ্যামাইনো অ্যাসিড	R
১। গ্লাইসিন (স)	$H-$
২। অ্যালানিন (স)	CH_3-
৩। ভ্যালিন (স, অ)	$(CH_3)_2CH-$
৪। লিউসিন (স, অ)	$(CH_3)_2CH.CH_2-$
৫। আইসোলিউসিন (স, অ)	$CH_3.CH_2.CH(CH_3)-$
*৬। নরলিউসিন (ক)	$CH_3.(CH_2)_3-$
৭। ফিনাইল অ্যালানিন (স, অ)	$\bigcirc{-}CH_2-$
৮। টাইরোসিন (স)	$.O{-}\bigcirc{-}CH_2-$
৯। সেরিণ (স)	$HO.CH_2-$
১০। সিস্টাইন, cysteine (স)	$HS.CH_2-$
*১১। সিস্টিন, cystine (স)	$S{-}CH_2.CH(NH_2)COOH$ $\vert$ $S{-}CH_2.CH(NH_2).COOH$
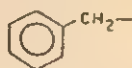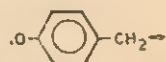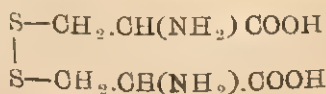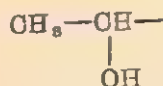
১২। থিওনিন (স, অ)	$CH_3—CH(OH)—$
১৩। মিথায়োনিন (স, অ)	$CH_3—S—CH_2.CH_2—$
১৪। ট্রিপটোফান (স, অ)	[indole ring]—CH_2—
†১৫। প্রোলিন (স)	[pyrrolidine ring, N–H]—COOH
†১৬। হাইড্রোক্সিপ্রোলিন (স)	HO—[pyrrolidine ring, N–H]—COOH
১৭। থাইরক্সিন (ক)	HO—[ring, I, I]—O—[ring, I, I]—CH_2—
১৮। আয়োডোগর্গিকঅ্যাসিড (ক)	HO—[ring, I, I]—CH_2—
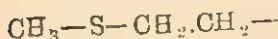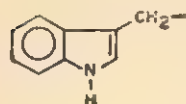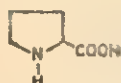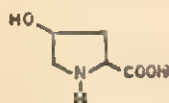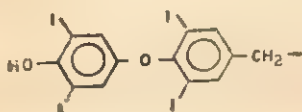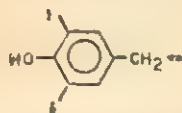
আম্লিক (acidic) অ্যামাইনো অ্যাসিড (এতে আছে দুটো কার্বোক্সিল গ্রুপ ও একটি অ্যামিনো গ্রুপ) ঃ
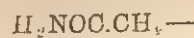
১৯। অ্যাসপারটিক অ্যাসিড (স)	$HOOC.CH_2—$
২০। অ্যাসপ্যারাজিন (ক)	$H_2NOC.CH_2—$
২১। গ্লুটামিক অ্যাসিড (স)	$HOOC.CH_2.CH_2—$
২২। গ্লুটামিন (ক)	$H_2NOC.CH_2.CH_2—$
*২৩। বিটা-হাইড্রোক্সি গ্লুটামিক অ্যাসিড	$HOOC.CH_2.CH(OH)—$

---
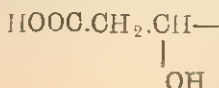
* প্রোটিনে এদের অস্তিত্ব অনিশ্চিত।

† পুরো অ্যামাইনো অ্যাসিডটিই লেখা হয়েছে।

ক্ষারকীয় (basic) অ্যামাইনো অ্যাসিড (এতে আছে দুটো অ্যামিনো গ্রুপ এবং একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ) :

২৪। হিস্টিডিন (স, অ) — (ইমিডাজোল বলয়: NH, N) $-CH_2-$

২৫। লাইসিন (স, অ) $H_2N.(CH_2)_3.CH_2-$

২৬। আর্জিনিন (স, অ) $HN{=}C{-}NH(CH_2)_2CH_2-$, $|$ NH_2

§২৭। অর্ণিথিন $H_2N.CH_2.CH_2.CH_2-$
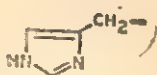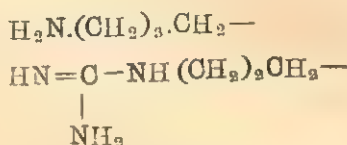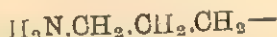
অ্যামিনো অ্যাসিডের এই তালিকাই কিন্তু শেষ কথা নয়। উদ্ভিদ এবং জীবাণুরা (micro-organisms) বিচিত্র সব গঠনের নতুন নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড প্রতিনিয়তই তৈরী করছে।

প্রোটিন অণুতে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল ($-COOH$) গ্রুপ আরেকটির অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে এক অণু জল অপসারণের দ্বারা গ্রন্থী (bond) গঠন করে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড সমূহ এইভাবে একত্রে গ্রথিত থাকে (চিত্র নং ২-১ দ্রষ্টব্য)। দুইটি অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুর ভিতর এই গ্রন্থীকে ($-CO-NH-$) বলে **পেপটাইড গ্রন্থী** (peptide bond)। এরকম ভাবে যদি দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত থাকে তাহলে বলা হয় ডাইপেপটাইড, তিনটি থাকলে ট্রাইপেপটাইড, ইত্যাদি, এবং যদি অনেকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু পেপটাইড গ্রন্থী দ্বারা একত্রে সংযুক্ত থাকে তাহলে প্রোটিনটিকে বলা হয় একটি পলিপেপটাইড (polypeptide)। প্রোটিনের দীর্ঘ পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি (chain) নানাভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ভাঁজ (fold) সৃষ্টি করে এবং অপরূপ আকার ও ভঙ্গিমা (কনফিগারেশন) নিতে সমর্থ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোজক সমূহ (cross links, কৌণিক যোজক) এই

---

§ অর্ণিথিন সম্ভবতঃ প্রোটিনে থাকে না, আর্জিনিনের আর্দ্রবিশ্লেষণে উৎপন্ন হয়।

পেচাঁনো গড়ন (folded structure)-কে সুস্থায়ী হতে সাহায্য করে। দীর্ঘ পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের এই ভাঁজ (folding) একটি সুস্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট প্রোটিন অণু তথা এনজাইম গঠনের ব্যাপারে বিশেষ উপযোগী।

$$R-\underset{NH_2}{\overset{H}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\boxed{OH+H}-HN-\underset{COOH}{\overset{H}{C}}-R' \longrightarrow R\underset{NH_2}{\overset{H}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH-\underset{COOH}{\overset{H}{C}}-R'$$
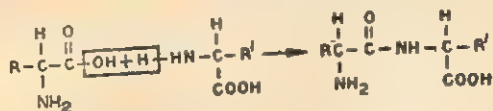
চিত্র ২-১ : পেপটাইড বন্ড গঠন

সালফার ঘটিত অ্যামাইনো অ্যাসিড সিস্টাইন (cysteine) এইরূপে বহু কৌণিক যোজকের (ক্রসলিংকেজের) চাবিকাঠি। ২-২ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে দুটো সালফহাইড্রাইল (sulfhydyl,-SH) গ্রুপ যখন পরস্পরের সন্নিকটে থাকে তখন তারা জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ হাইড্রোজেন বর্জন করে সংযুক্ত হতে পারে।

$$-CH_2-SH \quad HS-CH_2- \xrightarrow{\text{জারণ}} -CH_2-S-S-CH_2-$$
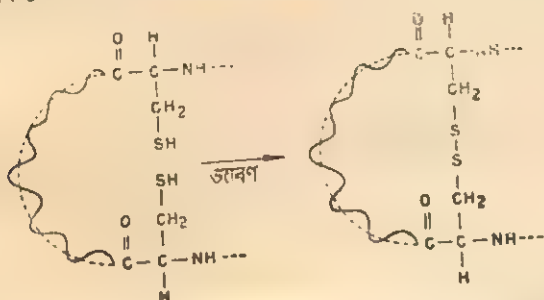
চিত্র ২-২ : পলিপেপটাইডে ডাই সালফাইড বণ্ড (ক্রসলিংক) গঠন

এইরূপে পেঁচানো পলিপেপটাইড কাঠামো আরো দৃঢ় হয়। S—S যোজক (link)-কে বলা হয় ডাইসালফাইড যোজক (disulphide bond)। এবং যে সকল পদার্থ একে সালফহাইড্রাইল গ্রুপে (—SH-এ) রূপান্তরিত করতে পারে (অর্থাৎ বিজারিত করতে পারে) তারাই S—S বন্ড ভাঙ্গতে সক্ষম হয়। S—S যোজক দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইডকে একত্রে যুক্ত করবার ব্যাপারেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই কোষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন প্রোটিন অণু পৃথক ও শোধন করবার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে জটিল প্রোটিন অণু বা অন্য কথায় প্রোটিন অণুর এই বিরাট সমষ্টি এই জাতীয় ক্রসলিংকেজের দ্বারাই গঠিত এবং এসকল ক্ষেত্রে প্রোটিন অণুর আপাত আয়তন মূল কাঠামোর (basic unit বা মূল কাঠামোর বিষয়েই আমরা আগ্রহী) চেয়ে অনেক বেশী।

প্রোটিনের ধর্মাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল প্রোটিনের তড়িৎ-আধান (electric charge) ; প্রোটিনের এই ধর্ম উপাদান অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির (constituent amino acids) অম্ল-ক্ষার ধর্মিতার উপর নির্ভরশীল। তাই, প্রোটিন-রসায়নের এই দিকটি নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের অম্ল ও ক্ষারকের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

অম্ল ও ক্ষারক (Acid and Base)

আরহেনিয়াসের (Arrhenius) তত্ত্ব অনুযায়ী যে সকল পদার্থ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন (প্রোটোন, protons) দিতে পারে তাদের বলা হয় অম্ল বা অ্যাসিড (acid)। হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব দ্রবণের অম্লতার মাত্রা (degree of acidity) নির্ধারণ করে। আর যে সকল পদার্থ অম্লের হাইড্রোজেন আয়নের সাথে যুক্ত হতে পারে তাদের বলা হয় ক্ষারক বা বেস (ব্রনস্টেড-লাওরীর ধারণা অনুযায়ী)। উদাহরণ স্বরূপ, জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়নে (একটি বেস) বিয়োজিত হয় ঃ

$$HCl \rightleftharpoons H^+ + Cl^-$$
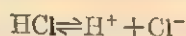
পক্ষান্তরে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) ধাতব আয়ন Na^+ এবং (একটি বেস) OH^- আয়নে বিয়োজিত হয়। ফলস্বরূপ, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অম্লটিকে (HCl) প্রশমিত করে জল($H^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O$) এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এই লবণটি গঠন করে।

জল সমসংখ্যক H^+ এবং OH^- আয়নে বিয়োজিত হয়। সুতরাং, জল অ্যাসিড ও নয় বেস ও নয়। সাধারণ উষ্ণতায় (২৫°C) বিশুদ্ধ জলে হাইড্রোজেন আয়নের (এবং-OH^- আয়নেরও) ঘনত্ব খুবই সামান্য, প্রায় ১০$^{-৭}$ গ্রাম অণু প্রতি লিটারে (10^{-7} mole/litre)। (মোলার বা আণব দ্রবণের প্রতি লিটারে এক গ্রাম অণু পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে)। উদাহরণ স্বরূপ, একলিটার জলীয় দ্রবণে যদি ৫৮'৫ গ্রাম (সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত ওজন বা ফর্মুলা ওয়েট ; সোডিয়ামের ২২.৯৯১ + ক্লোরিণের ৩৫'৪৫৭ = ৫৮'৪৪৮ ≃ ৫৮'৫) সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত থাকে তবে এই দ্রবণকে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক মোলার দ্রবণ (1 molar Solution) বলব। যদি ৫'৮৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এক লিটারে দ্রবীভূত থাকে তবে সেই দ্রবণকে বলব ০'১ মোলার দ্রবণ, ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনত্বের গুণফল একটি ধ্রুবক সংখ্যা এবং একে বলে জলের আয়নীয় গুণফল (ionic product of water) ঃ $[H^+][^-OH] = K_\omega$ (জলের আয়নীয় গুণফল)। ২৫°C তাপমাত্রায় জলের আয়নীয় গুণফলের মান প্রায় $১০^{-১৪}$ $(১০^{-৭} \times ১০^{-৭})$। আমরা একটির ঘনত্ব জানলে অপরটির ঘনত্ব সহজেই নির্ণয় করতে পারি। যেমন ঃ

$$[H^+][OH^-] = ১০^{-১৪}$$

$$\therefore \quad [H^+] = \frac{১০^{-১৪}}{[OH^-]}$$

উদাহরণ স্বরূপ. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ০·০০১(N) দ্রবণ (০·০০১ নর্ম্যাল দ্রবণ) যদি সম্পূর্ণরূপে H^+ এবং Cl' আয়নে বিয়োজিত থাকে তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের লিটার প্রতি ঘনত্ব হবে ০·০০১ $= ১ \times ১০^{-৩}$ গ্রাম অণু এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনত্ব $([^-OH])$ হবে $১০^{-১১}$ গ্রাম অণু প্রতি লিটারে। হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনত্ব দশের ঘাতে প্রকাশ করে লগারিদমের ব্যবহার বিশেষ সুবিধেজনক। যেমন, ০·১(N) $= ১০^{-১}$(N), ·০১ $= ১০^{-২}$, ·০০১ $= ১০^{-৩}$, ইত্যাদি। ঘাতের সূচক সমূহ (exponents) −১, −২, −৩ ইত্যাদি হচ্ছে ঘনত্বের লগারিদম। যাহোক, ঋণাত্মক লগারিদম নিলে আমরা ঋণাত্মক সংখ্যার পরিবর্তে ধনাত্মক সংখ্যাই পেতে পারি। সুতরাং, কোন দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব যখন ০·০০০১ অর্থাৎ $১০^{-৪}$ গ্রাম অণু প্রতি লিটারে, সেই দ্রবণের অম্লতা-নির্দেশক সংখ্যাটি হল ৪ ঃ $-\log_{১০}[H^+] = ৪$ ('[ ]' চিহ্নটি ঘনত্ব নির্দেশ করে)। এই সংখ্যাটিকে বলা হয় দ্রবণের pH ভ্যালু। এবং pH-ভ্যালু কোন দ্রবণের আপেক্ষিক অম্লতা নির্দেশ করে। ২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোনো জলীয় দ্রবণের pH-এর মান ৭-এর নীচে হলে দ্রবণটি আম্লিক আর ৭-এর উপরে হলে ক্ষারীয়। pH যখন ৭, দ্রবণটি প্রশম (neutral)। ২-২ নং সারণীতে $[H^+]$, $[OH^-]$ এবং pH-এর পারস্পরিক সম্পর্কের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

সারণী ২-২

$[H^+]$ মোল্স্ প্রতিলিটারে	$[OH^-]$ মোল্স্ প্রতিলিটারে	$\log [H^+]$	$-\log [H^+]$ $=pH$	
১=১×১০^0	১×১০$^{-১৪}$	০	০	আম্লিক
০'০১=১×১০$^{-২}$	১×১০$^{-১২}$	− ২	২	আম্লিক
১×১০$^{-৩}$	১×১০$^{-১১}$	− ৩	৩	আম্লিক
১×১০$^{-৭}$	১×১০$^{-৭}$	− ৭	৭	প্রশম
১×১০$^{-৯}$	১×১০$^{-৫}$	− ৯	৯	ক্ষারকীয়
১×১০$^{-১২}$	১×১০$^{-২}$	−১২	১২	ক্ষারকীয়
১×১০$^{-১৪}$	১×১০^0	−১৪	১৪	ক্ষারকীয়

বাফার দ্রবণ (buffers) প্রয়োগ করে কোন দ্রবণ বা দেহের তরলের pH মোটামুটি অপরিবর্তিত রাখা যায়। সাধারণতঃ একটি মৃদু অম্ল এবং তার লবণ (যেমন অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম অ্যাসিটেট) বা একটি মৃদু ক্ষার ও তার লবণ (NH_4OH এবং NH_4Cl) নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে বাফার দ্রবণ তৈরী করা হয়। বাফার দ্রবণের pH নিম্নোক্ত হ্যাণ্ডারসন সমীকরণ (Henderson equation) দ্বারা নির্ণয় করা যায়ঃ

(i) $pH = pK_a + \log \frac{[salt]}{[acid]}$ (মৃদু অ্যাসিড বাফারের বেলা)

(ii) $pOH = pK_b + \log \frac{[salt]}{[base]}$ (মৃদু ক্ষার " ")

এখানে, $pOH = -\log_{10} [^-OH]$

এবং $pH + pOH = 14$ (25°C তাপমাত্রায়)

pK_a এবং pK_b যথাক্রমে মৃদু অ্যাসিড এবং মৃদু ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবকের ঋণাত্মক লগারিদম ($pK_a = -\log_{10} K_a, pK_b = -\log_{10} K_b$)।

যে বাফার দ্রবণে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের ঘনত্ব 0·01(N) এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেটের ঘনত্ব 0·1(N) তার pH হবেঃ

$$pH = pK_a + \log \frac{[Salt]}{[Acid]} = 4{\cdot}75 + \log \frac{0{\cdot}1}{0{\cdot}01}$$ (অ্যাসেটিক অ্যাসিডের $pK_a = 4{\cdot}75$)

$$= 4{\cdot}75 + \log_{10} 10$$
$$= 5{\cdot}75$$

প্রোটিনের অম্ল-ক্ষার ধর্মিতা (Acid-base Properties of Proteins) ঃ

অ্যামাইনো অ্যাসিড মৃদু ক্ষার এবং মৃদু অম্ল উভয়ের মতোই ব্যবহার করে ; কেননা অ্যামাইনো অ্যাসিডে কমপক্ষে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) এবং একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) থাকে। এই ধরণের যৌগকে বলা হয় অ্যাম্ফোলাইট (Ampholytes)। সুতরাং, অ্যামাইনো অ্যাসিডে দ্রবণের pH অনুযায়ী ধনাত্মক আধান বা ঋণাত্মক আধান বা উভয়ই থাকতে পারে (চিত্র নং ২-৩ দ্রষ্টব্য)। অ্যালানিনের দ্রবণে হাইড্রোজেন-আয়ন (H^+) যোগ করলে কার্বোক্সিল গ্রুপের আয়ন গঠন (ionisation) অবদমিত হয় এবং অ্যালানিন অণুটি সার্বিকভাবে ধনাত্মক আধান প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বেস
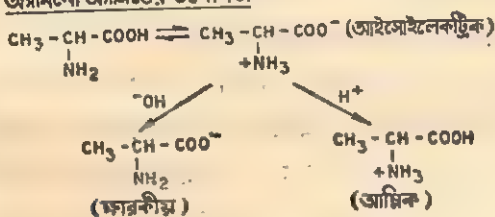
চিত্র ২-৩

(OH^- আয়ন) যোগ করিলে $-\overset{+}{N}H_3$ গ্রুপ থেকে একটি প্রোটোন অপসারিত হয়, ফলে অণুটি ঋণাত্মক আধান লাভ করে। একটি নির্দিষ্ট pH-এ অণুটি তড়িদ্-প্রশম (electrically neutral) থাকে (অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের সংখ্যা পরস্পর সমান হয়) এবং এই pH-এ যখন দ্বি-মেরুক আয়ন (dipolar ion) তড়িদ্ ক্ষেত্রের (electric field) কোন মেরুর দিকেই ধাবিত হয় না সেই অবস্থাকে বলা হয় **তড়িৎ-প্রশম অবস্থা** (isoelectric point)। অম্ল বা ক্ষার যোগ করে টাইট্রেশন পদ্ধতিতে অথবা নিম্নে বর্ণিত **ইলেকট্রো-ফোরেসিস** (electrophoresis) পদ্ধতিতে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট নির্ণয় করা যায়। আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টের pH-ভ্যালু অ্যামিনো অ্যাসিডের আম্লিক ও ক্ষারকীয় মূলক গুলির বিয়োজন ধ্রুবকের (dissociation constant) উপর নির্ভর করে।

প্রোটিনও অ্যাম্ফোলাইটের (Ampholytes) মতই ব্যবহার করে, কেননা পেপটাইড গ্রন্থী গঠনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের উভধর্মী চরিত্র (amphoteric character) সংরক্ষিত হয়। ২-৪ নং চিত্রে একটি ডাইপেপটাইড দেখানো

একটি ডাইপেপটাইড
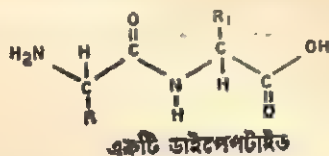
চিত্র ২-৪

হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে ডাইপেপটাইডটির ডান দিকে একটি মুক্ত (free) অ্যাসিড মূলক এবং বাঁদিকে একটি মুক্ত অ্যামিনো মূলক রয়েছে। R ও R_1 অ্যামাইনো অ্যাসিডদ্বয়ের অবশিষ্ট কার্বন কাঠামোগুলি (Carbon skeletons) নির্দেশ করছে। প্রোটিনে আম্লিক ও ক্ষারকীয় মূলকের সংখ্যা উপাদান অ্যামাইনো অ্যাসিডসমূহের সংখ্যা ও ধরণের উপর নির্ভর করে। স্পষ্টতঃই আমরা যদি পঞ্চাশটি বা একশোটি গ্লাইসিন অণু পেপটাইড গ্রন্থী দ্বারা যুক্ত করি তাহলে এমন একটি সুবৃহৎ 'পলিপেপটাইড' (পলিগ্লাইসিন) পাবো যার এক প্রান্তে থাকবে একটি মুক্ত কার্বোক্সিল গ্রুপ আর অপর প্রান্তে থাকবে একটি মুক্ত অ্যামিনো গ্রুপ।

পলিগ্লাইসিন
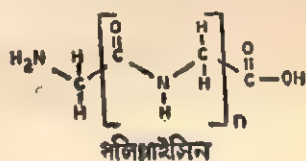
চিত্র ২-৪ (a)

আমরা আগেই দেখেছি একাধিক অ্যামাইনো বা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড মূলক বিশিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডও কয়েকটি আছে। যেমন, গ্লুটামিক অ্যাসিডে (glutamic acid) রয়েছে দুটো কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ। এটি যখন পেপটাইড গঠনে অংশ নেয় তখন প্রান্তীয় (terminal) বা আলফা (α) কার্বোক্সিল গ্রুপটি পেপটাইড গ্রন্থী গঠন করে আর অপর আম্লিক মূলকটি (γ কার্বোক্সিল গ্রুপ) মুক্তাবস্থায় থাকে। তেমনি অতিরিক্ত অ্যামাইনো গ্রুপ

বিশিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি (যেমন লাইসিন) পেপটাইড গঠন করলে অতিরিক্ত অ্যামাইনো গ্রুপটি অযুক্তাবস্থায় থাকবে।

অতএব, আমরা দেখছি যে প্রোটিনের আচরণ মূলতঃ উপাদান অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি এবং পরিবেশের pH দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডের আধানধর্মিতা (charge properties) সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে প্রোটিনের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। কেননা, প্রোটিনেরও আইসোইলেকট্রিক **পয়েন্ট** আছে এবং তড়িদ্ ক্ষেত্রে প্রোটিন প্রব্রজনও করে। প্রোটিনের আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট নির্ভর করে মুক্ত অ্যামাইনো গ্রুপ ও কার্বোক্সিল গ্রুপের আপেক্ষিক সংখ্যার উপর। আবার অযুক্ত অ্যামাইনো গ্রুপ ও কার্বোক্সিল গ্রুপের সংখ্যা নির্ভর করে প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড সংযুতির (amino acid composition) উপর।

প্রোটিন পৃথকীকরণ (Isolation of Proteins)

কোনো প্রোটিনের সুনির্দিষ্ট উৎসেচকীয় ক্রিয়াকলাপ সমূহ (Specific enzymatic activities) অনুধাবন করবার জন্য আমাদের প্রথমে প্রোটিনকে অন্যান্য কোষীয় উপাদান থেকে অবশ্যই পৃথক করে নিতে হবে। যদিও এটা প্রায়শঃই খুব কঠিন কাজ, তবুও যারা ধৈর্য্যসহকারে একের পর এক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন আর অবশেষে পেয়েছেন একটি বিশুদ্ধ, সমসত্ত্ব পদার্থ তারাই এক একটি অদ্বিতীয় জীবরাসায়নিক **প্রক্রিয়া** প্রথম প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। প্রোটিন পৃথকীকরণের ব্যাপারে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাতব্য ঃ (১) বিভিন্ন তাপমাত্রা এবং pH-এ প্রোটিনটির স্থায়িত্ব (Stability) এবং (২) জল ভিন্ন আর কোন্ কোন্ দ্রাবকে গুণাবলী (Properties) বিনষ্ট না করে প্রোটিনটিকে অধঃক্ষেপে (Precipitate) ফেলা যাবে। এখন প্রোটিন বিশুদ্ধিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

কোষ থেকে নিষ্কাশন (Extraction from the cell)

প্রোটিন নিষ্কাশন করবার জন্য প্রথমে আকাঙ্ক্ষিত প্রোটিনটি আছে এমন কোষ বা কলা (tissue) থেকে নিম্ন তাপাংকে (২°—৫° সেন্টিগ্রেড) অশোধিত **নির্য্যাস** (crude extract) তৈরী করে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ

পেষণ (grinding), হিমায়ন (freezing) ও গলন (Thawing) প্রভৃতি নানা উপায়ে এবং কাচের টুকরোর সাথে ঝাঁকিয়ে, অতিপ্রান্তিক শব্দতরঙ্গ (sonic wave) পিটনে কোষের রস বের করে নেওয়া হয়। প্রোটিন নিষ্কাশনে সাধারণতঃ জল বা বাফার দ্রবণ (buffer solution) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রোটিন যেহেতু প্রায়ই অন্যান্য কোষীয় পদার্থ যেমন স্নেহ পদার্থ ইত্যাদির সাথে যুক্ত (associated) থাকে তাই জলীয় দ্রাবকের সাহায্যে সর্বদা খুব সহজে ওদের (প্রোটিন) পৃথক করা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কলা (tissue)-কে প্রথমে শীতল অ্যাসিটোন বা বিউটাইল অ্যালকোহল দ্বারা ধুয়ে (washing) প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের জটিল যৌগ (complex) ভেঙ্গে ফেলা হয়।

তড়িৎ-প্রশমনের সাহায্যে অধঃক্ষেপণ (Isoelectric precipitation)ঃ

যেহেতু প্রোটিনের দ্রাব্যতা pH পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অতএব খুব সতর্কতার সাথে দ্রবণের pH **নিয়ন্ত্রণ** করে আমরা উদ্দিষ্ট প্রোটিনটি বিনষ্ট না করেই অধঃক্ষিপ্ত করতে পারি—অথবা অন্ততঃ অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রোটিন গুলি অপসারিত করতে পারি। যদিও এই প্রক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ বিশুদ্ধিকরণ সম্ভব নয় তবুও প্রোটিনের দ্রবণ ঘন করার ব্যাপারে এবং একই সাথে কম আণবিক গুরুত্বের অনেক যৌগ অপসারণে এই পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী। এর পর অধঃক্ষিপ্ত প্রোটিনটিকে সামান্য পরিমাণ বাফার দ্রবণেই দ্রবীভূত করতে পারা যায়।

লবণের সাহায্যে অংশায়ণ (Salt Fractionation)

জলীয় দ্রবণ থেকে প্রোটিন অধঃক্ষেপণে লবণের ব্যবহার প্রায়শঃই কার্যকর হয়। কোন কোন প্রোটিন বেশি পরিমাণ লবণের উপস্থিতিতে খুবই দ্রাব্য, আবার এই একই অবস্থায় কোন কোনটি অতি সহজেই অধঃক্ষিপ্ত হয়। ফলে, লবণের ঘনত্ব বাড়িয়ে অনেক প্রোটিন এভাবে পৃথক করা সম্ভব। লবণ যোগে এই অধঃক্ষেপণ পদ্ধতিতে (salting-out) অ্যামোনিয়াম সালফেট সর্বাধিক উপযোগী। এই প্রক্রিয়ায় pH-এর ও বিশেষ কার্যকরী প্রভাব আছে। তাই,প্রোটিন পৃথকীকরণের জন্য আমরা বিভিন্ন লবণ এবং pH-এর প্রভাব কাজে লাগিয়ে থাকি। প্রোটিন অণু সাধারণতঃ একাধিক আধান (charge) বিশিষ্ট, এবং আহিত (charged) মূলক গুলো নিজেদের মধ্যে বা জলের অণুর সঙ্গে

প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারে। প্রোটিন ও জলের অণুর পারস্পরিক ক্রিয়ায় (হাইড্রোজেন বন্ধনী ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে) সাধারণতঃ প্রোটিনের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অ্যামোনিয়াম সালফেটের উপস্থিতিতে জলের সহিত অ্যামোনিয়াম সালফেটের ক্রিয়ায় জলের কার্যকরী ঘনত্ব (effective concentration) হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, ফলতঃ জলের অণুগুলি যথেষ্ট মাত্রায় প্রোটিন অণুর সহিত ক্রিয়া করে ওদের দ্রাবিত করতে পারে না। এবং এর ফলে প্রোটিন অণুগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ায় জল হ'তে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

অভিস্রবণ (Dialysis) ঃ

কোন কোন প্রোটিন যেমন ইউগ্লোবিউলিনস্ (Euglobulins) বিশুদ্ধ জলে অদ্রাব্য, কারণ এক্ষেত্রে প্রোটিন-প্রোটিন মিথষ্ক্রিয়া (protein-protein interaction) প্রোটিন-জল মিথষ্ক্রিয়ার চেয়ে **প্রবলতর**। প্রোটিনের আহিত মূলক গুলোর সাথে বিক্রিয়া করতে পারে এমন কোন লবণের সামান্য পরিমাণ যোগ করে এই জাতীয় প্রোটিনকে দ্রবীভূত করা যায়। অতএব, প্রোটিন মিশ্রণে লবণের ঘনত্ব কমিয়ে অন্যান্য প্রোটিন থেকে ইউগ্লোবিউলিনস্ পৃথক করা যাবে। জল ও লবণ দ্বারা ভেদ্য (permeable) কিন্তু প্রোটিন অণু দ্বারা ভেদ্য নয় এমন একটি সেলোফেন থলের (cellophane bag) মধ্যে প্রোটিনের দ্রবণ রেখে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই সেলোফেন থলিটি একটি জলভর্তি পাত্রে রাখা হয় এবং লবণকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় (diffusion) বাইরে বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকেই বলে ডায়ালিসিস বা অভিস্রবণ।

দ্রাবকের সাহায্যে অংশায়ণ (Solvent Fractionation)

অ্যাসিটোন, ইথানল জাতীয় জৈব দ্রাবক সমূহ জলে দ্রবীভূত হতে পারে (miscible), অতএব, প্রোটিন অধঃক্ষেপণে বিশেষ কার্যকরী। দ্রাবকের সাহায্যে অংশায়ণ পদ্ধতি সাধারণতঃ বিশুদ্ধ জলের হিমাংকের (freezing point) নীচে সম্পন্ন করা হয়।

সাধারণভাবে, উপরে আলোচিত পদ্ধতিগুলি একসাথে অনেকটা পরিমাণ প্রোটিন বিশুদ্ধিকরণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই প্রণালীগুলি প্রোটিনের ঘনত্ব সর্বদাই উচ্চ মাত্রায় রাখতে সক্ষম। এর একটা মস্ত বড়ো সুবিধে আছে ;—লঘু জলীয় দ্রবণে প্রোটিনের ভাঁজহীন ও বিকৃত (unfolded and

denatured) হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় কিন্তু ঘন দ্রবণে তা হতে পারে না ; ফলে প্রোটিনটি অবিকৃত থাকে। প্রোটিন বিশোধনের জন্য এছাড়া আরো অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরে প্রোটিনের বিশুদ্ধতা বিচারের সময় সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বিশুদ্ধতার নিরূপকাবলী (Criteria of purity) ঃ

দ্রাব্যতা (Solubility) ঃ নির্দিষ্ট দ্রবণে স্থির pH-এ কোন সমসত্ত্ব (homogeneous) প্রোটিনের দ্রাব্যতা সর্বদাই নির্দিষ্ট, অতএব আমরা দ্রাব্যতার সাহায্যে প্রোটিনের বিশুদ্ধতা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারি। কোন দ্রবণে আমরা যদি ক্রমাগত প্রোটিন যোগ করতে থাকি এবং কতটা প্রোটিন দ্রবীভূত হচ্ছে নির্ণয় করে লেখচিত্র (graph) অংকন করি তাহলে দেখা যাবে যে বিশুদ্ধ প্রোটিনের ক্ষেত্রে লেখচিত্রটি আকস্মিক বাঁক (sharp break) নেয়। আর যদি
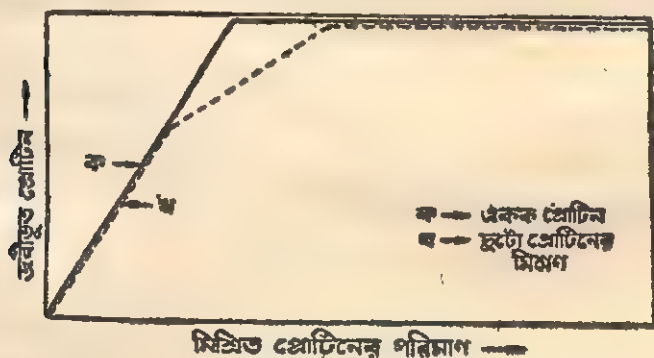
চিত্র ২-৫
প্রোটিনের দ্রাব্যতার লেখচিত্র

দুটি প্রোটিন মিশ্রিত থাকে তবে লেখচিত্রেও দুটি বাঁক থাকবে (চিত্র নং ২-৫ দ্রষ্টব্য)। প্রোটিনের সমসত্ত্বতা (homogeneity) নিরূপণের এই পদ্ধতিটি খুবই কষ্টসাধ্য। আজকাল বৈদ্যুতিক আধান (electrical charge) ও আণবিক গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রণালীগুলোই অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

তড়িৎ-তাড়িত অভিক্রম বা ইলেক্‌ট্রোফোরেসিস (Electrophoresis)

আমরা জানি, প্রোটিন একমাত্র আইসোইলেক্‌ট্রিক পয়েণ্ট (যে pH-এ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান সামগ্রিকভাবে পরস্পরের সমান হয়) ছাড়া সর্বদাই তড়িদ্‌ক্ষেত্রে পরিব্রজন করে। যেহেতু প্রোটিনের সামগ্রিক আধান (net charge) pH এর সাথে পরিবর্তিত হয়, অতএব তড়িদ্‌ক্ষেত্রে ভিন্ন আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট বিশিষ্ট দুটি প্রোটিনের গতিশীলতা (mobility) স্পষ্টতঃই বিভিন্ন হবে। সুতরাং তড়িতের সাহায্যে এদের পৃথক করা যাবে। প্রোটিন দ্রবণে বাফার প্রয়োগ করা হলে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট pH-এ) এই পদ্ধতিটি সর্বাধিক কার্যকরী হয়।

প্রণালীটি নিম্নরূপ ঃ অধিকাংশ প্রোটিনের (যাদের আইসোইলেকট্রিক পয়েণ্ট ৭-এর নীচে) ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ ঋণাত্মক আধান দেওয়ার জন্য দ্রবণের pH প্রথমে সামান্য ক্ষারীয় (৭·৫—৮·০) করা হয়। দ্রবণটিকে তারপর একটি ইউ (U) আকৃতি নলের তলদেশে রেখে ঐ একই pH-এর বাফার দ্রবণ প্রোটিন দ্রবণের উপরিভাগে ঢালা হয় (চিত্র ২-৬ক), এবং U-নলটির দুইটি তড়িদ্দ্বারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট প্রোটিন ঋণাত্মক তড়িদ্‌দ্বারের বাহুতে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসবে আর ধনাত্মক তড়িদ্‌দ্বারের বাহুতে নীচে নেমে যাবে (চিত্র ২-৬খ)।

সুসূক্ষ্ম আলোক যন্ত্রের সাহায্যে বাফার ও প্রোটিন দ্রবণের সংযোগস্থলে প্রোটিনের ঘনত্বের পরিবর্তন লক্ষ্য করে তড়িদ্‌ক্ষেত্রে প্রোটিনের উর্দ্ধগতি বা নিম্নগতির হার নির্ণয় করা হয় (চিত্র ২-৬গ)। প্রোটিনের ঘনত্বের এই পরিবর্তন বাফার ও প্রোটিন দ্রবণের মাঝামাঝি অঞ্চলের আলোকধর্মিতা (optical properties)-কে প্রভাবিত করে ; দুই দ্রবণের সংযোগস্থল অতিক্রম করার সময় (অর্থাৎ যেখানে প্রোটিন গ্র্যাডিয়েণ্ট সবচেয়ে বেশী) আপতিত আলোক রশ্মিগুচ্ছ সর্বাধিক বেঁকে যায়। বিশেষ এক ধরণের লেন্স (Lens) ব্যবহার করে আমরা এক প্রকার 'আলো-প্রক্ষেপ' পেতে পারি যাকে বলা হয় শ্লিয়ারেণ ব্যাণ্ড (schlieren band) ; এবং এই ব্যাণ্ডের শীর্ষবিন্দু (peak) সংযোগস্থলে অবস্থিত (চিত্র ২-৬ঙ)। এক্ষেত্রে লেখের (curve) অন্তর্গত স্থান প্রোটিনের ঘনত্ব নির্দেশ করে। ২-৬চ নং চিত্রানুযায়ী বিশুদ্ধ

প্রোটিনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটিই শীর্ষবিন্দু পাওয়া যাবে। কিন্তু দুটি প্রোটিন মিশ্রিত থাকলে সঞ্চরণশীল সংযোগস্থলের (moving boundary)
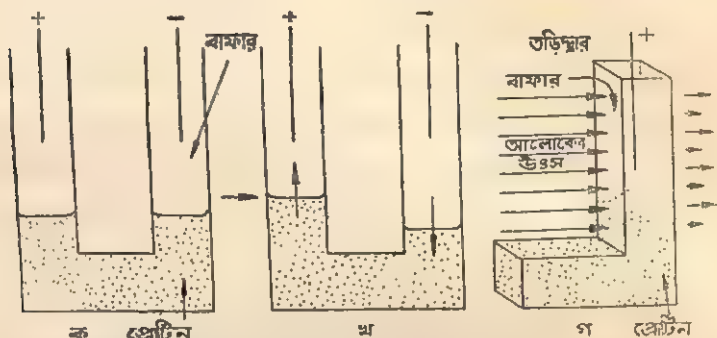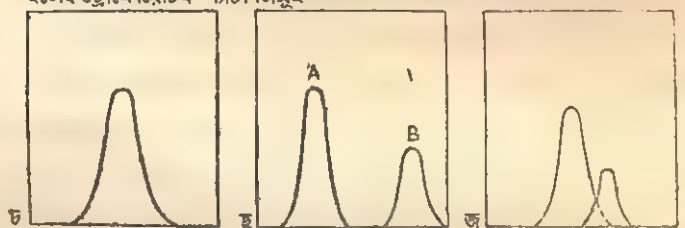
চিত্র ২-৬

ইলেকট্রোফোরেসিস

বিচ্ছিন্নতা (discontinuity) দেখা দেয় এবং দুটি স্বতন্ত্র প্যাটার্ণ (pattern)

লক্ষিত হয় (চিত্র ২-৬ছ)। প্রোটিন দুটি যদি তড়িদ্ আধানের দিক থেকে একই রকম হয় তবে মূল লেখের (curve) একটা দিক একটু বেড়ে উঠে আর একটা শীর্ষবিন্দু (peak) সৃষ্টি করে মাত্র (চিত্র ২-৬জ)। pH-এর পরিবর্তনে উপাদানদ্বয়ের গতিশীলতা (mobility) পরিবর্তিত হয়; তাই বিভিন্ন pH-এ ইলেকট্রোফোরেসিস প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করলে পৃথকীকরণ আরো উন্নত মানের (এবং এইরূপে বিশুদ্ধতার অপেক্ষাকৃত ভালো পরীক্ষা) হতে পারে। যাহোক, তড়িতের সাহায্যে সমসত্ত্বতা (electrophoretic homogeneity) অর্জনে একথা প্রমাণিত হয় না যে প্রোটিনটি কেবলমাত্র এক প্রকারের অণু দ্বারাই গঠিত। কেননা, বিভিন্ন আণবিক ওজন বিশিষ্ট অণুর (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার অণুর) তড়িদ্‌ক্ষেত্রে পরিব্রজন হার (migration rate) একই রকম হওয়ার ও সম্ভাবনা আছে।

এই প্রণালীটি কিছুটা পরিবর্তিত রূপে ব্যবহার করে প্রোটিন পৃথকীকরণে আরো ভালো ফল পাওয়া গেছে। সরু একফালি অ্যাগার (agar), স্টার্চ
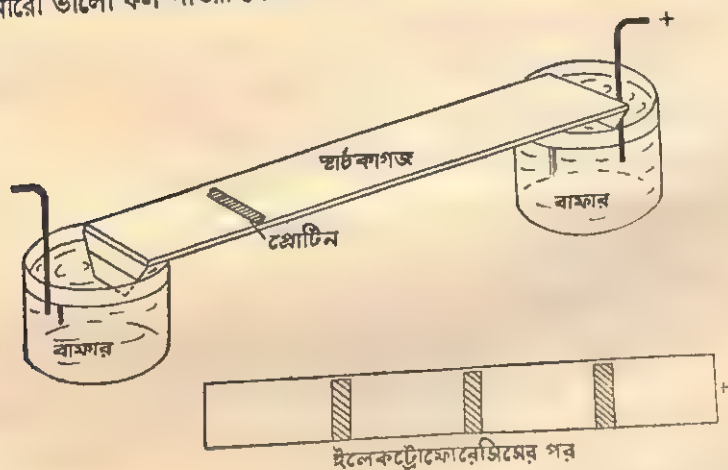
চিত্র ২-৭

স্টার্চ কাগজে (Starch strip) ইলেকট্রোফোরেসিস

জেল, স্পঞ্জ, বা এক টুকরো ফিল্টার পেপার (যা বাফারের পাত্রদ্বয়ের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে)-এর উপর প্রোটিনের মিশ্রণ রাখা হয় (চিত্র ২-৭)। ধারক বস্তুটির প্রোটিন শোষণ (absorb) করবার ক্ষমতা থাকার দরুণ তড়িদ্‌ক্ষেত্রে

প্রোটিন অণুর গতি মন্দীভূত হয়। এই প্রণালীটির বিশেষ সুবিধে এই যে প্রোটিন মিশ্রণের বিভিন্ন উপাদানগুলো এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই সূক্ষ্ম প্রযুক্তি (sensitive technique) র সাহায্যে অনেক পরিশোধিত প্রোটিনেরও ভিন্নসত্ত্বা দেখানো সম্ভব হয়েছে।

থিতানো (Sedimentation) :

প্রোটিন অণু অতিকায় হওয়ার দরুণ আমরা ওদের গতিবিধি কেন্দ্রাতিগ ক্ষেত্রে (centrifugal field) পর্যবেক্ষণ করতে পারি। অন্যান্য বিষয়ে পরিবর্তন না হলে কেন্দ্রাতিগ ক্ষেত্রে প্রোটিন অণুর গতিবেগ আয়তন বা আণবিক গুরুত্বের সমানুপাতিক হয়। সেন্ট্রিফিউজ কোষ (centrifuge cell)-এ প্রোটিন অণু ঘূর্ণন কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে সঞ্চরণশীল হয় এবং বিশুদ্ধ দ্রাবক ও প্রোটিন দ্রবণের মধ্যে পরিষ্কার একটি সীমারেখার (boundary) সৃষ্টি হয়। ইলেক্‌-ট্রোফোরেসিসে ব্যবহৃত একই ধরণের আলোক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা নিপুণভাবে এই সংযোগস্থল পর্যবেক্ষণ করতে পারি। যদি একটি প্রোটিন থাকে তবে চিত্র নং ২-৬ চ-এর অনুরূপ প্যাটার্ণ পাওয়া যাবে। আর যদি দুটি প্রোটিন মিশ্রিত থাকে তবে সেক্ষেত্রে ভারী অণুগুলো হালকা অণুর চেয়ে বেশী দূর অগ্রসর হবে। আগের মতো এই পরীক্ষাতেও আপাত সমসত্ত্বতা পরিলক্ষিত হলেও আমরা কিন্তু প্রোটিনটি পুরোপুরি বিশুদ্ধ বলে ধরে নেব না। কেননা অন্য পরিস্থিতিতে বা অন্য পদ্ধতিতে অসমসত্ত্বতা লক্ষিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

উপরে বর্ণিত মতে অতিকায় অণু (ম্যাক্রোমলিকুল) সমূহের আণবিক গুরুত্বের নির্দেশক (index) হচ্ছে ওদের থিতানোর হার (Sedimentation rate)। আকৃতি এবং আয়তন (shape and size) উভয়েই থিতানোর এই হারকে প্রভাবিত করে ; কিন্তু আণবিক গুরুত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আকৃতির প্রভাবকেই প্রোটিন অণুর ব্যাপন-ধ্রুবকে (diffusion constant) যথাযোগ্য ভাবে গণনায় আনা হয়। অতঃপর এই দুটির সাহায্যে আমরা প্রোটিন অণুর আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারি।

সেফাডেক্স ক্রোমাটোগ্রাফী (Sephadex chromatography) :

এক ধরণের নিষ্ক্রিয় বহু-শর্করা (polysaccharide) অণু দিয়ে গঠিত সেফাডেক্স স্তম্ভও প্রোটিন পৃথকীকরণে বিশেষ উপযোগী। সেফাডেক্স আণবিক-

ছাঁকনির (molecular sieve) কাজ করে এবং ছাঁকনি যেমন আয়তনের (size) ভিত্তিতে বিভিন্ন পদার্থকে পৃথক করতে পারে সেফাডেক্স স্তম্ভও তেমনি বিভিন্ন প্রোটিন অণুর আয়তন পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে ওদের আলাদা করে। তবে এখানে মজা হল এই যে সাধারণ চালনি বা ছাঁকনি যেখানে ছোট পদার্থগুলোকে যেতে দিয়ে বড়োগুলোকে ধরে রাখে সেফাডেক্স ছাঁকনি করে ঠিক তার উল্টো। ছোট, মাঝারী বা বড়ো নানা আকারের ছিদ্র বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের সেফাডেক্স পাওয়া যেতে পারে—তবে বিশেষ কোনো সেফাডেক্সের সমস্ত ছিদ্র গুলোই কিন্তু সমান ব্যাসের হবে। খুব ছোট ছিদ্র দিয়ে কেবল জলের অণুগুলো গলে যেতে পারে, বড়ো আকারের প্রোটিন অণু পারে না। আবার মাঝারী আকারের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে জল এবং ১২,০০০ থেকে ৫০,০০০ ডাল্টন পর্যন্ত আণবিক ওজন বিশিষ্ট প্রোটিন অণুগুলো গলে যেতে পারবে। মনে করা যাক, আনুমানিক ২০,০০০ এবং ৭০,০০০ ডাল্টন আণবিক ওজন বিশিষ্ট দুটি প্রোটিনের মিশ্রণ পৃথক করতে হবে। এখানে মাঝারী আকারের ছিদ্র বিশিষ্ট সেফাডেক্স স্তম্ভ
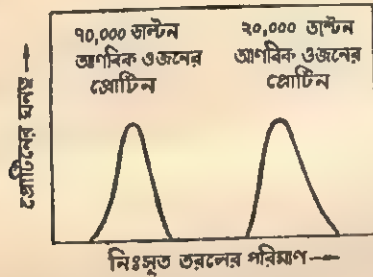
চিত্র ২-৮
সেফাডেক্স ক্রোমাটোগ্রাফী

ব্যবহার করা যেতে পারে—যার ছিদ্র দিয়ে দ্বিতীয় প্রোটিনটি গলতে পারে না কিন্তু প্রথমটি পারে। প্রথম প্রোটিনটি কিন্তু সেফাডেক্সের ছিদ্রে প্রবেশ করে পারিপার্শ্বিক দ্রাবক অণুগুলির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ায় একটা সাময়িক সাম্যাবস্থায় উপনীত হবে এবং খানিকটা বন্দীদশা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রোটিনটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তনের জন্যে সেফাডেক্সের ছিদ্রে প্রবেশ না করতে পেরে এদিক ওদিক ইতঃস্তত ঘোরাফেরা করবে এবং স্তম্ভের উপর থেকে

দ্রাবক (solvent, বিশেষ কোনো বাফার) প্রয়োগ করলে সহজেই স্তম্ভের নীচ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে যাবে। অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের প্রোটিনটিই নিঃসৃত হবে দেরীতে। সেফাডেক্স স্তম্ভ থেকে নিঃসৃত তরল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রথমে বড়ো আকারের প্রোটিনটি নিঃসৃত হয়েছে। এই ফলাফল ২-৮ চিত্রে বর্ণিত মতে লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়।

কোনো সেফাডেক্স স্তম্ভে একবার জ্ঞাত আণবিক ওজনের কয়েকটি প্রোটিন পাঠিয়ে দেখে নিতে হয় কে কোথায় নিঃসৃত হচ্ছে—পরে এই ফলাফলের সাহায্যে অজ্ঞাত প্রোটিনের আনুমানিক আণবিক ওজন সহজেই নির্ণয় করা যায়।

প্রোটিনের গঠন (Protein Structure) :

প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুগুলি একটি সুনির্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রমে পেপটাইড গ্রন্থী দ্বারা গ্রন্থিত থাকে (প্রোটিন পেপটাইড গ্রন্থী দ্বারা যুক্ত কতকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুর সমন্বয়)। কোন কোন প্রোটিনে আবার একাধিক পলিপেপটাইড শৃংখল থাকে এবং এরা বিশেষধরণের কৌণিক যোজক (ডাইসালফাইড বন্ড কৌণিক যোজক বা ক্রস লিংকের কাজ করে) দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। পলিপেপটাইড (polypeptide)-এ অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিন্যাসকে বলা হয় প্রোটিনের **প্রাথমিক গঠন ভঙ্গিমা** (Primary Structure)। আবার অধিকাংশ প্রোটিনে সর্পিল সুদৃঢ় পলিপেপটাইড চেন (ploypeptide chain) বিশেষ ধরণের পেঁচানো আকৃতি (helical shape) গঠন করে ; একে আমরা বলি প্রোটিনের **দ্বিতীয় পর্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা** (Secondary Structure)। প্রোটিনের চিত্তাকর্ষক জৈবিক ধর্মাবলীর অধিকাংশই এই সেকেন্ডারী স্ট্রাকচারের দরুণ।

অ্যামাইনো অ্যাসিড সংযুতি (Amino Acid Composition):

প্রোটিনকে ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১০ থেকে ২০ ঘণ্টা সময় ধরে মধ্যম ঘন অম্লের (যেমন ৬ নর্ম্যাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) সাথে বিক্রিয়া করালে সাধারণতঃ পেপটাইড গ্রন্থী গুলো খুলে গিয়ে উপাদান অ্যামাইনো অ্যাসিড-গুলি উৎপন্ন হয়। সাম্প্রতিক কালে, এই সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড মিশ্রণ সনাক্তকরণের নানা প্রকার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

অ্যামাইনো অ্যাসিড এর অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণে বর্তমানে ক্রোমোটো-গ্রাফী (Chromatography) পদ্ধতিটির বহুল ব্যবহার আছে। একটি পদ্ধতিতে দুইটি বিভিন্ন দ্রাবকে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলির আপেক্ষিক দ্রাব্যতার বিভিন্নতা কাজে লাগিয়ে একটি চিল্‌তা কাগজের (paper strip) সহায়তায় ওদের পৃথক করা হয়।

অ্যামাইনো অ্যাসিড মিশ্রণের এক ফোঁটা জলীয় দ্রবণ একটি লম্বা চিল্‌তা কাগজ ফলকের উপর রেখে ওটিকে এমন ভাবে একটি বদ্ধ বাক্স বা চোঙাকৃতি পাত্রে বসানো হয় যাতে ঐ পাত্রস্থিত জল সম্পৃক্ত কোনো জৈব দ্রাবকে চিলতে কাগজটির নিম্নাংশ নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে (চিত্র ২-৯ দ্রষ্টব্য)। জৈব দ্রাবকটি কাগজের ভেতর দিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং কাগজের উপর
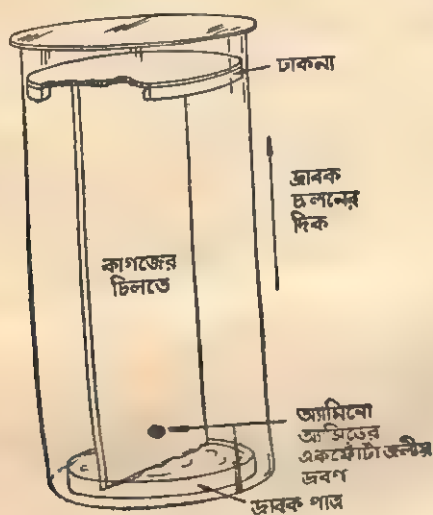
চিত্র ২-৯ ঃ

উর্দ্ধায়িত ক্রোমাটোগ্রাফী (Ascending paper chromatography)

রাখা অ্যামাইনো অ্যাসিড মিশ্রণের স্থানটি অতিক্রম করে যায়। যে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি জলের তুলনায় জৈব দ্রাবকে অধিকতর দ্রাব্য সেগুলি জৈব দ্রাবকটির সাথে বাহিত হবে, কিন্তু যারা জলেই বেশী দ্রাব্য তারা কাগজের উপর পড়ে থাকবে। কোনো বিশেষ অবস্থায় প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডই কাগজের গা

বেয়ে একটা 'নির্দিষ্ট দূরত্ব' অবধি উঠবে। প্রতিটি অ্যাসিডের জন্যই এই 'নির্দিষ্ট দূরত্ব' আলাদা। দ্রাবকটির যথোপযুক্ত উচ্চতা আরোহণের পর কাগজের লম্বা ফলকটি তুলে নেওয়া হয়, এবং এরপর ওটিকে শুকিয়ে নিয়ে ওর উপরে নিনহাইড্রিন (ninhydrin) ছিটিয়ে দেওয়া হয়। নিনহাইড্রিনের সংস্পর্শে অ্যামাইনো অ্যাসিড সুস্পষ্ট রঙীন মণ্ডলাকারে (coloured spot) প্রতিভাত হয়। নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডই একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং প্রত্যেকটি অ্যামাইনো আসিডের জন্য এক একটি নিজস্ব মণ্ডল সৃষ্ট হয়। অতএব আমাদের জানা অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে তুলনা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পর্যায়ের সনাক্তকরণের কাজ এই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে পারে।

অনেকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড একত্রে মিশ্রিত থাকলে সেক্ষেত্রে প্রথমে বৃহৎ একখণ্ড কাগজের একদিকে ক্রোমাটোগ্রাফ করা হয়। পরে ওটিকে শুকিয়ে নিয়ে নব্বুই ডিগ্রী কোণে ঘুরিয়ে পুনরায় বসানো হয় পাত্রে।
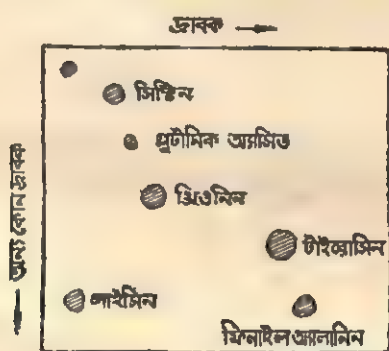
চিত্র ২-১০ :

অ্যামাইনো অ্যাসিডের দ্বৈতায়ত কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফী

এবারে অন্য কোন জৈব দ্রাবক ব্যবহার করে পুনরায় ক্রোমাটোগ্রাফ করা হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডের মিশ্রণ পৃথকীকরণের এই **দ্বৈতায়ত** (two-dimensional) **কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফী** ২-১০ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

কাগজ বা পৃথকীকরণ ক্রোমাটোগ্রাফীর (paper or partition chromatography) নীতি অ্যামাইনো অ্যাসিড মিশ্রণ পৃথকীকরণের অন্যান্য উপায়ও উদ্ভাবন করেছে। যেমন, স্টার্চ, সিলিকা জেল প্রভৃতি পদার্থ ফিলটার

কাগজের পরিবর্তে স্থির (সুস্থিত) জলীয় দশাটির (stationary aqueous phase) অববাহক (support) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টার্চকে জৈব দ্রাবক ও জলের মিশ্রণের সাথে মিশ্রিত করে ২-১১ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে অববাহক স্তম্ভে (column) ভর্তি করা হয়। এবং জল সম্পৃক্ত জৈব দ্রাবকটি স্তম্ভের উপর দিক থেকে ঢালা হয়; যতক্ষণ না জলীয় ও জৈব দশার (water and organic phase) মধ্যে সাম্যাবস্থা স্থাপিত হচ্ছে ততক্ষণ এই প্রবাহ চলতে দেওয়া হয়। এর পর প্রোটিন পলির (protein hydrolysate) একটি নমুনা উপর দিক থেকে স্তম্ভে প্রবেশ করানো হয় এবং আরো দ্রাবক পাঠানো হয় স্তম্ভের ভেতর দিয়ে। এর ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি স্তম্ভ বরাবর চলতে থাকে এবং এই চলার হার নির্ভর করে জলীয় ও জৈব দ্রাবক দশায় ওদের দ্রাব্যতার পার্থক্যের উপর। উপরন্তু, স্টার্চে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের শোষণ (absorption) বিভিন্ন রকম হওয়ায় পৃথকীকরণ আরো সহজ হয়। এই পদ্ধতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলির গতির (movement) এত বেশী পার্থক্য হয় যে এরা সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে স্তম্ভের নিম্ন প্রান্ত থেকে নির্গত হতে সক্ষম হয়। স্তম্ভ হতে নির্গত দ্রবণের অল্প অল্প নমুনা এক একটি পরীক্ষানলে সংগ্রহ করে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশ্রণ থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলিকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করতে পারি। ২-১১ নং চিত্রে এরকম স্তম্ভে চারটি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পৃথকীকরণ দেখানো হয়েছে।
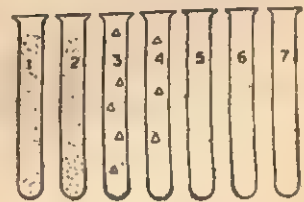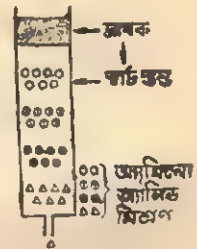
চিত্র ২-১১ ঃ
স্তম্ভপুট ক্রোমাটোগ্রাফীর সাহায্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পৃথকীকরণ

অ্যামাইনো অ্যাসিডের রাসায়নিক ধর্মের উপর অধিকতর নির্ভরশীল পদ্ধতিগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মিশ্রণ পরিমাণগত ভাবে পৃথকীকরণে সর্বোত্তম। অ্যামাইনো

অ্যাসিড অণুতে আয়নে বিয়োজনক্ষম (ionisable) একাধিক মূলক আছে এবং এদের বিয়োজন ধ্রুবকও (dissociation constant) আলাদা আলাদা। তাই, এই সকল তড়িদ্বাহী (charged) মূলকের সাথে বিক্রিয়া করতে সক্ষম এমন স্তম্ভপুটের সাহায্যে (c lumn) অ্যামাইনো অ্যাসিড মিশ্রণের পৃথকীকরণ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে আয়ন বিনিময়কারী রেজিন সমূহ (Ion exchange resins) বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণতঃ দু'রকমের রেজিন [যথা ক্যাটায়ন বিনিময়কারী রেজিন (cation exchangers) এবং অ্যানায়ন বিনিময়কারী রেজিন (Anion exchangers)] ব্যবহৃত হয়। কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড মিশ্রণ এরকম রেজিন স্তম্ভে প্রবেশ করানো হলে অ্যামাইনো অ্যাসিড রেজিনের একটি মূলকের সাথে আয়ন বিনিময় করবে; এই বিনিময়ের মাত্রা (degree of exchange) এবং বন্ধনশক্তি (strength of binding) বাফার দ্রবণের pH এবং মাত্রা (pH and strength) সহ অনেকগুলি প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল। pH এবং বাফার মাত্রা (buffer
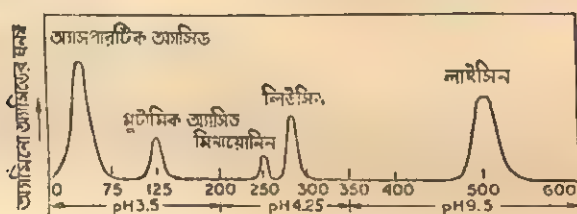
চিত্র ২-১২

আয়ন বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফীর (Ion exchange chromatography) সাহায্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড মিশ্রণের পৃথকীকরণ। পাদরেখা (base) বরাবর লিখিত সংখ্যা গুলি স্তম্ভ থেকে সংগৃহীত বাফারের আয়তন নির্দেশ করছে।

strength) পরিবর্তিত করে (gradient elution) আমরা প্রোটিন পলির সকল অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিই পরিমাণগত ভাবে পৃথক করতে পারি। এবং স্তম্ভ হতে নির্গত তরল (effluent)-কে দ্রুততা ও নিপুণতার সাথে বিশ্লেষণ করে তরলের অ্যামাইনো অ্যাসিডটিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

ক্যাটায়ন বিনিময়কারী রেজিন দ্বারা অ্যামাইনো অ্যাসিড মিশ্রণ পৃথকীকরণের একটি নমুনা ২-১২ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্রম (Amino Acid Sequence of Protein) :

প্রোটিনপলি (protein hydrolysate) বিশ্লেষণ করে আমরা প্রোটিনে বিদ্যমান অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলির পারস্পরিক অনুপাত জানতে পারলে ওটির একটা সাধারণ স্থূল সংকেত (general empirical formula) দিতে পারি বটে কিন্তু প্রোটিনটির গঠনপ্রকৃতি (Structure) আরো বিশেষ ভাবে জানতে হলে পেপটাইড শৃঙ্খলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রকৃত বিন্যাসক্রম (actual sequence) অবশ্যই জানা দরকার। এবং ওটি একক না বহু কৌণিক যোজক (ক্রস লিংক) বিশিষ্ট পলিপেপটাইড তাও জানা আবশ্যক। ভৌত ও রাসায়নিক (physical and chemical) উভয় প্রকার পদ্ধতিতেই পলিপেপটাইড লহরের (Strand, স্ট্র্যান্ডের) প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা যায়। প্রোটিনটিতে যদি একটিই মাত্র পলিপেপটাইড লহর থাকে তাহলে ওটিতে কেবল মাত্র একটিই অযুক্ত আলফা অ্যামিনো মূলক (NH_2-প্রান্তিক) এবং একটিই অযুক্ত কার্বোক্সিল মূলক (C-প্রান্তিক) থাকবে। অযুক্ত আলফা-অ্যামিনো মূলকটি ২, ৪-ডাইনাইট্রো-ফ্লুয়োরো বেনজিন (2, 4- dinitrofluoro benzene) জাতীয় বিকারকের (reagent) সাথে বিক্রিয়া করে ডাইনাইট্রো ফিনাইল (ডি এন পি) সঞ্জাত যোগ গঠন করে। এইরূপে বিক্রিয়ার পর প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করা হয় এবং ক্রোমাটোগ্রাফীর সাহায্যে হলুদ বর্ণের 'ডিএনপি-অ্যামাইনো অ্যাসিড' যৌগকে পৃথক করাও সম্ভব। প্রোটিনটি যদি বিশুদ্ধ হয় এবং যদি ওটির সঠিক আণবিক ওজন জানা থাকে তাহলে এই বিক্রিয়া থেকে প্রান্তিক অ্যামিনো মূলকের (NH_2-terminal groups) সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। কার্বন-প্রান্তিক অ্যামাইনো অ্যাসিড শেষাংশ (C-terminal amino acid residue) নির্ণয়ের ও একাধিক পদ্ধতি আমাদের জানা আছে। এই প্রক্রিয়ায় কার্বোক্সি পেপটাইডেজ (Carboxy Peptidase) নামক এনজাইমটি সর্বাধিক উপযোগী; কেননা এটি আলফা কার্বোক্সিল মূলক সন্নিহিত পেপটাইড বন্ড-

সালফাইড যোজক দ্বারা যুক্ত আছে। সেক্ষেত্রে পারফরমিক অ্যাসিড দ্বারা জারণের পর প্রোটিনটির আণবিক ওজন পূর্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রোটিনটি এক লহর বিশিষ্ট হলে আণবিক ওজন প্রায় একই থাকবে। ডাই-সালফাইড যোজক ভেঙ্গে প্রোটিনের লহরগুলোকে পৃথক করে দেবার আরেকটা সুবিধে হল এই যে এর ফলে কার্বন-প্রান্তিক এবং নাইট্রোজেন প্রান্তিক মূলকগুলো সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। চিত্রে এই প্রণালীসমূহ সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে (২-১৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ট্রিপসিন, কিমোট্রিপসিন প্রভৃতি কতিপয় প্রোটিন-ভাঙ্গা এনজাইম (proteinases) এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে এবং কতকটা উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞানী স্যাঙ্গার (Sanger)-ই প্রথম ইনস্যুলিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড সজ্জা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইনস্যুলিনে দুটি ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে যুক্ত দুটি পলিপেপটাইড লহর আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। ২-১৪ নং চিত্রে গরুর অগ্ন্যাশয় লব্ধ ইনস্যুলিনের (beef insulin) অ্যামাইনো অ্যাসিড সজ্জা দেখানো হয়েছে। একটি লহর একুশটি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত ; এটির N-প্রান্তিক অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লাইসিন এবং কার্বন-প্রান্তিক অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে অ্যাসপ্যারাজিন (Asparagine)। আর অপর লহরটিতে রয়েছে ত্রিশটি অ্যামাইনো অ্যাসিড, যার নাইট্রোজেন-প্রান্তিক অ্যামাইনো অ্যাসিডটি ফিনাইল অ্যালানিন এবং কার্বন-প্রান্তিক অ্যামাইনো অ্যাসিডটি হল অ্যালানিন। প্রথম লহরটিতে আর একটি ডাইসালফাইড যোজক যথাক্রমে দুইটি সিস্টাইন, অ্যালানিন, সেরিন, ভ্যালিন এবং একটি সিস্টাইন অণু নিয়ে একটি বলয়াকার কাঠামো (ring structure) গঠন করেছে।

এই ডাইসালফাইড যোজকটি কিন্তু পূর্বোক্ত যোজক দুটির মতো দুটো পলিপেপটাইড লহরকে যুক্ত করছে না—প্রথম লহরটিরই ছ'টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে একটি বলয় গঠন করেছে মাত্র। অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত ইনস্যুলিনের সাথে গরুর অগ্ন্যাশয়-ইনস্যুলিনের এই বলয়াকার কাঠামোটিতেই পার্থক্য। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনটি সিস্টাইন অণু ব্যতিরেকে অশ্বদেহের ইনস্যুলিনে এই বলয়টির বাকি তিনটি অ্যামিনো অ্যাসিড হল যথাক্রমে থ্রিওনিন, গ্লাইসিন এবং আইসোলিউসিন ;

সমূহকে আর্দ্র বিশ্লেষিত (hydrolyse) করে দিতে পারে। এনজাইমের সাথে বিক্রিয়ার পর প্রোটিনের কার্বন-প্রান্তিক মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডটিকে ক্রোমাটোগ্রাফীর সাহায্যে সনাক্তকরণ সম্ভবপর।

প্রোটিনে একাধিক পলিপেপটাইড লহর আছে কিনা দেখার জন্য প্রথমে ডাইসালফাইড কৌণিক যোজকগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়, কেননা এই যোজক গুলিই প্রোটিনের বিভিন্ন লহর (strand) গুলোকে একত্রে ধরে রাখে। পারফরমিক অ্যাসিড জাতীয় জারক দ্রব্যের সাহায্যে প্রোটিনের ডাইসালফাইড

কার্বন ও নাইট্রোজেন প্রান্তিক প্রোটিনাংশ নির্ণয়

(ক) ডাইসালফাইড যোজকের জারণ:

(খ) কার্বন প্রান্তিক অ্যামিনো অ্যাসিড নির্ণয়:

(গ) নাইট্রোজেন প্রান্তিক অ্যামিনো অ্যাসিড নির্ণয়:

চিত্র ২-১৩

কার্বন ও নাইট্রোজেন প্রান্তিক প্রোটিনাংশ নির্ণয়

যোজক ভাঙার পর লক্ষ্য করা হয় প্রোটিনের আণবিক ওজনের কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। ধরা যাক, কোনো প্রোটিনে তিনটি পলিপেপটাইড লহর ডাই-

আর শূকরের ইন্‌স্যুলিনের এই বিন্যাসটি হল থ্রিওনিন, সেরিন এবং লিউসিন।

A) Gly - Ileu - Val - Glu - Glu - Cyst - Cyst - Ala - Ser - Val - Cyst - Ser - Leu - Tyr - Glu - Leu - Glu - Asp - Tyr - Cyst - Asp

B) Phe - Val - Asp - Glu - His - Leu - Cyst - Gly - Ser - His - Leu - Val - Glu - Ala - Leu - Tyr - Leu - Val - Cyst - Gly - Glu - Arg - Gly - Phe - Phe - Tyr - Thr - Pro - Lys - Ala

চিত্র ২-১৪

গরুর অগ্ন্যাশয় লব্ধ ইন্‌স্যুলিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড পুঞ্জ।

প্রোটিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা (Secondary & tertiary structures of protein) ঃ হাইড্রোজেন বন্ধনী ও অন্যান্য অসমযোজী বন্ডের ভূমিকা ঃ

সমস্ত প্রোটিনেরই প্রাথমিক গঠন কাঠামো (primary structure) মূলতঃ পেপটাইড গ্রন্থী দিয়ে সুনির্দিষ্ট ক্রমে গ্রন্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুচ্ছ এবং কতিপয় ডাইসালফাইড যোজক নিয়ে গঠিত। অন্যান্য সরল রাসায়নিক যৌগের মতো প্রোটিনের বেলায় এই সরল কাঠামোই কিন্তু শেষ কথা নয় এবং এই প্রাথমিক গঠন ভঙ্গিমা প্রোটিনের সকল জীব রাসায়নিক আচরণ ব্যাখ্যা করতেও সমর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে, প্রোটিনের প্রাথমিক গঠনে যে সকল বল ক্রিয়া করে সেসব ছাড়াও আরো কিছু ভৌত রাসায়নিক বলের প্রভাবে প্রোটিন অণুতে পলিপেপটাইড লহরগুলি এক অভিনব কুণ্ডলীকৃত সর্পিলাকার (coiled helical structure) প্রাপ্ত হয়। প্রোটিনের এই সর্পিলাকার গঠন কাঠামোতে হাইড্রোজেন বন্ধনীর (hydrogen bond) এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর একই সাথে দুটি তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণুর (যেমন ফ্লুরিণ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) সাথে যুক্ত হবার প্রবণতা থেকেই হাইড্রোজেন বন্ধনীর জন্ম। হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে মোটে একটি ইলেকট্রণ। হাইড্রোজেন যখন এই ইলেকট্রণটির দ্বারা সমযোজ্যতা (cova- lency)-র মাধ্যমে কোনো তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলটির পরমাণুটি হাইড্রোজেন ও তার মধ্যেকার ইলেকট্রণ যুগলকে (electron pair) নিজের দিকে বেশির ভাগ টেনে নিতে সমর্থ হয়। ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুটি খানিকটা ধনাত্মক আধান প্রাপ্ত হয়। এই ধনাত্মক আধানের জন্যই হাইড্রোজেন পরমাণু তখন অপর কোন ঋণাত্মক পরমাণুকে স্থিরতড়িদীয় বলে আকর্ষণ করতে পারে এবং সৃষ্ট হয় হাইড্রোজেন বন্ধনী। এখানে হাইড্রোজেন পরমাণুটি দুটি তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণুর মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করে বলে একে হাইড্রোজেন সেতুও (hydrogen bridge) বলা হয়। হাইড্রোজেন বন্ধনীর প্রভাবে এক বা একাধিক অণুর সমষ্টিটি (aggregate) অধিকতর সুস্থায়ী হয়। নীচে (চিত্র ২-১৫) অর্থো-নাইট্রোফেনলের আন্তঃ আণবিক (intramolecular) হাইড্রোজেন বন্ধনী এবং প্যারা নাইট্রোফে

নলের অন্তর আণবিক (intermolecular) হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে 'দ্বি-অণুক সমষ্টি' বা ডাইমার (dimer) গঠন দেখানো হয়েছে।
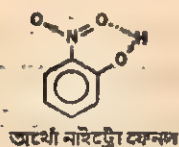
অর্থো নাইট্রো ফেনল
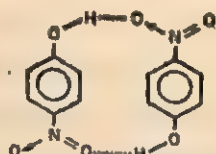
হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে প্যারানাইট্রো ফেনলের ডাইমার গঠন

$>C=O \cdots H-N<$

পেপটাইড শৃঙ্খলে হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠন

----- হাইড্রোজেন বন্ধনী

চিত্র ২-১৫

স্বতন্ত্রভাবে হাইড্রোজেন বন্ধনী খুবই দুর্বল ; এর বন্ধনী শক্তি (bond energy) প্রতি 'গ্রাম অণু'তে মাত্র ৫ থেকে ১০ কিলো ক্যালোরি (5-10 K. cal./mole)। কিন্তু প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিডের মতো অতিকায় অণুতে একে অন্যকে মিলিত প্রয়াসে শক্তিশালী করে তোলে এবং প্রোটিনের সর্পিল গঠনকে (helical structure) সুস্থায়ী হতে সাহায্য করে। পলিপেপটাইড লহরে হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠিত হয় সাধারণতঃ একটি পেপটাইডের নাইট্রোজেন সংলগ্ন হাইড্রোজেন পরমাণু এবং অপর একটি পেপটাইডের দ্বিযোজী (double bonded) অক্সিজেন পরমাণুর সাথে (চিত্র ২-১৫ দ্রষ্টব্য)। আদর্শ কুণ্ডলাকার (helical) প্রোটিনের একটি পূর্ণপাক-এ (a complete turn) গড়ে ৩·৭টি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। পলিপেপটাইড লহরে প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিড কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা (central axis) বরাবর ১'৪৭ অ্যাংস্ট্রম (Angstrom) একক দৈর্ঘ্য দখল করে থাকে, এবং প্রতি তৃতীয় অ্যামাইড মূলকটি শৃঙ্খল (chain) বরাবর হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। প্রোটিনের দ্বিতীয় পর্যায়ের গঠন ভঙ্গিমার এই হাইড্রোজেন বন্ধনী আন্তঃ আণবিক ধরণের (intramolecular)। প্রোটিনের কুণ্ডলাকার গঠনকে (helical arrangement) বিস্তৃত শৃঙ্খলে (extended chain) পরিণত করতে হলে এই দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ধনীগুলো ভাঙ্গা দরকার। সম্ভবতঃ এই কারণেই অনেক প্রোটিন অতি সহজেই প্রসারিত হতে (stretch) পারে।

কুণ্ডলাকার বা বিস্তৃত শৃঙ্খল পলিপেপটাইড অণু কিভাবে একে অপরের সাপেক্ষে বিন্যস্ত থাকে তাই নিয়ে প্রোটিনের তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা। একাধিক কুণ্ডল (helices) বৈদ্যুতিক তারের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে থাকতে পারে। আবার বিস্তৃত শৃঙ্খল পলিপেপটাইড একে অন্যের সমান্তরালে জুড়ে গিয়ে জড়ানো চাদরের আকার (pleated sheets) নিতে পারে। আবার এও হতে পারে যে কুণ্ডলাকার ও বিস্তৃত শৃঙ্খল অণুগুলি পরস্পর জড়িয়ে পেঁচিয়ে এক অপরূপ ভঙ্গিমা নেয়। তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমার এ সকল ক্ষেত্রেই অন্তর আণবিক (inter molecular) হাইড্রোজেন বন্ধনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পলিপেপটাইড কুণ্ডলীটি (helix) আবার আরো অন্যান্য অসমযোজী (non covalent) বন্ধনী দ্বারা দৃঢ় হয়। এই সকল পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াও (interaction) প্রোটিনের তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা বা টার্শিয়ারী স্ট্রাকচারের (tertiary structure) অন্তর্গত। প্রোটিনের তৃতীয় গঠন ভঙ্গিমায় নিম্নলিখিত অসমযোজী প্রতিক্রিয়াগুলির (non-covalent interactions) ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বিপরীত আধান বাহী মূলকের (যেমন $-{}^{+}NH_3$ এবং $-COO^{-}$) মধ্যে স্থিরতড়িৎদীয় আকর্ষণ ছাড়াও রয়েছে দৈশিক প্রতিক্রিয়া (steric interactions) এবং ভাণ্ডারওয়ালস্ প্রতিক্রিয়া (vanderwaals interactions)। যাহোক, জৈবিক ক্রিয়াকলাপে প্রোটিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমার ভূমিকা অপরিহার্য ও সুনির্দিষ্ট। সাইটোপ্লাজমের অনেক ধর্মই প্রোটিন অণুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়।

জীবের জীবনে জল যেমন অপরিহার্য, প্রোটিনের গঠন ভঙ্গিমায়ও তেমনি জলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, প্রোটিন অণুর সাথে জল হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। প্রোটিনের বিভিন্ন অংশের সাথে ব্যাপকহারে হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠন করে জল অধিকাংশ প্রোটিন অণুকেই দৃশ্যতঃ বেষ্টন করে থাকে। আর প্রোটিনের কাজ করবার জন্য তো জলীয় পরিবেশ (aqueous environment) একান্ত প্রয়োজন।

উপসংহারে, প্রোটিনের তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা বলা দরকার। প্রোটিন কুণ্ডলীতে পাকের সংখ্যা এবং আভ্যন্তরীণ বন্ধনী (internal bonding) যত কম থাকে প্রোটিন অণুর মধ্যে ডাইসালফাইড

কৌণিক যোজকের সম্ভাবনাও ততই বাড়ে। সুতরাং দীর্ঘাকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত কম কুণ্ডলীকৃত সূত্রাকার (fibrous) প্রোটিন সমূহ বিভিন্ন দুর্বল যোগ-সূত্রের মাধ্যমে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা দেখায় ; এবং ফলস্বরূপ প্রোটিনের দ্রবণ অন্যান্য পদার্থের দ্রবণের চাইতে অধিকতর আঁঠালো এবং সান্দ্র (viscous) হতে দেখা যায়। এই কারণেই কোষের সাইটোপ্লাজম একটি চটচটে কলয়ডীয় (viscous colloidal) পদার্থ। আবার যেহেতু pH, তাপাংক, লবণের ঘনত্ব, (salt concentration) ইত্যাদির পরিবর্তন কৌণিক যোজকের প্রকৃতি এবং সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে সেহেতু এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাত্রা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ও নির্ভর করবে। এবং বিভাজনশীল কোষ বা অ্যামিবার মত কোষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমূহ যেমন—আকার, সান্দ্রতা (viscosity), গতিপ্রবাহ ইত্যাদি কলয়ডীয় দ্রবণের গুণাবলীর সাপেক্ষে বোঝা যাবে। সাম্প্রতিক কালে কোষের এই সকল উপআণুবীক্ষণিক গঠন (sub-microscopic structure) অনেক চিত্তাকর্ষক গবেষণার ক্ষেত্র রচনা করেছে।

সংশোধন ঃ

৪১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সপ্তম লাইনে 'ঋণাত্মক' স্থলে 'ধনাত্মক', আর অষ্টম লাইনে 'ধনাত্মক' স্থলে 'ঋণাত্মক' হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোষের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ ঃ —এনজাইম

এনজাইমের নামকরণ—বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব—এনজাইম অনুঘটিত বিক্রিয়ায় pH-এর প্রভাব—এনজাইম-সাবস্ট্রেট জটিল—এনজাইম নিবারণ—এনজাইমীয় ক্রিয়াকলাপে ভিটামিন এবং কতিপয় মৌলিক পদার্থের ভূমিকা ঃ কোএনজাইম।

এনজাইম হচ্ছে জৈব অনুঘটক (biocatalyst) যা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার পরিবর্তিত করে কিন্তু অন্তিম 'বিক্রিয়াজাত পদার্থে' (final product)-র প্রকৃতি প্রভাবিত করে না। রাসায়নিক প্রকৃতিতে এনজাইম হল প্রোটিন অণু বিশেষ। (এনজাইম সবক্ষেত্রেই গোলাকার শ্রেণীর প্রোটিন, globular protein)। বিক্রিয়া-জাত পদার্থের প্রকৃতি প্রভাবিত না করলেও এনজাইম কিন্তু বিক্রিয়ায় অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

অনুঘটকের তা জৈবই হোক আর অজৈবই হোক, নিম্নলিখিত গুণাবলী অবশ্যই থাকবে। যেমন,

(১) খুব কম পরিমাণেই এরা কার্যকরী হবে।

(২) বিক্রিয়ার শেষে অনুঘটক ওজনে ও রাসায়নিক সংযুতিতে (mass & chemical composition) অপরিবর্তিত থাকবে।

(৩) অনুঘটক বিক্রিয়া শুরু করতে পারে না বা উভমুখী বিক্রিয়ার (reversible reaction) সাম্যাবস্থা প্রভাবিত করে না; কেবলমাত্র বিক্রিয়ার বেগ ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করে সাম্যাবস্থা স্থাপন দ্রুততর বা বিলম্বিত করে। অতএব, বলা যেতে পারে একটি প্রকৃত অনুঘটক বিক্রিয়ার বেগ উভয় দিকেই সমহারে বৃদ্ধি বা হ্রাস করে।

(৪) অনুঘটকের রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রভাবিত করবার ক্ষমতা 'সুনির্দিষ্ট'। অর্থাৎ, কোন একটি বিশেষ অনুঘটক বিশেষ ধরণের বিক্রিয়াকেই কেবলমাত্র প্রভাবান্বিত করতে পারে।

এনজাইমের অনুঘটন ক্ষমতা (catalytic power) নির্ণয়ের জন্য প্রতি একক সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ এনজাইমের দ্বারা কতখানি প্রারম্ভিক বিক্রিয়ক পদার্থ বা সাবস্ট্রেট (Substrate) বিক্রিয়াজাত পদার্থে (product) রূপান্তরিত হয় তা জানা দরকার। বিক্রিয়ক পদার্থের এই পরিমাণকে বলা হয় এনজাইমের বিনিয়োগ সংখ্যা বা টার্ণ ওভার নাম্বার (turn over number)। নিম্ন লিখিত রূপে এর সংজ্ঞা দেওয়া যায়ঃ এক 'গ্রাম-অণু' (mole) এনজাইম কর্তৃক প্রতি মিনিটে যত 'গ্রাম অণু' বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়াজাত পদার্থে পরিণত হয় সেই সংখ্যাটিকে বলা হয় উক্ত এনজাইমের বিনিয়োগ সংখ্যা। এনজাইমের বিনিয়োগ সংখ্যার পরিসর বিরাট ;—একশত থেকে ত্রিশলক্ষ পর্যন্ত এর মান হতে পারে।

অনুঘটকের দ্বিতীয় ধর্মটি অজৈব অনুঘটকদের বেলায় যতদূর প্রযোজ্য, এনজাইমের বেলা ততদূর খাটে না। কারণ অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই এনজাইম পুরোপুরি সুস্থায়ী (Stable) নয়। প্রোটিন অতিশয় অস্থায়ী পদার্থ (unstable) ; উচ্চতাপমাত্রায় এবং খুব ক্ষারীয় বা আম্লিক মাধ্যমে সহজেই নিষ্ক্রিয় এবং বিকৃত হয়ে যায়।

গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে বিভিন্ন কোষ থেকে নানান ধরণের এনজাইম পৃথকীকরণের ব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে। আর এর ফলে কোষীয় ক্রিয়াকলাপের জটিলতার বাইরে এনজাইমের ক্রিয়াপ্রণালী (mechanism of action) সম্পর্কে গবেষণা সম্ভবপর হয়েছে। কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাটী অ্যাসিড, এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাকের বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়াও ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

এনজাইমের নামকরণ (Naming Enzymes) :

এনজাইম কী ধরণের বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে বা বিক্রিয়ক পদার্থ (substrate) টি কি তা জানা থাকলে এনজাইমের নামকরণ খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়। —এজ (—ase) প্রত্যয় এনজাইম নির্দেশ করে। যেমন, হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিভঞ্জন অনুঘটিত (catalyse) করে যে এনজাইম তার নাম ক্যাটালেজ (Catalase) ; জারণ বিক্রিয়ায় (Oxidation) অনুঘটক রূপে কাজ করে যে এনজাইম তার নাম অক্সিডেজ (oxidase)। আবার প্রোটিনের বিভঞ্জন বিক্রিয়া (breakdown)-য় সহায়তা করে যে এনজাইম তাকে

বলা হয় প্রোটিনেজ (Proteinase) ; ইউরিয়া আর্দ্রবিশ্লেষিত করে যে এনজাইম তার নাম ইউরিয়েজ (urease), ইত্যাদি।

বিক্রিয়ার হারের উপর উষ্ণতার প্রভাব (Effect of temperature on reaction rate) :

কোষীয় পদার্থের অণুগুলি সর্বদাই অবিরাম ছোটাছুটি করছে ; তাপমাত্রা যত বাড়ে এই তাপীয় গতিবেগও (thermal motion) ততই বাড়ে। বিক্রিয়ার সংঘর্ষ তত্ত্ব (collision theory of reactions) অনুযায়ী যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটে তখনই ওদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এনজাইম বিহীন কোন দ্রবণে আণবিক সংঘর্ষ (molecular collision) থেকে বিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা খুবই কম ; কিন্তু যদি যথোপযুক্ত এনজাইমটি দ্রবণে উপস্থিত থাকে তাহলে এই সম্ভাবনা (probability) খুব বেড়ে যায়। এখন তাহলে মূল প্রশ্ন হল ঃ এনজাইম কী উপায়ে এই অসাধারণ অনুঘটকীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে ? সম্ভবতঃ এর উত্তর হল এই যে, এনজাইম বিক্রিয়ক পদার্থটির (সাবস্ট্রেট) অণুকে পরিবেশের অন্যান্য অণুর প্রতি অধিকতর সক্রিয় ও বিক্রিয়াপ্রবণ করে তোলে।

যেসব রাসায়নিক যৌগ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, দেখা গেছে তারা সকলেই কমবেশী পরিমাণে সুস্থির ; আর অসুস্থির (un-table) অণুগুলির প্রবণতাই হ'ল পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অণুর সাথে বিক্রিয়া করে অধিকতর সুস্থায়ী যৌগ গঠন করা। সুস্থির অণুগুলিও অবশ্য বিক্রিয়া করতে পারে যদি তাদের অতিরিক্ত শক্তি (energy) প্রদানে সক্রিয় (activated) করা হয়। এ ব্যাপারে আরহেনিয়াস-ই প্রথম দেখান যে, কোন বিশেষ অণুদলে সকল অণুরই গতীয় শক্তি (kinetic energy) সমান নয়। কিছু সংখ্যক অণু সংঘর্ষের (collision) মাধ্যমে অধিক শক্তি অর্জন করে এবং এই অধিক শক্তিশালী (energy-rich) অণুগুলিরই কম শক্তিবিশিষ্ট অণুর চাইতে বিক্রিয়া করার ক্ষমতা বেশী। ঘুরিয়ে বলতে গেলে অণুকে বিক্রিয়ার জন্য একটি শক্তিগত বাধা (energy barrier) অতিক্রম করতে হয় এবং এই শক্তিগত বাধার পরিমাণ যত বেশী অণুর বিক্রিয়া করার প্রবণতা ততই কম হয়। এই বাধা অতিক্রম করতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হয় তাকে বলে 'এনার্জি অব্ অ্যাকটিভেশন' (energy of activation) বা 'সক্রিয়ণ শক্তি'। প্রকৃতপক্ষে, সকল বিক্রিয়াতেই বিক্রিয়ক

পদার্থটি বা পদার্থগুলির জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত সক্রিয়ণ শক্তি, যার অভাবে কোন মতেই বিক্রিয়াটি সংঘটিত হতে পারে না। যেমন, কয়লা অক্সিজেনে পুড়লে এই বিক্রিয়াটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ তাপশক্তি উদ্ভূত হতে পারে। অর্থাৎ, বিক্রিয়াটি তাপগতি বিদ্যার (Thermodynamics) বিচারে স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) ভাবেই হওয়া উচিত। কিন্তু কয়লার গোলায় কয়লা বাতাসের প্রচুর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয়ই পড়ে থাকতে পারে যদি না আগুন লাগানো হয় অর্থাৎ আগুনের সাহায্যে সক্রিয়ণ শক্তি প্রদান করা হয়।

৩-১ নং চিত্রে একটি কাল্পনিক বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ধরা যাক, এই বিক্রিয়ায় একটি পদার্থ (ক) পদার্থ (খ)-তে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই চিত্রটি সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; শক্তিগত বাধার (energy barrier) পরিমাণ অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হবে। এখানে লক্ষণীয় যে (ক)-কে (খ)-তে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য প্রথমে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সক্রিয়ণ শক্তি অর্জন করে সক্রিয় অণু ক* গঠন করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ক* রূপান্তরিত হবে খ-তে। এখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্বাভাবিক হার কোন বিশেষ মুহূর্তে কতগুলো সক্রিয় অণু (ক*) আছে তার সংখ্যা (ক*-এর ঘনত্ব) এবং প্রতি একক সময়ে তাদের মূল বিক্রিয়াজাত পদার্থ (product) (খ)-তে রূপান্তরের হারের (গ) উপর নির্ভর করে।
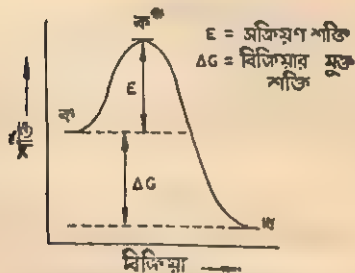
চিত্র ৩-১ :
রাসায়নিক বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি

অর্থাৎ, বিক্রিয়ার পরম হার = (ক*).গ।

এক্ষেত্রে গ একটি ধ্রুবক সংখ্যা। বিক্রিয়ার পরম হার (absolute rate) নির্ণয়ের জন্য আমাদের প্রথমে সক্রিয় অণু ক*-র ঘনত্ব নির্ণয়ের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এখন আমরা জানি, সক্রিয় অণুর (activated molecules) সংখ্যা সক্রিয়ণ শক্তির ব্যস্তানুপাতিক। অতএব, বিক্রিয়ার হারকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে :

বিক্রিয়ার হার (Rate of reaction) $= A.e^{-E/RT}$,

এই $e^{-E/RT}$ হ'ল বোল্টজ্‌ম্যান গুণনীয়ক (Boltzmann factor); নির্দিষ্ট পরম তাপমাত্রা T ডিগ্রীতে মোট অণুসংখ্যার কতভাগ সক্রিয়ণ শক্তি (E)-র সমান বা বেশী শক্তি প্রাপ্ত হ'ল এই ফ্যাক্টর তার নির্দেশক। R গ্যাসধ্রুবক এবং A প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে প্রতি একক সময়ে T°K তাপমাত্রায় অণুগুলির সংঘর্ষের সংখ্যার সমানুপাতিক একটি ধ্রুবক সংখ্যা। বিভিন্ন তাপাংকে বিক্রিয়ার বেগ লক্ষ্য করে E (সক্রিয়ণ শক্তি) নির্ণয় করা যায়। y-অক্ষ বরাবর বিক্রিয়ার হারের লগারিদম (logarithm) এবং x-অক্ষ বরাবর পরম তাপাংকের অন্যোন্যক $\left(\frac{1}{T}\right)$ বসিয়ে লেখ চিত্র অংকন করলে
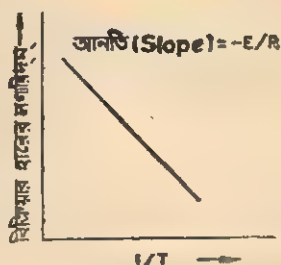
চিত্র ৩-২ ঃ
বিভিন্ন তাপাংকে বিক্রিয়ার হারের লগারিদম্‌ পরম তাপাংকের অন্যোন্যকের বিপক্ষে বসিয়ে (plotting) লেখচিত্রের সাহায্যে সক্রিয়ণ শক্তি নির্ণয় করা হয়।

একটি সরলরেখা পাওয়া যায় যার আনতির মাত্রা (slope) হল $(-E/R)$; অর্থাৎ,

বিক্রিয়ার হারের লগ (ln Rate) = লগ A (ln A) $-\frac{E}{R}\times\frac{1}{T}$ (চিত্র নং ৩-২ দ্রষ্টব্য)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্বতঃই প্রতীয়মান যে তাপাংক বাড়ালে বিক্রিয়ার হার লগারিদমীয় হারে (logarithmically) বৃদ্ধি পাবে। সাধারণতঃ দেখা যায় সমসত্ত্ব তাপীয় বিক্রিয়ার (homogeneous thermal reactions) ক্ষেত্রে প্রতি দশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিক্রিয়ার বেগ দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পায় ঃ

$k_{t+10}/k_t \simeq 2$ to 3, k বিক্রিয়ার বেগ নির্দেশ করছে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সক্রিয় (activated) অণুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে

উপরে 'বিক্রিয়ার হার' বলতে 'হার ধ্রুবক' (Rate constant) বোঝানো হয়েছে।

থাকে ; কেননা তাপমাত্রা বাড়লে অণুগুলির গতি দ্রুততর হয় এবং পারস্পরিক সংঘর্ষের সংখ্যাও যায় বেড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অণুগুলির ঘূর্ণন এবং কম্পনও (rotation and vibration) বৃদ্ধি পায় ; এবং এই সকল প্রক্রিয়ার ফলে পদার্থের অণুগুলি অধিক সংখ্যায় বিক্রিয়া করবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে পারে।

এখন আমাদের প্রশ্ন হল এনজাইম-অনুঘটিত (enzyme-catalysed) বিক্রিয়ায় এ সবের কী ভূমিকা আছে ? এনজাইমের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে এরা বিক্রিয়কের সক্রিয়ণশক্তি খুব কমিয়ে-দিতে পারে। ফলে, বিক্রিয়াসমূহ সাধারণ শারীরিক তাপাংকেই (ordinary physiological temperatures) ঘটতে পারে। ঠিক কীভাবে এনজাইম এ' কার্য সম্পাদন করে তা এখনও অজ্ঞাত। তবে এনজাইমদের প্রতি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ এই কারণে যে শক্তিগত বাধার দরুণ যে সকল বিক্রিয়া সাধারণতঃ স্ফুটনাংকে (100°C) ঘটবার কথা সেসব বিক্রিয়া এনজাইমদের সহায়তায় সাধারণ তাপমাত্রায় অনেক সহজে কোষেই ঘটতে পারে।

উদ্দিষ্ট বিক্রিয়াজাত পদার্থে (product) পরিণত হবার পূর্বে বিক্রিয়ক সক্রিয়ণ শক্তি সংগ্রহ করে যে উদ্দীপিত জটিলে (activated complex) রূপান্তরিত হয় তা পৃথকীকরণ অধিকাংশ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই দুরূহ এবং এখনও অসম্ভব। বিভিন্ন তাপাংকে সম্পন্ন এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়ার গতি সম্পর্কিত গবেষণা থেকে আমরা কেবলমাত্র ঐ উদ্দীপিত জটিল সম্পর্কে কিছু অনুমান করতে পারি। সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া যেভাবে উষ্ণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়, এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়াও ঠিক একইভাবে তাপাংক দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে উচ্চ তাপাংকে তাপশক্তির প্রবণতা দেখা দেয়, এবং এর ফলে এনজাইম ধ্বংস বা বিকৃত করবার
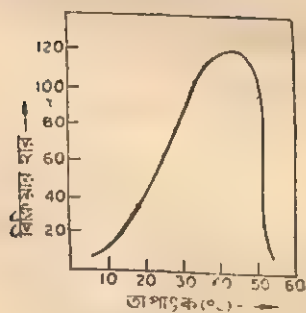
চিত্র ৩-৩ : এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়ার বেগের উপর তাপাংকের প্রভাব।

বিক্রিয়া আর অগ্রসর হতে পারে না। সকল জৈবিক প্রক্রিয়ারই তাই একটি বিশেষ অনুকূল তাপমাত্রা (optimum temperature) আছে যে তাপমাত্রায় প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়। এবং একটি নির্দিষ্ট সন্ধি-তাপমাত্রার (critical temperature) উর্দ্ধে এনজাইম কাজ করতে পারে না। ৩-৩ নং চিত্রে একটি প্রকল্পিত বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরূপে বিক্রিয়ার হার শূন্য ডিগ্রী থেকে ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অবধি দ্রুত লগারিদমীয় হারে বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু ২৫ ডিগ্রীর উর্দ্ধে এই বৃদ্ধির হার শ্লথ এবং ৩৭ ডিগ্রী থেকে বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেতে থাকে। এই প্রতিকূল তাপমাত্রা বেশীক্ষণ রাখা হলে এনজাইমটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

এনজাইমের এইরূপ তাপ নির্ভরশীলতা জীবের ব্যবহারকে অনেক সীমিত করেছে। অধিকাংশ কোষই চল্লিশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার উর্দ্ধে বিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কতিপয় জীব যাদের তাপ-প্রতিরোধক (heat resistant) এনজাইম আছে তারাই কেবলমাত্র অত্যধিক উত্তপ্ত স্থানে বেঁচে থাকতে পারে। অধিকাংশ কোষেই বিপাক-ক্রিয়ার হার এবং ফলে জৈবনিক প্রক্রিয়ার (life-processes) তীব্রতা (intensity) বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন ঋতুতে তাপমাত্রার বিভিন্নতার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। অধিকাংশ জীবের শীতকালীন বিপাকক্রিয়ার (winter metabolism) হার ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং অবশেষে এমন একটি অবস্থায় এসে পেঁছোয় যখন সুষুপ্তি (dormancy) অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। উষ্ণ-শোণিত জীব যথা মানুষ এবং আর কিছু মেরুদন্ডী প্রাণীই কেবল তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারে।

এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়ায় pH-এর প্রভাব ঃ যে কোনো এনজাইমই একটি বিশেষ অনুকূল pH-এ (optimum pH) সর্বাধিক কার্যকরী হয়। আমরা আগেই দেখেছি pH-এর পরিবর্তনে প্রোটিনের গঠন ভঙ্গিমার পরিবর্তন হয়। এনজাইম যেহেতু প্রোটিন, pH-এর পরিবর্তনে এর আণবিক আকৃতি বদলাবে ; এবং একটি বিশেষ pH-এ একটি বিশেষ আকৃতিতেই এনজাইম বিক্রিয়কের সঙ্গে নিবিড় সংবদ্ধতা প্রাপ্ত হবে। অন্তঃকোষীয় (intracellular) এনজাইমগুলি সাধারণতঃ প্রশম pH-এ (pH ৭-এ) সর্বাধিক কার্যকরী হয়।

আর বহিঃকোষীয় (Extracellular) এনজাইমগুলি, বিশেষতঃ যারা পরিপাক-ক্রিয়ায় সহায়ক হয় (অনেক অস্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করে এরা) অতিরিক্ত
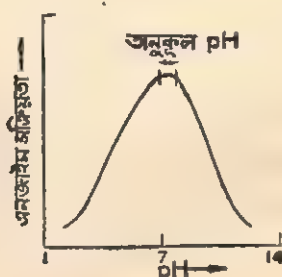
চিত্র ৩-(a) :
এনজাইম সক্রিয়তায় pH-এর প্রভাব

আম্লিক বা ক্ষারীয় পরিবেশে কার্যকরী হতে পারে। যেমন পাকস্থলীর আম্লিক পরিবেশে ক্রিয়াশীল এনজাইম পেপসিন ২ থেকে ৩ pH-এ সর্বাধিক কার্যকর।

এনজাইম-বিক্রিয়ক জটিল (Enzyme-Substrate complex) :

পূর্ব আলোচনা থেকে এবিষয়টি সম্ভবতঃ বোঝা গেছে যে সক্রিয়ণ শক্তি কমানো ছাড়াও এনজাইম আরো কিছু কাজ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কি প্রকারে একটি বিশেষ বিক্রিয়কের বিপাক সম্পন্ন হবে এনজাইম তা নির্ধারণ করে এবং বিক্রিয়ককে বিপাকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করে। বিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য বিক্রিয়ক অণুকে 'বিশেষ এনজাইম' টির খুব কাছাকাছি আসতে হয়। এনজাইমের সাথে যুক্ত হওয়ার দরুণ বিক্রিয়ক অণুর কতিপয় যোজকের (bond) বিকৃতি (deformation) ঘটে সম্ভবতঃ, এবং এর ফলে বিপাকক্রিয়ার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুঘটন বিক্রিয়া শুরু হবার পূর্বে বিক্রিয়ককে অবশ্যই এনজাইমের সাথে যুক্ত হতে হবে—এ ধারণা বহু দিনের এবং এর সপক্ষে বহু পরীক্ষালব্ধ তথ্য-প্রমাণও রয়েছে। অনুঘটন বিক্রিয়া শুরু হবার পূর্বেই যদি এনজাইম-বিক্রিয়ক মিলন ঘটে, তাহলে এ ব্যাপারে আণবিক সংঘর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই আছে, একথা অনায়াসে বলা চলে। এনজাইম অণুগুলি আকৃতিতে

অতিকায়, সে তুলনায় বিক্রিয়ক অণুগুলি অতি ক্ষুদ্র। অতএব, বিক্রিয়ককে এনজাইমের সাথে মিলিত হতে হলে বিক্রিয়ক অণুর সংখ্যা অনেক বেশী হতে হবে ; এবং এর ফলে কার্যকরী সংঘর্ষের (correct collision) সম্ভাব্যতা (Probability) বৃদ্ধি পাবে।

বিক্রিয়ক অণুর বিভিন্ন পরিমাণ নিয়ে কোন এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়া পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে বিক্রিয়ার বেগ সত্যি সত্যিই বিক্রিয়কের ঘনত্বের সাথে সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়, অন্ততঃ বিক্রিয়ক-ঘনত্বের একটি নির্দিষ্ট
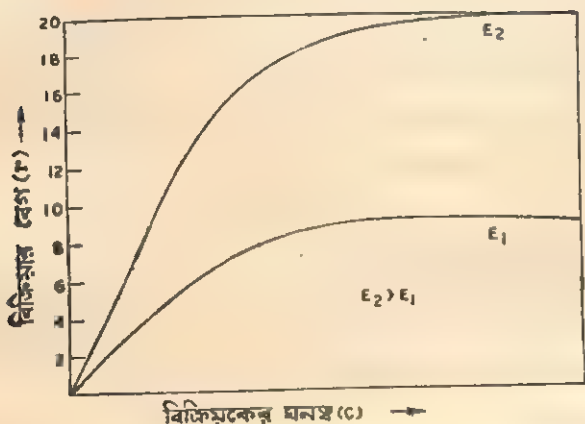
চিত্র ৩-৪

এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়ার বেগের উপর বিক্রিয়কের ঘনত্বের প্রভাব

সীমার (range) মধ্যে (চিত্র নং ৩-৪ দ্রষ্টব্য)। বিক্রিয়াবেগের লেখ চিত্রটি (Rate curve) প্রথমে প্রায় খাড়াভাবে এগোতে থাকে এবং পরে আনতির মাত্রা কমে যায় এবং অবশেষে একটি সর্বোচ্চ ধ্রুবক মানে (constant maximum value) এসে আর পরিবর্তিত হয় না। বিক্রিয়ক-ঘনত্ব বাড়ালে পরে যখন আর বিক্রিয়ার বেগ বাড়ে না তখন আমরা ধরে নিই যে এনজাইমের সক্রিয়দেশ (active surface) এবারে বিক্রিয়ক অণুদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়েছে। ৩-৪ নং চিত্রে এনজাইমের দু'রকম ঘনত্ব (E_1 এবং E_2) নিয়ে বিক্রিয়ার বেগ দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে বিক্রিয়ার সর্বোচ্চ বেগ (maximum rate, r_m) এনজাইম-ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল।

এনজাইম এবং বিক্রিয়কের সংযুক্তি (combination) একটি অতি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ; প্রতিটি উৎসেচকেরই (এনজাইম) একটি **সুনির্দিষ্ট সক্রিয় দেশ** (unique active surface) আছে এবং এই সক্রিয় অঞ্চলের কেবলমাত্র বিশেষ স্থানগুলিতেই বিক্রিয়ক অণু যুক্ত হতে পারে। আমরা আগেই জেনেছি প্রোটিনের গঠন ভঙ্গিমা অসাধারণ রকম পেঁচালো এবং ভাঁজবিশিষ্ট (unusual folded surface)। এইজন্য কেবলমাত্র অতি সুনির্দিষ্ট আকৃতির বিক্রিয়ক অণুগুলিই এনজাইমের কোনো বিশেষ অঞ্চলে প্রবেশাধিকার পেতে পারে। এই অতি-সুনির্দিষ্টতার কারণে এনজাইম-বিক্রিয়ক জটিল (complex)-কে সাধারণতঃ তালাচাবির সাথে তুলনা করা হয় ; ৩-৫ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে বিক্রিয়ক অণুটি চাবির অনুরূপ।

কোনো এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়াকে আমরা নিম্নরূপে প্রকাশ করতে পারি ঃ
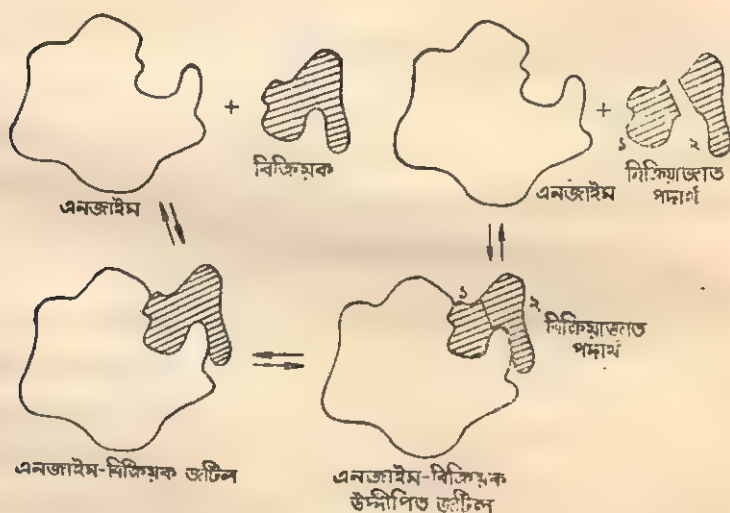
চিত্র ৩-৫ ঃ

এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়া প্রণালী

$$\underset{(\text{এনজাইম})}{E} + \underset{\text{বিক্রিয়ক}}{S} \underset{K_2}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} \underset{\text{এনজাইম-বিক্রিয়ক জটিল}}{ES} \xrightarrow{K_3} E' + \text{বিক্রিয়াজাত পদার্থ}$$
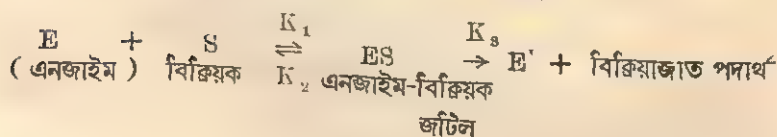
এখানে E এবং S মিলিত হয়ে ES গঠনের বেগ ধ্রুবক K_1, এবং K_2 বিপরীত মুখী প্রক্রিয়া অর্থাৎ ES বিয়োজিত হয়ে E এবং S পুনর্গঠনের বেগ ধ্রুবক নির্দেশ করছে। এনজাইম-বিক্রিয়ক জটিলের (ES) বিক্রিয়াজাত পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার বেগ ধ্রুবককে K_3 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এনজাইম এবং বিক্রিয়ক সংযুক্তির ফলে ES গঠিত হয়ে গেলে আমরা ধরে নিই যে যথেষ্ট সক্রিয়ণশক্তি (activation energy) অর্জিত হয়েছে এবং ফলস্বরূপ ES-জটিল বিক্রিয়াজাত পদার্থে (Product) রূপান্তরিত হতে পারে; বিক্রিয়াজাত পদার্থ এনজাইমের সক্রিয়দেশ থেকে নির্গত হলে এনজাইমটি মুক্ত হয় এবং পুনরায় নতুন বিক্রিয়ক অণুর সাথে যুক্ত হতে পারে। বিক্রিয়কের ঘনত্ব কম থাকলে কিছু এনজাইম সর্বদাই মুক্ত থাকে এবং বিক্রিয়ার সর্বোচ্চ হার পরিলক্ষিত হয় না। যথেষ্ট পরিমাণ বিক্রিয়কের উপস্থিতিতে এনজাইমের সবটাই ES-জটিল-এ রূপান্তরিত হয় এবং বিক্রিয়াটি সর্বোচ্চ হারে সংঘটিত হয়।

এনজাইম নিবারণ (Enzyme Inhibition) ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে এনজাইম-বিক্রিয়ক সংযুক্তি একটি অতি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। এবং আমরা একথা মনে করি যে কোন একটি বিশেষ এনজাইম এবং তার বিক্রিয়কের আকৃতি একে অন্যের পরিপূরক, নইলে তারা পরস্পর যুক্ত হতে পারবে না। অন্য কথায়, প্রোটিন অণুর সাধারণ বিন্যাস ভঙ্গী এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে বিক্রিয়ক অণু এনজাইমের বিশেষ সক্রিয় স্থানটিতে যুক্ত হতে পারে। এনজাইম ঘটিত বিক্রিয়ার এই সুনির্দিষ্টতা এবং আকৃতিগত দিক দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক নিবারণ (Competitive inhibition) প্রক্রিয়া সুন্দর ভাবে বোঝানো যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার জন্য, উদাহরণ স্বরূপ, সাকসিনিক ডিহাইড্রোজেনেজ (Succinic dehydrogenase) এনজাইমটি নেওয়া যাক। এই এনজাইমটি সাকসিনিক অ্যাসিডের জারণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

এখন সাকসিনিক অ্যাসিড $\left(\begin{array}{l} CH_2.COOH \\ | \\ CH_2.COOH \end{array}\right)$ এবং সাকসিনিক ডিহাইড্রোজেনেজের বিক্রিয়ায় যদি ম্যালোনিক অ্যাসিড $\left(CH_2 \begin{array}{l} \diagup COOH \\ \diagdown COOH \end{array}\right)$ (ম্যালোনিক অ্যাসিডের গঠন সাকসিনিক অ্যাসিডের অনুরূপ) মেশানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে এনজাইমটির কার্যকারিতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। পরীক্ষা

দ্বারা দেখা গেছে ম্যালোনিক অ্যাসিডের কোনরকম পরিবর্তন বাইরে থেকে লক্ষিত না হলেও এটি স্পষ্টতঃ এনজাইমের সক্রিয়স্থানে নিজেকে যুক্ত করে, সাধারণ অবস্থায় যেখানে সাকসিনিক অ্যাসিড অণুর মিলিত হওয়ার কথা। এবং ফলস্বরূপ এনজাইমের সক্রিয় স্থল (active region) দখলের জন্য সাকসিনিক অ্যাসিড এবং ম্যালোনিক অ্যাসিডের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।
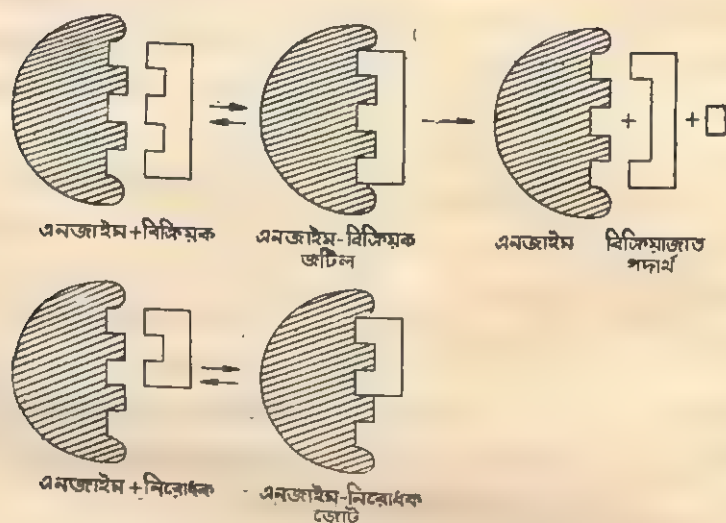
চিত্র ৩-৬ :

প্রতিযোগিতা মূলক নিবারণ (Competitive inhibition)

পূর্বোল্লেখিত তালা চাবি সাদৃশ্যের মত ৩-৬ নং চিত্রে এনজাইম এবং বিক্রিয়ক পরস্পর যথাযথ 'রাসায়নিক সংবদ্ধতা' (exact chemical fit) অর্জনে সক্ষম। নিরোধক ম্যালোনিক অ্যাসিডের গঠন বিক্রিয়ক সাকসিনিক অ্যাসিডের সদৃশ হওয়ায় এনজাইমের সক্রিয়দেশের অন্ততঃ কিছুটাও নিরোধক দখল করতে পারে এবং ঐ অঞ্চলে বিক্রিয়ক ও এনজাইমের মিলনে বাধাদান করে। এইরূপে নিরোধক এনজাইমকে অনুঘটকীয় ক্রিয়া থেকে বিরত করে। যেহেতু, বিক্রিয়ক এবং নিরোধক একই সক্রিয়দেশ দখলের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, নিবারণের মাত্রা (degree of inhibition) নির্ভর করে বিক্রিয়ক এবং

নিরোধকের (inhibitor) আপেক্ষিক ঘনত্বের উপর। যদি বিক্রিয়ক অধিকতর পরিমাণে থাকে, তাহলে নিরোধকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং ফলস্বরূপ এস্থলে কোন রকম 'নিবারণ' লক্ষিত হবে না। একথা মনে রেখে কোন পদার্থ 'প্রতিযোগী নিরোধকের' মত কাজ করে কিনা নির্ণয় করা যেতে পারে ; এজন্য বিক্রিয়কের ঘনত্ব ক্রমশঃ বাড়ানো হয় যতক্ষণ না 'নিবারণ' সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। এনজাইমের প্রতি বিক্রিয়ক এবং নিরোধকের আপেক্ষিক আসক্তির (relative affinity) বিষয়টিও বিবেচিত হওয়া দরকার। উদাহরণ স্বরূপ, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নিবারণের জন্য কোন উৎসেচকীয় বিক্রিয়ায় নিরোধক অণুর সংখ্যা বিক্রিয়ক অণুর সংখ্যার চেয়ে বেশী হওয়া দরকার ; কারণ এনজাইমের প্রতি নিরোধকের আসক্তি বিক্রিয়ক অণুর আসক্তির চেয়ে কম হতে পারে।

কোন কোন এনজাইমের ক্ষেত্রে নিরোধক অণুটি এনজাইমটির সক্রিয় অঞ্চলে সরাসরি যুক্ত না হয়ে দ্বিতীয় কোনো অঞ্চলে (second site) এমনভাবে যুক্ত হয় যাতে সক্রিয় অঞ্চলটি পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। একে বলে অ্যালোস্টেরিক প্রভাব (allosteric effect)। এই প্রভাবের ফলে এনজাইমের ক্রিয়া যেমন নিবারিত হতে পারে তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এনজাইমটি অধিকতর সক্রিয়ও হয়ে উঠতে পারে।

প্রতিযোগী নিরোধকের (Competitive inhibitors) সংখ্যা সুপ্রচুর এবং এদের কেউ কেউ আবার তীব্র জীবাণু প্রতিষেধক (antibacterial agent) ও বটে। এমন একটি নিরোধক হল সালফানিল্যামাইড (চিত্র ৩-৭)। এই যৌগটি একশ্রেণীর জীবাণুর বৃদ্ধির (growth) জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমীয় ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত করতে পারে এবং ফলস্বরূপ সালফানিল্যামাইডের উপস্থিতিতে ঐ জীবাণু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই জন্যই এই যৌগটি কোন কোন জীবাণুঘটিত রোগে ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বি-শ্রেণীর ভিটামিন প্যারা অ্যামাইনো বেনজোয়িক অ্যাসিড (PABA, চিত্র ৩-৭) সালফানিল্যামাইডের এই প্রতিরোধ (এনজাইমীয় ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ) অপসারিত করতে পারে।

আবার কার্বন মনোক্সাইড কোষীয় শ্বাসক্রিয়ায় (cellular respiration) অপরিহার্য এনজাইম সাইটোক্রোম অক্সিডেজ-এর ক্রিয়া প্রতিহত করতে সক্ষম।

এর ফলে জীবের মৃত্যুও হতে পারে। (কার্বন মনোক্সাইড স্তন্যপায়ী জীবের হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন পরিবহন ব্যাহত করেও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।)
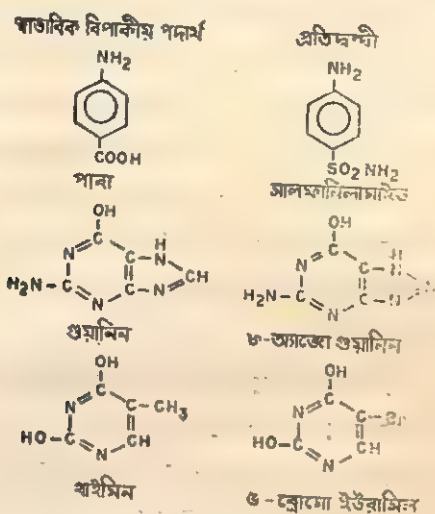
চিত্র ৩-৭

বিপাকীয় প্রতিদ্বন্দ্বী (Metabolic autagonists)

সালফানিল্যামাইড এবং অন্যান্য জীবাণুনাশকের সাফল্য একটি সুবর্ণ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বিজ্ঞানীদের কাছে এবং তাঁরা আশা করেছিলেন যে রোগ উৎপাদনকারী জীব সমূহ (disease producing organisms) এমন কি ক্যান্সার পর্যন্ত প্রতিবিপাকীয় পদ্ধতিতে দমন করা সম্ভব হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা গেছে আশ্রয়দাতা (host) কোষ এবং রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু উভয়েরই 'এনজাইম-প্রণালী' প্রায় একই রকম। এর অর্থই হল এই যে পরিবর্তিত ভিটামিন বা সাবস্ট্রেট যা জীবাণু দমন করতে প্রয়োগ করা হবে তা আগের মতই আশ্রয়দাতা কোষের পক্ষে হবে সমান ক্ষতিকর। যেহেতু আশ্রয়দাতা কোষ এবং তার শত্রুর এনজাইমীয় বিক্রিয়ায় কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছেই তাই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলে এমন রাসায়নিক পদার্থ বার করা অবশ্যই সম্ভব হবে যা আশ্রয়দাতা কোষের কোনোরকম ক্ষতিসাধন করার পূর্বেই রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু

ধ্বংস করবে। উদাহরণস্বরূপ পাবা (PABA)-র কথা বলা যেতে পারে; এটি ফলিক অ্যাসিডের (folic acid) একটি অপরিহার্য অংশ এবং জীব ও উদ্ভিদ উভয়েরই মিথাইল মূলক স্থানান্তর করণে ফলিক অ্যাসিড বিশেষ ভূমিকা নেয়। দেখা গেছে, কোন কোন ব্যাকটেরিয়া আশ্রয়দাতা কোষের তুলনায় সালফা ড্রাগের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল (sensitive)। কারণটা অবশ্য বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়, তবে একথা ঠিক যে এক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত ধরণের প্রভেদ বর্তমান।

এনজাইমীয় ক্রিয়াপ্রণালীর (mechanism) জট খোলার জন্য জীব-রসায়নবিদগণ (biochemists) সাধারণতঃ বিপাকীয় প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য এনজাইম নিরোধক নিয়োগ করে থাকেন। এনজাইম এবং সাবস্ট্রেটের মধ্যে আমরা যখন 'নিবিড় নিবদ্ধতা'-র (close fit) কথা বলি তখন আমরা প্রকৃত পক্ষে একথাই বোঝাই যে কিছু সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক মূলক এনজাইমে অবশ্যই বিশেষ উপায়ে বিন্যস্ত আছে। অতএব, এমন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারের দিকে গবেষকদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে যা (ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ) এনজাইমের বিশেষ মূলক গুলির সাথে সুনির্দিষ্ট ভাবে (specifically) যুক্ত হতে পারে। এই সকল মূলক যদি অনুঘটকীয় ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হয় তবে এ ক্ষেত্রে নিরোধ (inhibition) লক্ষিত হবে। সারণী নং ৩-১-এ এই রকম কিছু রাসায়নিক পদার্থ যে এনজাইমকে ওরা প্রতিরোধ করে (inhibit) তার এক একটি উদাহরণসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে কোন কোন ক্ষেত্রে এনজাইম-নিরোধক জোটটি (enzyme-inhibitor combination) সুস্থায়ী; সুতরাং প্রোটিন ক্বাথ হতে নির্ধারণ করা যায় কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডটির সাথে নিরোধক যুক্ত হয়েছে। স্পষ্টতঃই এই জাতীয় নিবারণ প্রতিযোগিতামূলক নয়।

সারণী ৩-১ ঃ এনজাইম নিবারক সমূহ (Enzyme inhibitors)

নিবারক	এনজাইমের যে মূলক প্রভাবিত হয়	এনজাইমের উদাহরণ
পারদ ও রৌপ্য	—SH এবং অ্যানায়ন	গ্লুটামিক হাইড্রোজেনেজ
কার্বন মনোক্সাইড	মেটালোপরফাইরিন	সাইটোক্রোম অক্সিডেজ
সায়ানাইড এবং অ্যাজাইড	মেটালোপরফাইরিন (metalloporphyrin) এবং ধাতব পদার্থ	ক্যাটালেজ
সাইট্রেট, অক্সালেট	ধাতবপদার্থ (metals) অপসারিত করে	হেক্সোকাইনেজ
প্যারা-ক্লোরোমার্কিউরি বেনজোয়িক অ্যাসিড	—SH	ইউরিয়েজ
আয়োডো অ্যাসেটিক অ্যাসিড	—SH এবং অন্যান্য	ট্রায়োজ ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ
ডাই আইসোপ্রোপাইল ফ্লুয়োরো ফসফেট	সেরীণের হাইড্রোক্সিল মূলকের সাথে যুক্ত হয়	কিমোট্রিপসিন

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে উপরে যে সকল বিকারকের (Reagent) নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাদের অধিকাংশকেই সাধারণতঃ বিষ (poison) রূপে গণ্য করা হয়। সায়ানাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড জাতীয় যৌগ সাইটোক্রোম (লৌহ ঘটিত অনুঘটক)-এর সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেনে ইলেকট্রণের পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। সাম্প্রতিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় ডাই আইসোপ্রোপাইল ফসফোফ্লুরিডেট বা ডি পি এফ (DPF)-কে সাফল্যের সহিত এনজাইম-নিবারক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রোটিনেজ কিমোট্রিপসিন এবং ডিপিএফের সংযুক্তির সময় এক অণু নিবারক যুক্ত হয় এক অণু এনজাইমের সাথে ; ফলস্বরূপ এনজাইমের অনুঘটকীয় ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। প্রোটিন-নিরোধক জটিল (protein-inhibitor complex) বিয়োজিত করে ডি পি এফ-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্রাকার পেপটাইড (৬টি অ্যামাইনো অ্যাসিড বিশিষ্ট) পৃথক করা যায়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে

একথাই প্রতীয়মান হয় যে সেরিণ এবং হিস্টিডিন এই অ্যামাইনো অ্যাসিডদ্বয় সম্ভবতঃ অনুঘটন অঞ্চলের (catalytic site) সাথে সম্পর্কযুক্ত। মজার বিষয় এই যে, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুঘটকীয় ক্রিয়া বিশিষ্ট কয়েকটি এনজাইমের প্রত্যেকেরই অনুঘটন অঞ্চলের সাথে যুক্ত রয়েছে এই একই অ্যামাইনো অ্যাসিড ছয়টি।

$$\begin{matrix}(CH_3)_2-CH-O \\ (CH_3)_2-CH-O\end{matrix}\!\!>P\begin{matrix}=O \\ -F\end{matrix}$$

DPF

$$\begin{matrix}R-O \\ R-O\end{matrix}\!\!>\overset{O}{\overset{\|}{P}}-F+HO-\text{protein}\longrightarrow\begin{matrix}R-O \\ R-O\end{matrix}\!\!>\overset{O}{\overset{\|}{P}}-O-\text{protein}+HF$$

DPF — এনজাইম — প্রোটিন-নিরোধক জটিল
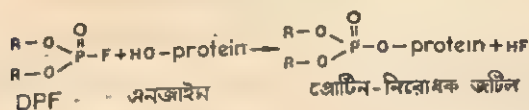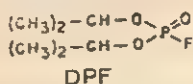
চিত্র ৩-৮ ঃ

সুনির্দিষ্ট মূলকবিশিষ্ট বিক্রিয়কের (specific group reagent) দ্বারা এনজাইমের নিবারণ

বর্তমানে এনজাইমীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত কৌশল (mechanism) সম্পর্কিত গবেষণায় প্রোটিন অণুর সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াশীল মূলক এবং পার্শ্ববর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে ওদের সম্পর্কের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড পর্যায়ক্রম (Amino acid sequence) এবং সক্রিয় অঞ্চল (active site) টির রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রোটিনের অনুঘটকীয় ক্রিয়ার কোন রকম পরিবর্তন না ঘটিয়েই পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থেকে এক বা একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বার করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রোটিনের অভ্যন্তরে অবশ্যই একটি সক্রিয় অঞ্চল রয়েছে এবং পুরো প্রোটিনটি অনুঘটকীয় ক্রিয়ার জন্য মোটেই অপরিহার্য নয়।

আবার কখনও কখনও দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র পেপটাইড অপসারিত করলে প্রোটিনের অনুঘটকীয় ক্রিয়া বিনষ্ট হয়; কিন্তু বিক্রিয়ক মিশ্রণে (reaction mixture) সমপরিমাণ ঐ পেপটাইডটি যোগ করলে প্রোটিনাংশটি (protein residue) পুনরায় অনুঘটকীয় ক্রিয়া ফিরে পায়। এই অবস্থায় যেহেতু কোন পেপটাইড গ্রন্থী গঠন সম্ভব নয়, অতএব হাইড্রোজেন বন্ধনী এবং অন্যান্য

অ-সমযোজী যোজক অবশ্যই 'অনুঘটন অঞ্চল' পুনরুদ্ধারে অত্যাবশ্যক। এনজাইমের ক্রিয়াকলাপে প্রোটিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা (secondary and tertiary structures) যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এই সত্য সেই মতবাদকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের কোন অংশ অপসারিত করলে বা বদলালে এনজাইমের সুনির্দিষ্টতা (specificity) বিনষ্ট বা ব্যাহত হয় কিনা তা আগামী দিনের গবেষকরা নির্ণয় করবেন।

এনজাইম উদ্দীপক—সহপ্রভাবক (Cofactor) ঃ

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ এনজাইমকে যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট্ট আরেকটি অ-প্রোটিন অণু বা আয়নের সাথে যুক্ত হতে (associated) হয়; এই ছোট্ট আয়ন বা অণুটিকে বলা হয় কো-ফ্যাক্‌টর (cofactor) বা কো-এনজাইম (co-enzyme)।

এই এনজাইম উদ্দীপকরা অজৈব বা জৈব (Inorganic or Organic) যেকোন শ্রেণীরই হতে পারে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ধাতব আয়ন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ, লৌহের আয়ন ইলেকট্রণ পরিবহনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়; আবার ফসফেট মূলক স্থানান্তরকরণে ম্যাগনেশিয়াম আয়ন অপরিহার্য।

আর জৈব শ্রেণীর এনজাইম-সহায়কদের মধ্যে নিউক্লিওটাইড আর ভিটামিন (রাইবোফ্লেবিন, থিয়ামিন, ইত্যাদি) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কোষে শক্তি রূপান্তর—বিপাকীয় শক্তি

সকল শক্তির মূল উৎস সৌর শক্তি—স্বনির্ভর ও পরনির্ভর কোষ—বিক্রিয়ার মুক্তশক্তি—মুক্তশক্তি ও সমতা ধ্রুবক—জারণ-বিজারণ—জারণ ও শক্তি—শক্তি-সমৃদ্ধ যোজক—সকল জৈব প্রক্রিয়াই ATP'র শক্তির উপর নির্ভরশীল।

জীব কোষে যে সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তার জন্য প্রতিনিয়তই কোষের শক্তি প্রয়োজন হয়। এই সকল শক্তিরই মূল উৎস হল সৌর শক্তি। সবুজ উদ্ভিদ কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট সৌর শক্তির সাহায্যে সরলতর অজৈব যৌগ থেকে বিভিন্ন জটিল জৈব যৌগ তৈরী করে কোষে শক্তি সঞ্চিত করে রাখে। কোষীয় শ্বাসক্রিয়ার সময় এই সকল জৈব যৌগগুলি ভেঙ্গে গিয়ে সরলতর অজৈব যৌগ উৎপন্ন করে এবং সঞ্চিত শক্তি মুক্ত করে, যার দ্বারা কোষ তার বিভিন্ন ধরণের জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।
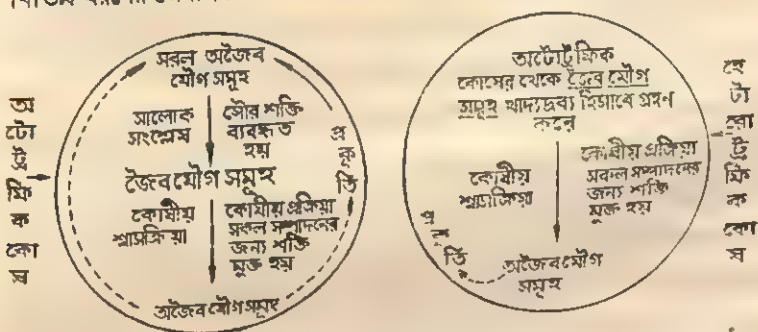
চিত্র ৪ ১

এই পরিপ্রেক্ষিতে কোষকে দুশ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম শ্রেণীর কোষ সৌরালোকের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে নিজেদের জটিল খাদ্য দ্রব্যগুলি নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে এবং এই জটিল জৈব যৌগগুলি থেকেই কোষীয় ক্রিয়া প্রক্রিয়া চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে থাকে। এরা হল স্বনির্ভর 'অটোট্রফিক কোষ' (autotrophic cell)। আর যারা সালোক সংশ্লেষ করতে পারে না, অর্থাৎ নিজেদের খাদ্য দ্রব্য নিজেরা তৈরী

করতে পারে না তারা হ'ল পরনির্ভর 'হেটারোট্রফিক কোষ' (heterotrophic cell)। এই হেটারোট্রোফিক কোষকে নিজের খাদ্য দ্রব্যের জন্য অটোট্রোফিক কোষের উপর নির্ভর করতে হয়।

কোষে শক্তি রূপান্তরের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো আলোচনার পূর্বে শক্তি রূপান্তরের মূল নীতি ও উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পুষ্টিকর দ্রব্যাদি (nutrients) কোষ পর্দা দিয়ে অনুপ্রবেশের পর কোষের বিপাক যন্ত্রে অর্থাৎ একটি নতুন পরিবেশে গিয়ে পড়ে। বিপাক যন্ত্রের প্রার্থমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পুষ্টিকর দ্রব্যগুলিকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং সাথে সাথে এমন সকল কার্বন কাঠামো (carbon skeleton) তৈরী করা যা কোষের অত্যাবশ্যক যৌগসকল সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন। তাহলে এখন জানা দরকার কী করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শক্তির উদ্ভব হয়।

পরমাণুগুলিকে বা সরলতর অণুসমূহকে সুনির্দিষ্ট যোজকের সাহায্যে যুক্ত করে বৃহত্তর অণুগঠন করতে হলে অবশ্যই সক্রিয়ণ শক্তির (activation energy) প্রয়োজন। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পরমাণুকে একত্রিত করে সুস্থায়ী অণুগঠনের জন্য বাইরের কোন উৎস থেকে শক্তি (energy) সরবরাহ করার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিতে শক্তি রূপান্তরের (energy conversion) একটি মৌলিক দৃষ্টান্ত হল, সূর্যালোকের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং জলকে একত্রিত করে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কার্বোহাইড্রেট অণুতে (high energy Carbohydrates) পরিণত করা। আলোক রশ্মির শক্তি, এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক বন্ধনী গঠনে ব্যবহৃত হয়। এই সকল বন্ধনী বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যখন ভাঙ্গে তখন যে শক্তি পরমাণুদের সংযুক্ত করার জন্য ব্যয়িত হয়েছিল তা মুক্তি লাভ করে (liberated) এবং এই শক্তিকে অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। এখন আমাদের জানতে হবে এইরূপে যখন কোন জীবে (organism) বিপাক ক্রিয়াকালে কিছু নির্দিষ্ট পারমাণবিক যোজক ভাঙ্গে (অর্থাৎ বিয়োজিত হয়) তখন কোন শক্তির উদ্ভব হয় কিনা, আর হলে সেই শক্তি এমন কোন রূপে থাকে কিনা যার সাহায্যে জৈব ক্রিয়া (biological work) সম্পাদন করা সম্ভব।

অতএব, যখন কোন পদার্থ 'ক' পদার্থ 'খ' তে রূপান্তরিত হয় তখন আমাদের অবশ্যই জানা দরকার শক্তি মুক্ত হচ্ছে না যুক্ত হচ্ছে। মনে করা যাক ক'র শক্তি বিশেষ কোন একটি স্তর (level)-এ রয়েছে। এখন যদি ক'র খ-তে রূপান্তর কালে শক্তির উদ্ভব হয় তবে একথা বলা হয় যে খ'র শক্তি স্তর (energy level) ক'র নীচে অবস্থিত এবং এই উৎপন্ন শক্তির মান ঋণাত্মক (minus value) ধরা হয়। কিন্তু যদি ক-থেকে খ'র রূপান্তরে বাহ্যিকশক্তির প্রয়োজন হয় তবে খ-কে শক্তির দিক থেকে (energetically) ক'র চাইতে অধিকতর ধনাত্মক বলা হয়। শক্তি যদি উৎপন্ন হয় তবে তার পুরোটাই অথবা কিছুটা অন্যান্য জৈব ক্রিয়া পরিচালনে সক্ষম কিনা আমরা জানতে চেষ্টা করি। এই শক্তিকে বলা হয় 'প্রয়োগ ক্ষম শক্তি' বা মুক্ত শক্তি (free energy)। এই শক্তি আক্ষরিক অর্থে পরিবেশে নির্গত হয় না, বরং বিশেষ যোজক শক্তি (special bond energy) রূপে সংরক্ষিত হয়—যা আবার অন্য অণুতে প্রবেশ লাভ করে নতুন যোজক (bond) গঠনে ব্যবহৃত হয়।

মুক্ত শক্তির (ফ্রি এনার্জী) দুটি দিক আছে যা বাঁধের (dam) উপর দিয়ে পতিত জল থেকে প্রাপ্ত শক্তির সাথে তুলনায় অতি সহজেই বোঝানো যেতে পারে। প্রথম বিষয়টি হল ঃ যে দূরত্বটা জলকে অতিক্রম করতে হয়; আর দ্বিতীয়টি যে পরিমাণ জল বাঁধের উপর থেকে পতিত হয় তা। এই দুটির গুণফল কৃতকার্যের (work done) সমান। জুল (Joule) তার বিখ্যাত পরীক্ষায় নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে প্যাডেল (paddle)-এর উপর জল পড়তে দিয়ে জলের তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। এই পরীক্ষার সাহায্যে জুল তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক (mechanical equivalent of heat) নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। এক গ্রাম জলের এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১৪.৫° থেকে ১৫.৫°C) তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপকে বলে এক ক্যালোরি (১৫° ক্যালোরি) এবং এক ক্যালোরি তাপ ৪.১৮০ জুল (Joules) কার্যের সমতুল্য। অর্থাৎ, এক ক্যালোরি তাপশক্তি = ৪.১৮ জুল যান্ত্রিক শক্তি বা কাজ।

এখন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি এক বালতি জল যত উঁচু থেকেই ফেলা হোক না কেন খুবই সামান্য পরিমাণ কাজ করতে পারবে। বেশ খানিকটা কাজ করবার জন্য চাই যথোপযুক্ত প্রবাহ (flow) এবং এজন্যে দরকার সুবৃহৎ

জলাধার। অন্য কথায়, যে আধারে নিবদ্ধ শক্তির (শক্তি বিভব, energy potential) পরিমাণ যেমন, তার কার্য ক্ষমতা ও তদনুরূপ।
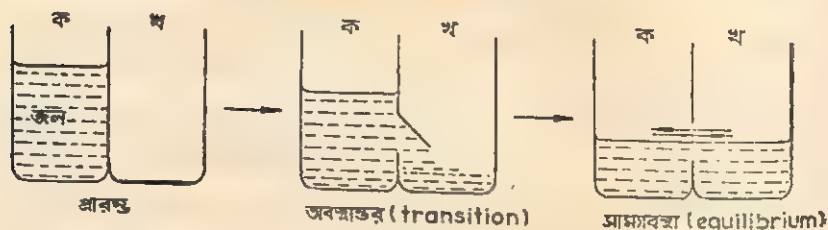
চিত্র ৪-২ ঃ

জল এক আধার থেকে আরেক আধারে (ক→খ) প্রবাহিত হওয়ার সময় কাজ করতে পারে। প্রাপ্য শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে কতটা জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং কতটা দূরত্ব অতিক্রম করছে তার উপর। সাম্যাবস্থায় 'ক'-থেকে-খ-তে প্রবাহের হার খ-থেকে ক-তে প্রবাহের হারের সমান হয় এবং এক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে কোন কাজ (net work) পাওয়া সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ জলাধার নেওয়া যাক (চিত্র ৪-২)। এক্ষেত্রে দ্বার উন্মুক্ত করলে জল 'ক' থেকে 'খ' তে প্রবাহিত হয়ে কার্য সম্পাদন করবে যতক্ষণ না বিপরীত প্রবাহ (খ থেকে ক-তে) পূর্বোক্ত প্রবাহের সমান হয়। এই উভমুখী প্রক্রিয়া (reversible process) যখন সাম্যাবস্থায় পেঁছোবে তখন আর কোন কাজ পাওয়া যাবে না এবং সামগ্রিকভাবে মুক্তশক্তির কোন পরিবর্তনও হবে না (no net free energy change)। ধরা যাক, কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক' র খ-তে রূপান্তর ঘটছে; এক্ষেত্রে সাম্যাবস্থা পর্যন্ত কতটা 'ক' 'খ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে তা যদি জানা থাকে তাহলে উৎপন্ন মুক্ত শক্তির পরিমাণও গণনা করা যায়। অতএব, দেখা যাচ্ছে উৎপন্ন মুক্ত শক্তির সাথে বিক্রিয়াটি কতদূর অগ্রসর হয়েছে (extent of reaction) তার একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা সমতা ধ্রুবকের (equilibrium constant) সাহায্যে এই সম্পর্ক প্রকাশ করতে পারি। [সমতা ধ্রুবক হল বিক্রিয়াজাত পদার্থ 'খ' এবং বিক্রিয়ক পদার্থ 'ক'-র ঘনত্বের (সাম্যাবস্থায় থাকাকালীন) অনুপাত]। মুক্ত শক্তি এবং সমতা ধ্রুবকের আলোচ্য সম্পর্কটি নিম্নরূপ ঃ

$$\Delta G = -RT \ln K$$

এখানে K হচ্ছে সমতা ধ্রুবক ([খ]/[ক]), R=গ্যাস ধ্রুবক (≈২ ক্যালরি), T পরম তাপাংক এবং ΔG মুক্ত শক্তির পরিবর্তন। নিধান (base) দশ ধরে লগারিদম্ ব্যবহার করা হলে সমীকরণের ডান পার্শ্বকে ২·৩০৩ দ্বারা গুণ করে নিতে হবে। অতএব, সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে গিয়ে :

$$\Delta G = -4.606T \log_{10}K$$
$$\approx -4{\cdot}6T \log_{10}K$$

সাম্যাবস্থায় ক'র অধিকাংশ 'খ'তে রূপান্তরিত হলে K'র মান অধিক হবে, ফলে ΔG-র মানও হবে অধিক এবং ঋণাত্মক। ঋণাত্মক চিহ্ন শক্তি উৎপন্ন হয়েছে একথা নির্দেশ করে। কিন্তু সাম্যাবস্থায় যদি ক'র খুব সামান্য অংশই খ'-তে রূপান্তরিত হয় তাহলে সমতা ধ্রুবকের মান একের (১) কম হতে পারে। তখন ΔG হবে ধনাত্মক, যার অর্থ হচ্ছে বিক্রিয়াটি 'খ' থেকে 'ক' তৈরীর অনুকূল অর্থাৎ শক্তিগত দিক থেকে বিপরীত প্রক্রিয়াটিই সম্ভব। কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শক্তির উদ্ভব হলে ($\Delta G = -ve$) আমরা তাকে বলি শক্তি-উদ্গারী বা এক্সারজোনিক প্রক্রিয়া (exergonic process) আর যদি বিক্রিয়াটির জন্য বাহ্যিক শক্তির প্রয়োজন হয় (অর্থাৎ $\Delta G = +ve$) তাহলে ঐ বিক্রিয়াকে আমরা বলি শক্তিশোষক বা শক্তিগ্রাহী (এন্ডারজোনিক, endergonic) বিক্রিয়া।

সমতা ধ্রুবক একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাশি ; কেননা এর থেকে বিক্রিয়া-জাত পদার্থের শক্তির স্তর (enegey level) সম্পর্কে কিছু জানতে পারা যায়। কী উপায়ে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ তা অন্য আধারে প্রেরিত হচ্ছে তা আমাদের সঠিক জানা না থাকলেও বন্ধনী ভাঙ্গার প্রক্রিয়ায় (bond-breaking process) শক্তির দিক থেকে কী প্রত্যাশিত তা সমতা ধ্রুবকের সাহায্যে জানতে পারা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে সমতা ধ্রুবকের পরিমাপ করা সম্ভব নাও হতে পারে ; সেক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য অন্যান্য পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল হতে হয়। জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একথা প্রায় সর্বদাই প্রযোজ্য। আর জৈবিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মুক্তশক্তির পরিবর্তন জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়াতেই ঘটে আর এই পরিবর্তন কার্যের তড়িদীয়

তুল্যাংকের (electrical equivalent of work) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এখন আমরা জানি, জারণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রণ অপসারিত হয় আর বিজারণ হচ্ছে এর ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া ; অর্থাৎ বিজারণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রণ যুক্ত হয়। শক্তির একস্তর থেকে অন্য স্তরে (one energy level to another) অর্থাৎ এক যৌগ থেকে অন্য যৌগে ইলেকট্রণের পরিচলন যেহেতু কোন পরিবাহী তারে বিদ্যুৎ প্রবাহের সমতুল, অতএব জৈবিক জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে অন্যান্য কার্য করা সম্ভব। ইলেকট্রণ পরিচলনে মুক্তশক্তির পরিবর্তন নির্ণয়ের জন্য আমাদের যা জানা দরকার তা'হল ইলেকট্রণের স্থিতিশক্তি স্তরের (potential energy level) পরিবর্তন।

যৌগের ইলেকট্রণ গ্রহণ করার ক্ষমতা বা জারণ ক্ষমতা (oxidising capacity) পরীক্ষা করে কী ভাবে ওদের জারক দ্রব্য বা বিজারক দ্রব্য (oxidising or reducing agent) রূপে শ্রেণীবিভাগ করা হয় সে সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, কোন পদার্থের দ্রবণে ধাতব তড়িদ্দ্বার (metal electrode) স্থাপন করে আমরা নির্ণয় করতে পারি আলোচ্য পদার্থটি উক্ত তড়িদ্দ্বারে ইলেকট্রণ পাঠাচ্ছে কিনা। যদি পাঠায় তাহলে আমরা বলি পদার্থটির ইলেকট্রণ চাপ (electron pressure) তথা বিজারণ ক্ষমতা (reducing power) উক্ত তড়িদ্দ্বারের চেয়ে বেশী। সুবিধে মতো কোন একটি তড়িদ্দ্বারের ইলেকট্রোড বিভব (electrode potential) শূন্য ধরে আমরা জৈবিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বহু যৌগের জারণ-বিজারণ ক্ষমতা আমাদের নির্দ্ধারিত স্কেল অনুযায়ী নির্ণয় করতে পারি। এই ধরণের পরিমাপ থেকে বলা সম্ভব যৌগিক পদার্থ সমূহ একে অন্যের প্রতি কিরূপ আচরণ করবে (অর্থাৎ জারক না বিজারক রূপে ব্যবহার করবে)। এরকম দু'টি যৌগ একত্রিত (coupled) করা হলে বিক্রিয়ায় কতটা পরিমাণ শক্তির উদ্ভব বা শোষণ হবে তা আমরা নির্ণয় করতে পারি যদি পদার্থদ্বয়ের বিভব পার্থক্য (difference in potential, ΔE) আমাদের জানা থাকে। এই অবস্থা বিভিন্ন উচ্চতায় রক্ষিত দুটি জলাধারের সাথে সদৃশ ; তফাৎ এই যে এখানে জলের পরিবর্তে ইলেকট্রণের ব্যবহার হচ্ছে। ইলেকট্রণ প্রবাহের (electron flow) দরুণ মুক্তশক্তির যে পরিবর্তন ঘটে তা নিম্নলিখিত সম্পর্কটি থেকে নির্ণয় করা যায় ঃ

$\Delta G = -nF.\Delta E$;

একটি জারক বা বিজারক অণু যে কটি ইলেকট্রণ গ্রহণ বা বর্জন করছে n হচ্ছে তার সংখ্যা।

F = ফ্যারাডে = 96,500 কুলম্ব

ΔE = বিভব পার্থক্য, ভোল্ট এককে

$\therefore \Delta G = -n \times 96{,}500 \times \Delta E$ ভোল্ট-কুলম্ব বা জুল

$= \frac{-n \times 96{,}500 \times \Delta E}{4{\cdot}18}$ ক্যালোরি ($\because$ 4·18 Joules = 1 Calorie)

$\approx -n \times 23{,}000 \times \Delta E$ ক্যালোরি।

জারণ ও শক্তি (Oxidation & Energy) :

কার্বোহাইড্রেট বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যৌগের জারণ জনিত শক্তিই হচ্ছে অধিকাংশ জীবের শক্তির মূল উৎস। জীব গোষ্ঠী যেহেতু তাপ চালিত এঞ্জিন (heat engine) নয় অতএব এই শক্তি অবশ্যই 'ব্যবহারযোগ্য রূপ' (utilizable form)-এ উদ্ভূত হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, জীব সুনির্দিষ্টভাবে এই শক্তি 'শক্তি-উদ্গারী প্রক্রিয়া' থেকে সংগ্রহ করে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে মুক্তশক্তিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুভবনীয় বস্তু (tangible object) রূপে গণ্য করা হয়—এ যেন এমন এক শক্তিপুট (a package of energy) যার স্থানান্তর সম্ভব। বস্তুতঃ, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণুতে শক্তির পুনর্বণ্টন (redistribution) এমনভাবে ঘটে যে অতিরিক্ত আণবিক বন্ধনী সমূহ (molecular bonds) বিযুক্ত হলে শক্তি তাপ রূপে পরিবেশে নির্গত হয়। এজন্য শক্তি তাপ রূপে অপচয়িত হওয়ার পূর্বেই জীবকে এই শক্তি অন্তর্বর্তী শক্তিসমৃদ্ধ যৌগিক পদার্থে (energy-rich intermediate) রূপান্তরিত করে ফেলতে হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে শক্তি উদ্গারী বিক্রিয়ায় শক্তি সমৃদ্ধমূলক সৃষ্ট হয় ; এই শক্তি সমৃদ্ধমূলকগুলি অত্যন্ত সক্রিয়, যার ফলে নতুন শক্তিগ্রাহী বিক্রিয়ার সূত্রপাত করতে সক্ষম। শক্তিকে তাপরূপে অপচয়িত হতে না দিতে চাইলে শক্তি উৎপাদনকারী বিক্রিয়ার সাথে অবশ্যই শক্তিগ্রাহী (energy consuming) বিক্রিয়াকে যুক্ত (couple) করে দিতে হবে। এইরকম পরিস্থিতিতে শক্তি ঠিক শক্তি রূপে উদ্ভূত (liberated) হয় না, বরং বিক্রিয়ক অণুগুলির মধ্যেই ওর পুনর্বণ্টন ঘটে। ফলে শক্তিগ্রাহী প্রক্রিয়াটি অগ্রসর

হতে পারে। এই জাতীয় জোটবদ্ধ বিক্রিয়ার (coupled reaction) অধিকাংশেরই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি (over-all process) চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

কোষের জারণ বিক্রিয়া হচ্ছে এই ধরণের এক প্রকার প্রক্রিয়া যাতে খুব ক্ষিপ্রতার সাথে শক্তির পুনর্বণ্টন (redistribution) হয় অথবা শক্তি উৎপন্ন (liberated) হয়। যে প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন বা ইলেকট্রণ অপসারিত হয় তাকে আমরা বলি জারণ। জীবকোষের সরলতম প্রকারের জারণ হচ্ছে ডিহাইড্রোজেনেশন (dehydrogenation)—এই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন অপসারিত হয়; যেমন ঘটে অ্যালকোহোলের জারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে:

$$R.CH_2OH \xrightarrow{\text{জারণ}} R.CHO$$
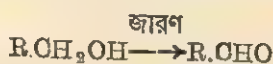
স্বভাবতঃই জারণ বা বিজারণ প্রক্রিয়া এরূপ অর্ধ-বিক্রিয়ার (half-reactions) মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারে না। কোন পদার্থ জারিত হলে, অবশ্যই তার সাথে সাথে অন্য আর একটি পদার্থ বিজারিত হবে এবং বিপরীতক্রমেও একথা সত্য। অর্থাৎ জারণ-বিজারণ যুগপৎ ঘটে। নিম্নলিখিত বিক্রিয়াটিতে AH_2 হচ্ছে বিজারক দ্রব্য (reductant) এবং B ওটিকে জারিত করছে:

$$AH_2 + B \rightleftharpoons A + BH_2$$
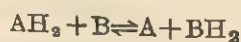
যেহেতু বিক্রিয়াটি উভমুখী, অতএব আমরা ডানদিককার দ্রব্যগুলি নিয়েও বিক্রিয়াটি শুরু করতে পারি। সেক্ষেত্রে BH_2 হবে বিজারক আর A জারক (oxidant)। যে পদার্থসমূহ এই সকল বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদের প্রবণতা হ'ল ইলেকট্রণ বর্জন (eject) নয়তো ইলেকট্রণ গ্রহণ করা। এবং এই প্রবণতা (tendency) তাদের জারণ বা বিজারণ ক্ষমতার সমানুপাতিক। এখন বিক্রিয়ার মুক্তশক্তির সংজ্ঞা দেবার আরেকটি উপায় পাওয়া গেল: ইলেকট্রণ বিজারক দ্রব্য (reducing system) থেকে জারকদ্রব্যে (oxidising system) প্রবাহিত হওয়ার কালে শক্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু এখন আমাদের মূল প্রশ্ন হ'ল ঠিক কীভাবে এই শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে আর কীভাবেই বা তা আবার জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ায় বাঁধা পড়ছে?

একটি বিশেষ উদাহরণের সাহায্যে এর উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক। যে বিক্রিয়াটি নিয়ে এখানে আলোচনা করবো তা হল অ্যালডিহাইডের জারণ। এ প্রসঙ্গে আমরা ধরে নেব যে এনজাইম কীভাবে কাজ করে তা

আমরা জানি ; কেননা অ্যালডিহাইডের অনুঘটকীয় জারণে শক্তি সংগ্রহের (trapping the energy) জন্য এনজাইম আবশ্যক। ৪-৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে প্রায় প্রত্যেক এনজাইমেরই একটি সালফহাইড্রাইলমূলক (—SH group) থাকে। অ্যালডিহাইড অণুটি প্রথমে ওটির অ্যালডিহাইডিক অংশের

$$\begin{matrix} H \\ | \\ (-C=O) \end{matrix}$$

দ্বিযোজী অক্সিজেন পরমাণুর একটি বন্ড বিচ্ছিন্ন করে এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়,—ফলে উৎপন্ন হয় হাইড্রোক্সিল মূলক (—OH) বিশিষ্ট একটি
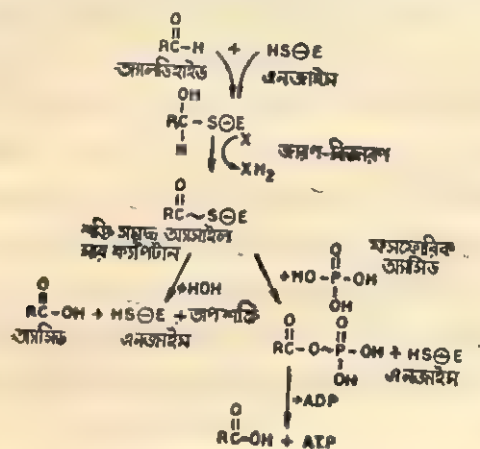
চিত্র ৪-৩ :

আলোচ্য চিত্রে অ্যালডিহাইডের অ্যাসিডে জারণ এবং একটি শক্তিসমৃদ্ধ মূলকের গঠন দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে অ্যালডিহাইডটির জারণে এনজাইমের অন্তর্বর্তী যৌগটিতে একটি শক্তিসমৃদ্ধ যোজক (∼) গঠিত হয়েছে। এই অন্তর্বর্তী যৌগটি (Intermediate) যদি জল দ্বারা বিশ্লেষিত (আর্দ্র বিশ্লেষিত) হয় তবে শক্তি তাপরূপে নির্গত হয়, কিন্তু যদি ফসফেট যৌগ দ্বারা বিশ্লেষিত হয় তাহলে এই শক্তি ফসফেট বন্ডে নিবন্ধ (conserved) হয় এবং এটিপি রূপে সঞ্চয় (store) করে রাখা যায়।

যৌগ যার প্রান্তিক কার্বনে রয়েছে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু। এক্ষেত্রে এনজাইমের সালফহাইড্রাইল মূলকের সালফার পরমাণুটি যুক্ত হয় প্রান্তিক কার্বনের (terminal carbon) সাথে, আর সালফারের সঙ্গী হাইড্রোজেন

পরমাণুটি যায় অ্যালডিহাইড মূলকের অক্সিজেনে, অক্সিজেনের যোজনক্ষমতা (valence) পরিতৃপ্ত (satisfy) করতে।

পরবর্তী পর্য্যায়ে জারণ প্রক্রিয়া ঘটে এবং অণুতে শক্তির পুনর্বণ্টন হয় (কখনও কখনও বলা হয় শক্তি মুক্ত হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এখানে মুক্তাবস্থায় শক্তি উৎপন্ন হয় না); ফলে গঠিত হয় 'শক্তি-গর্ভ বন্ধনী' (energy-rich bond)।

শক্তি-সমৃদ্ধ যোজক (Energy-rich Bonds):

কার্বন ও সালফারের মধ্যেকার যোজকটি (link) জল দ্বারা বিয়োজিত (আর্দ্র বিশ্লেষিত) হলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি তাপরূপে নির্গত হয় (চিত্র ৪-৩)। অণুটি আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গঠন করে একটি অ্যাসিড (কার্বোক্সিল মূলক), এবং —SH (সালফহাইড্রাইল) এনজাইমটি পুনরুৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অ্যালডিহাইডটি জলের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে গঠন করছে একটি অ্যাসিড এবং আরেকটি দ্রব্য বিজারিত হচ্ছে। কিন্তু, জীব যদি চায় যোজকের শক্তি (energy in the bond) কাজে লাগাতে তাহলে শক্তি সমৃদ্ধ মূলকটিকে অবশ্যই অন্য কোন অণুতে গচ্ছিত করতে হবে; অর্থাৎ কার্বন-সালফার যোজকের (link) শক্তি নিয়ে সংশ্লেষণ করতে হবে নতুন আরেকটি যৌগ। জীবের যদি সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য ক্রিয়াশীল মূলকটির (reactive group) তখ্খুনি প্রয়োজন না হয় তাহলে জীব (organism) যোজকের এই শক্তি অন্য কোন রাসায়নিক রূপ (chemical form)-এ সঞ্চয় করে রাখতে পারে; এইরূপে এনজাইমটি মুক্ত হয় এবং যোজক-শক্তি (bond energy) গচ্ছিত হয় কোন রাসায়নিক আধারে (reservoir)। অন্য কোন তন্ত্রের (system) সাথে যোজক শক্তির এই গাঁটছড়া বাঁধাই (coupling) হল জৈবিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মূল চাবিকাঠি (key reaction)। জারণ বিক্রিয়াজাত পদার্থটিকে (একটি অ্যাসাইল মারক্যাপ্টান, acyl mercaptan) আর্দ্রবিশ্লেষিত করার পরিবর্তে ফসফোরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) দ্বারাও বিশ্লেষিত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ফসফেটমূলক যোজক-শক্তির অপচয় নিবারণ করবে; ফলস্বরূপ কার্বন ও ফসফরাসের মধ্যে একটি শক্তি-সমৃদ্ধ যোজক গঠিত হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফসফোরাইলেটেড যৌগ (Phosphorylated Compound) হল অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট বা এডিপি (ADP)।

এটি উপরিউক্ত শক্তি-সমৃদ্ধ মূলকের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে ; এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় এটিপি অর্থাৎ অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট (Adenosine triphosphate)। দেখা গেছে, এটিপি (ATP) সকল প্রাণী, উদ্ভিদ, জীবাণু (microorganisms) ইত্যাদি সবকিছুতেই রয়েছে এবং এই এটিপিই হল জারণমূলক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট শক্তির আদি ভাণ্ডার (initial storehouse)। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন ফসফেট মূলকের এই যোজক শক্তি (bond energy) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনের সমস্ত শক্তিগ্রাহী প্রক্রিয়াই সম্পাদন করে।
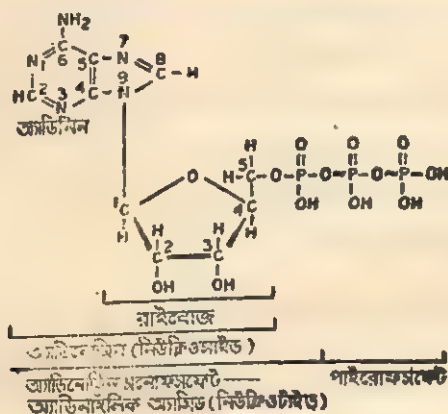
চিত্র ৪-৪ ঃ

অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট। এখানে লক্ষণীয় যে পেণ্টোজ শর্করা রাইবোজ অ্যাডিনিনের সাথে যুক্ত হলে একটি নতুন ধরণের যৌগ গঠিত হয় যাকে আমরা বলি নিউক্লিওসাইড্ (nucleoside)। এর সঙ্গে ফসফেট যুক্ত হলে গঠিত হয় নিউক্লিওটাইড্ (nucleotide)। এই ধরণের নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইড্ প্রচুর রয়েছে যাদের শর্করা-সন্নিহিত ক্ষারকীয় বস্তুটি (base) প্রকৃতিতে ভিন্ন। চিত্রে বিভিন্ন পরমাণু 'সংখ্যা' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে ; এখানে রাইবোজ অ্যাডিনিনের N-৯-এর সাথে যুক্ত আর ফসফেট মূলক যুক্ত রয়েছে রাইবোজের পাঁচ নম্বর কার্বনের সাথে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি জারণ প্রক্রিয়া সম্ভূত শক্তি আবার 'শক্তি-সমৃদ্ধ মূলক' সৃষ্টি করে। পরবর্তী পর্যায়ে বিপাক ক্রিয়া

সম্পর্কে আলোচনা কালে আমরা দেখব এই যোজক শক্তি (বণ্ড এনার্জী) বহু বিক্রিয়ার সাথে (যাদের শক্তি প্রয়োজন) যুক্ত করা (couple) প্রয়োজন ; অন্যথায় ঐ সকল বিক্রিয়া বিশেষ অগ্রসর হতে পারে না। দেখা গেছে এটিপি'র দ্বিতীয় ফসফেট মূলকটিও শক্তি সমৃদ্ধ ; কিন্তু রাইবোজের পঞ্চম কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত তৃতীয় ফসফেট মূলকটি শক্তি সমৃদ্ধ নয়। অতএব, এটিপি দুটি শক্তি-সমৃদ্ধ একক (unit) সরবরাহ করতে সমর্থ। শক্তি-সমৃদ্ধ দুই ফসফেট মূলকের মধ্যেকার যোজকটিকে (যেমন আছে এটিপি-তে) বলে পাইরোফসফেট বণ্ড (pyrophosphate bond) এবং প্রমাণিত হয়েছে জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ার শক্তি সংরক্ষণে এটির গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য। জৈব বিক্রিয়ায় এটিপি'র পাইরোফসফেট বণ্ডের শক্তি কিরূপে ব্যবহৃত হয় তা পরে অনেক উদাহরণসহ আলোচনা করবো। এখানে নীচের চিত্রে (চিত্র ৪-৫) সকল জৈব প্রক্রিয়াই যে ATP-র শক্তির উপর নির্ভরশীল তা সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৪-৫ :

সকল জৈব প্রক্রিয়াই ATP-র শক্তি সাহায্যে সংঘটিত হয়।

প্রান্তীয় ফসফেট মূলকদ্বয় মুক্ত করার (liberate) জন্য এটিপির আর্দ্র বিশ্লেষণ করা হলে প্রচুর পরিমাণ তাপ উদ্ভূত হয়—প্রশম মাধ্যমে অর্থাৎ pH সাত-এ (at pH 7·0) এটিপির প্রান্তীয় পাইরোফসফেট বণ্ডের আর্দ্র বিশ্লেষণের মুক্ত শক্তি প্রায় ৮০০০ ক্যালোরি, যেখানে সাধারণ এস্টারের আর্দ্র বিশ্লেষণের মুক্তশক্তি ১০০০ থেকে ২০০০ ক্যালোরির বেশী নয়।

অতএব, জীবরাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে কি না হচ্ছে তার চেয়ে আমরা সাধারণতঃ যোজক শক্তি (যা অন্য বিক্রিয়া চালানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে) উৎপাদনের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। শক্তি গ্রাহী বিক্রিয়ার সাথে যুক্ত (couple) হতে পারার সামর্থ্য থেকে শক্তি সমৃদ্ধ যোজক চেনা যায়। অ্যালডিহাইডের অ্যাসিডে জারণের সময় শক্তি পুঞ্জাকারে (as packages) নির্গত হয় না, বরং যোজকশক্তি রূপে সংরক্ষিত হয়। অণুতে শক্তির পুনর্বন্টনের আরেকটি উপায় হল জলের অপসারণ (removal of water) এবং এর দ্বারা একটি শক্তিসমৃদ্ধ ফসফেট মূলক গঠন।

শক্তি বিপাকের (energy metabolism) এই আলোচনা থেকে এ ধারণা যেন বদ্ধমূল না হয় যে শক্তিই বিক্রিয়ার একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য। কোষীয় বিপাক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু বিক্রিয়া আছে যারা অত্যন্ত মৌলিক এবং শারীরবৃত্তীয় কাজে দেহের প্রয়োজনীয় অণুসকল গঠন করে। যদিও এই সব প্রক্রিয়ার কোন কোনটি কোন শক্তি উৎপাদনকারী বিক্রিয়াক্রমেরই অংশ বিশেষ, তবুও বিক্রিয়াজাত পদার্থটির গঠন সংযুতি অন্য সংশ্লেষণ বিক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষা থেকে পাস্তুর সিদ্ধান্তে এলেন যে সন্ধান ক্রিয়া ঘটে বায়ুর তথা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে (anaerobically), কিন্তু এক জাতীয় জীবাণুর (microorganism) প্রভাব রয়েছে এর উপরে; এই জীবাণুদের অবর্তমানে কোন প্রকার সন্ধান ক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে না। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে সন্ধানক্রিয়া এক প্রকার জৈবিক প্রক্রিয়া যা কোষের ক্রিয়া কলাপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—এই মত স্বভাবতঃই 'সকল জীবের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন' ল্যাভয়সিয়ারের পূর্ববর্তী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করলো। পাস্তুর বললেন যে আণবিক অক্সিজেনের বিকল্প (substitute) আছে এবং সন্ধানক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে বায়ুর অনুপস্থিতিতে সংঘটিত জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল মাত্র। সন্ধানক্রিয়া জীবের বৃদ্ধি ও বিপাক ক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এই মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পাস্তুরের পরীক্ষা ও লব্ধ তথ্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম।

এর পর সন্ধান ক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে আরো বড়ো রকমের কিছু ঘটতে কুড়ি বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বুক্‌নার (Büchner) ঘটনাক্রমে এমন একটি আবিষ্কার করে ফেললেন যা কেবলমাত্র সন্ধানক্রিয়ার গুপ্ত দ্বারই উন্মুক্ত করলো না, বরং সমগ্র 'এনজাইম রসায়ন বিদ্যার' প্রবেশপথ সহজগম্য করে দিলো। ঘটনাটি নিম্নরূপ: প্রাণিদেহে ইন্‌জেকশন দেবার জন্য বুক্‌নার ঈস্ট (yeast) থেকে প্রোটোপ্লাজমীয় নিষ্কর্ষ (protoplasmic extract) তৈরী করছিলেন—বালুকণার সঙ্গে ঈস্ট মিশিয়ে চূর্ণ করলেন, তাতে মেশালেন আরো কয়েকটি যৌগ এবং সর্বশেষে হাইড্রলিক প্রেসের (hydraulic press) সাহায্যে রস নিংড়ে নিলেন। প্রত্যহ যেহেতু এই পদার্থটি তৈরী করা সুবিধেজনক ছিলনা উনি তাই এই কোষ মুক্ত নির্য্যাসটিকে (cell-free extract) সংরক্ষিত করবার অনেক চেষ্টা করলেন। সাধারণ পচন নিবারক (antiseptic) ব্যবহার করা গেল না, কেননা ঐ নির্য্যাস প্রাণিদেহে ইন্‌জেকশন করতে হবে; তাই উনি সাধারণ লোকের রসায়ন অবলম্বন করলেন—ঐ নির্য্যাসে মেশালেন প্রচুর পরিমাণ শর্করা (চিনি)।

ঈস্ট নির্য্যাসের সাহায্যে ইক্ষুশর্করার (সুক্রোজের) সন্ধান ক্রিয়া হ'ল এবং বুক্‌নারই প্রথম সজীব কোষের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে সন্ধানক্রিয়া দেখালেন। অবশেষে অন্যান্য সকল জৈবপ্রক্রিয়া যেমন বৃদ্ধি, জনন, রেচন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়া
ও
কার্বোহাইড্রেট বিপাক

অ্যালকোহলীয় সন্ধান ক্রিয়া—সন্ধান ক্রিয়া ও সজীব কোষ—জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা—কার্বোহাইড্রেট রসায়ন—কার্বোহাইড্রেট রসায়নে সমসংকেতকতা—গ্লুকোজের ফসফোরিলেশন—গ্লিসের্যালডিহাইড-৩-ফসফেটের জারণ—৩-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিডের বিপাক—সন্ধান প্রক্রিয়ার বিক্রিয়াসমূহের সংক্ষিপ্তসার।

মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সন্ধানক্রিয়া বা গাঁজানো প্রক্রিয়া (fermentation)-র সাহায্যে মদ্য তৈরী করার সাথে সুপরিচিত ; তবু ও ১৮৬০ সনের পূর্ব পর্যন্ত সন্ধানক্রিয়া কেন ঘটে তার সদুত্তর দিতে সক্ষম হয় নি। সে যাহোক, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের অল্প কিছু কাল পূর্বে ফরাসী রসায়নবিদ্ গে-লুসাক শর্করা থেকে কোহলের উৎপাদন নিম্নলিখিত বিক্রিয়াটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন :

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CO_2 + 2CH_3.CH_2OH$$

গ্লুকোজ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইথাইল অ্যালকোহল

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অ্যালকোহলীয় সন্ধান ক্রিয়ার মৌলিক কারণ ও মূল ক্রিয়াপ্রণালী (mechanism) সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তারা মোটামুটি দুটো দলে বিভক্ত হন। একদলের মত হলো প্রক্রিয়াটির প্রকৃতি পুরোপুরি রাসায়নিক ; কিন্তু অন্যদের মতে অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়াটি জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অর্থাৎ জীবাণুর (organism) অসামান্য প্রভাব রয়েছে সন্ধান ক্রিয়া ঘটানোর ব্যাপারে। এই নিয়ে যখন বিতর্ক চলছিল পাস্তুর তখন গবেষণা করছিলেন কী করে দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড আর কোন কোন সুরাসারে (মদে) অ্যাসেটিক অ্যাসিড

(excretion) ইত্যাদি এবং সজীব ঈস্ট কোষে সন্ধান ক্রিয়ার সঙ্গী অন্যান্য জটিলতা মুক্ত নিরপেক্ষ অ্যালকোহলীয় সন্ধান ক্রিয়া দেখানো সম্ভব হল। বুক্‌নারের গবেষণার অল্পকাল পরেই ঈস্ট নির্য্যাসের ধর্ম সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা হয়েছে এবং দেখা গেছে, ঈস্ট নির্য্যাস অনেক শর্করারই (যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুক্‌টোজ, ম্যানোজ, সুক্রোজ এবং মল্টোজ) সন্ধানক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। আরো প্রমাণিত হল যে গ্লুকোজ ঈস্ট নির্য্যাস দ্বারা গে-লুসাকের সমীকরণ অনুযায়ীই ইথাইল অ্যালকোহল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়।

শর্করা ও শ্বেতসার (Carbohydrate)

কার্বোহাইড্রেট বিপাকক্রিয়ার গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে কার্বোহাইড্রেট রসায়ন সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা মুখ্যতঃ তিন প্রকারের। প্রথমতঃ, সরল কার্বোহাইড্রেট অণুগুলি জীবকোষে শক্তির প্রধান উৎস রূপে কাজ করে। তবে, যতদূর জানা গেছে শর্করা বা শ্বেতসার (Sugar or Starch) কোন ক্রমেই দেহ বা স্বতন্ত্রভাবে কোন দেহকোষের পক্ষে অপরিহার্য নয়। দেহকোষ আমিষ (প্রোটিন) বা স্নেহ পদার্থের (fats) বিক্রিয়া থেকেও শক্তি সংগ্রহণে সমর্থ ; এমন কি কার্বনের অন্যান্য যৌগও পারে কোষকে শক্তি সরবরাহ করতে। বাস্তবিকপক্ষে, কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার ও শর্করা) সব চাইতে সস্তা খাদ্য ; আর ঠিক এই কারণেই আমাদের খাদ্যের গড় তালিকায় কার্বোহাইড্রেটের এত বেশী প্রাধান্য। এছাড়া, অপেক্ষাকৃত জটিল কার্বোহাইড্রেট অণুগুলি জীবদেহে মজুদখাদ্য (Storage Compounds) হিসেবে সঞ্চিত থাকতে পারে। তৃতীয়তঃ, কার্বোহাইড্রেট কোষকে সরবরাহ করে মৌল কাঠামো (carbon skeletons) যা প্রোটোপ্লাজমের মূল উপাদানগুলির গঠনে বিশেষ প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, ছয়-কার্বন বিশিষ্ট গ্লুকোজ দু'ভাগ হয়ে দুটি তিন কার্বন বিশিষ্ট যৌগ গঠন করতে পারে এবং এই তিন কার্বন এককগুলি তিন কার্বন কাঠামো বিশিষ্ট অন্যান্য অত্যাবশ্যক যৌগ গঠনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে।

কার্বোহাইড্রেট মূলতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে গঠিত ; এর সাধারণ সংকেত হল $C_x(H_2O)_y$—হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত ২ : ১, যেমন রয়েছে জলে। তবে এমন অনেক কার্বোহাইড্রেট আছে যাতে

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ঃ১ অনুপাতে নেই, যেমন ২-ডিঅক্সি রাইবোজ, $C_5H_{10}O_4$। আবার অনেক যৌগ আছে যাদের আণবিক সংকেত কার্বোহাইড্রেটের মতো $C_x(H_2O)_y$, কিন্তু ওরা কার্বোহাইড্রেট নয়; যেমন ফর্মালডিহাইড (CH_2O), অ্যাসেটিক অ্যাসিড ($C_2H_4O_2$), ইত্যাদি।

দেখা গেছে, সমস্ত কার্বোহাইড্রেটরাই রাসায়নিক প্রকৃতিতে পলিহাইড্রোক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন (polyhydroxy aldehyde or ketone) বা এমন সকল যৌগ যা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে পলিহাইড্রোক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন তৈরী করে।

সরলতর কার্বোহাইড্রেটের নামের শেষে থাকে 'ওজ' (—ose) প্রত্যয়টি—যদি প্রকৃতিতে অ্যালডিহাইড হয় তাহলে বলা হয় অ্যাল্ডোজ (Aldose), আর কিটোন হলে কিটোজ (Ketose); আর অণুতে মোট কার্বন পরমাণুর সংখ্যা গ্রীক সংখ্যা টেট্রা, পেণ্টা ইত্যাদি দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন, অ্যাল্ডোপেণ্টোজ বললে বোঝাবে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট কার্বোহাইড্রেট যা প্রকৃতিতে অ্যালডিহাইড।

কার্বোহাইড্রেটদের মূল দুটি বিভাগে ভাগ করা যায়—শর্করা (Sugars) ও শ্বেতসার (Polysaccharides)। শর্করা কেলাসাকার পদার্থ, জলে দ্রাব্য এবং স্বাদে মিষ্ট। শ্বেতসার শর্করার থেকে অনেক জটিল, আণবিক গুরুত্বও অনেক বেশী। অধিকাংশ শ্বেতসারই অনিয়তাকার (non-crystalline) পদার্থ, জলে অদ্রাব্য বা খুব কম দ্রাব্য এবং মিষ্ট স্বাদও নেই এদের।

শর্করাদের আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ এক-শর্করা ও বহু-শর্করা।

(ক) **এক-শর্করা** (**monosaccharides**)ঃ এদের সাধারণ সংকেত হল $C_nH_{2n}O_n$ ($n = 2$ থেকে 10)—এক-শর্করাদের আর্দ্র বিশ্লেষণ করে ক্ষুদ্রতর অণু পাওয়া সম্ভব নয়। জৈবিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক যৌগ এই শ্রেণীর এবং এরা অনেক জটিলতর কার্বোহাইড্রেটের মূল গঠনমূলক এককও বটে।

সরলতম এক-শর্করা হ'ল গ্লাইকল্যালডিহাইড, $CHO.CH_2OH$। এক-শর্করার একটি অণুতে মোট কটি কার্বন পরমাণু আছে সেই অনুযায়ী এদের ট্রায়োজ (C_3), টেট্রোজ (C_4), পেণ্টোজ (C_5), হেক্সোজ (C_6) ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—এদের কার্বোনিল মূলকটি (carbonyl function)

অ্যালডিহাইডিক না কিটোনিক সেই ভিত্তিতে আগের মতো এদের আবার অ্যাল্ডোজ ও কিটোজ এই দুইভাগে ভাগ করা হয়।

কোষীয় শ্বাসকার্য এবং সালোক সংশ্লেষ বিক্রিয়াক্রমে অন্তর্বর্তী যৌগ হিসেবে ট্রায়োজ শর্করা বিশেষতঃ ট্রায়োজ ফসফেট রূপে অংশগ্রহণ করে। গ্লিসের‍্যালডিহাইড ও ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন যথাক্রমে অ্যাল্ডোট্রায়োজ ও কিটোট্রায়োজের উদাহরণ (চিত্র ৫-১a)। পেণ্টোজ ও হেক্সোজ শর্করারা জৈবিক দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পেণ্টোজ শর্করা রাইবোজ ও ডিঅক্সি রাইবোজ যথাক্রমে RNA ও DNA-এর উপাদান। রাইবোজ ATP-রও উপাদান শর্করা। এছাড়া আরো দুটি পেণ্টোজ শর্করার উদাহরণ হ'ল জাইলোজ (xylose) এবং অ্যারাবিনোজ (arabinose)—গাছের আঠায় পাওয়া যায়। হেক্সোজ শর্করাদের মধ্যে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্লুকোজ কোষে শক্তির তাৎক্ষণিক উৎস হিসেবে কাজ করে।

কার্বোহাইড্রেট রসায়নে আইসোমারিজ্‌ম্‌ (Isomerism) বা সমসংকেতকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক শর্করার কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা এক হওয়া সত্ত্বেও হাইড্রোক্সিল মূলকের বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বা কার্বোনিল মূলকটি কিটোনিক বা অ্যালডিহাইডিক রূপে থাকবার জন্য তারা বিভিন্ন হতে পারে। একই রাসায়নিক সংকেত (chemical formula) কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম বিভিন্ন—এই সকল শর্করাদের বলে একে অন্যের সমসংকেতক বা আইসোমার (isomer)। সমসংকেতকতা এখানে দু'রকম হতে পারে—গঠনমূলক সমসংকেতকতা (structural isomerism) আর আলোক-সমসংকেতকতা (optical isomerism)। আণবিক সংকেত এক কিন্তু আণবিক গঠনকাঠামো (molecular structure) আলাদা—এরা হ'ল গঠনমূলক সমসংকেতক (structural isomers) ; যেমন গ্লিসের‍্যাল-ডিহাইড ও ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন, $C_3H_6O_3$। আবার গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ (উভয়েই $C_6H_{12}O_6$)-ও একে অন্যের গঠনমূলক সমসংকেতক (চিত্র ৫-১b)।

আবার, আণবিক গঠন (structure) এক, কিন্তু হাইড্রোক্সিল মূলকগুলির ত্রিমাত্রিক অবস্থান বিভিন্ন—এদের আলোকধর্মিতাও বিভিন্ন হয়। এদের বলে আলোক-সমসংকেতক (optical isomers, চিত্র ৫-১b দ্রষ্টব্য)।

গ্লুকোজ, গ্যালাকটোজ, ম্যানোজ ইত্যাদিরা একে অন্যের আলোক সম-সংকেতক (optical isomers)।

এনজাইম-অনুঘটিত বিক্রিয়া অতিমাত্রায় সুনির্দিষ্ট হওয়ার দরুণ কোষ এইসকল সমসংকেতকের বিভিন্নতা ধরতে পারে। ফলে, কোন যৌগের কেবল-মাত্র স্থূলসংকেত (empirical formula) বিশেষ কোনো অর্থ বহন করে না। কোষীয় বিপাকক্রিয়া বুঝতে হলে যৌগের ত্রিমাত্রিক গঠনভঙ্গিমা অবশ্যই জানতে হবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, এক-শর্করারা মুক্ত শৃঙ্খল (open-chain) বা সংবৃত্তাকার (cyclic form) এই উভয়রূপেই থাকতে পারে (চিত্র৫-১a)। শর্করার কার্বনিল মূলক এবং চার বা পাঁচ নম্বর কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোক্সিল মূলকের সংযোগে আরেকটি বন্ধনীর সৃষ্টি হয়; ফলস্বরূপ, একটি অক্সিজেন সেতুর (oxygen bridge) মাধ্যমে পাঁচ বা ছয় সদস্যের (five or six-membered) একটি সংবৃত্তাকার কাঠামো গঠিত হয়।

চিত্র ৫-৩
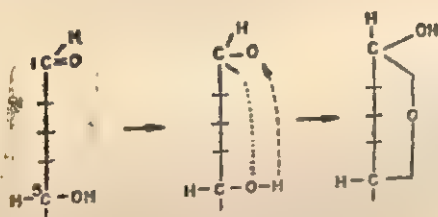
যদিও আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শর্করার মুক্তশৃঙ্খল সংকেত ব্যবহার করবো, তবুও একথা মনে রাখতে হবে যে শর্করার সংবৃত্তাকার কাঠামো জীবরাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ অনুধাবনের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৫-১-এ কয়েকটি এক-শর্করা প্রদর্শিত হয়েছে।

1 CHO — 2 CHOH — 3 CH_2OH
গ্লিসারালডিহাইড
(অ্যালডোট্রায়োজ)

CH_2OH — CO — CH_2OH
ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন
(কিটোট্রায়োজ)

রাইবোজ (অ্যালডোপেন্টোজ)

1 H-C=O
2 H-C-OH
3 H-C-OH
4 H-C-OH
5 CH_2OH
মুক্ত শৃঙ্খল গঠন

$\rightleftharpoons$

5 $HOCH_2$, O, OH, 4 C, 1 C, H, H, H, H, 3 C, 2 C, OH, OH
সংবৃত্তাকার

1 CHO
$H-{}^{2}C-OH$
$H-{}^{3}C-OH$
${}^{4}CH_2OH$
এরিথ্রোজ

1 CHO
$HO-{}^{2}C-H$
$H-{}^{3}C-OH$
${}^{4}CH_2OH$
থ্রিয়োজ

(অ্যালডোটেট্রোজ)
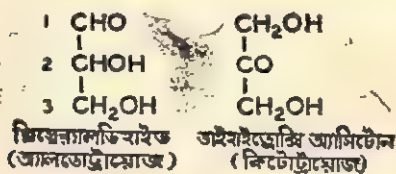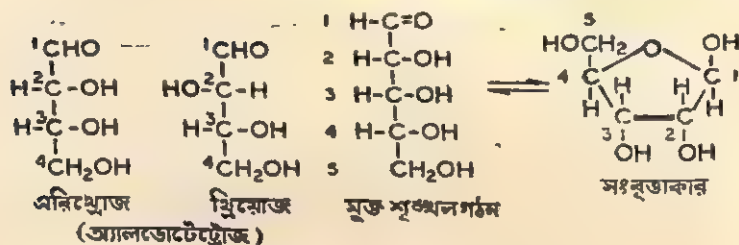
চিত্র ৫-১ (a)

কয়েকটি হেক্সোজ শর্করার মুক্ত শৃঙ্খল গঠন :

	গ্লুকোজ	গ্যালাকটোজ	ম্যানোজ	ফ্রুক্টোজ
1	H-C=O	H-C=O	H-C=O	CH_2OH
2	H-C-OH	H-C-OH	HO-C-H	C=O
3	HO-C-H	HO-C-H	HO-C-H	HO-C-H
4	H-C-OH	HO-C-H	H-C-OH	H-C-OH
5	H-C-OH	H-C-OH	H-C-OH	H-C-OH
6	CH_2OH	CH_2OH	CH_2OH	CH_2OH

গ্লুকোজ, গ্যালাকটোজ, ম্যানোজ — অ্যালডোহেক্সোজ
ফ্রুক্টোজ (কিটোহেক্সোজ)
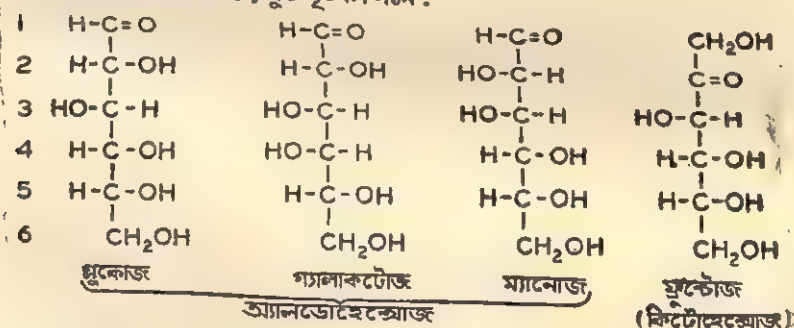
চিত্র ৫-১ (b)

বিভিন্ন কার্বনসংখ্যা বিশিষ্ট কয়েকটি এক-শর্করা। কার্বন পরমাণুদের সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।

গ্লুকোজের দুটি অঙ্গুবৃত্তাকার রূপ:

α-গ্লুকোজ β-গ্লুকোজ
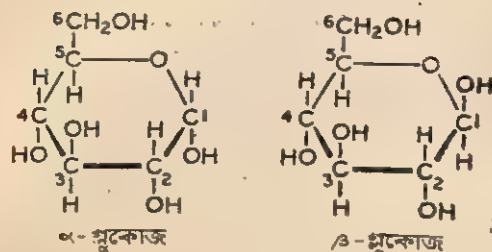
চিত্র ৫-১ (c)

এক নম্বর কার্বনে H এবং OH মূলকের দুরকম অবস্থানের জন্য α ও β দু'রকম রূপ হতে পারছে।

(খ) **বহু-শর্করা (oligosaccharides) :**

আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে এরা দুই থেকে নয়টি এক-শর্করা অণু উৎপন্ন করতে পারে। একটি বহু-শর্করা অণুতে কয়টি 'এক-শর্করা একক' আছে সেই অনুযায়ী এদের শ্রেণীবিভাগ হয়; যেমন, দ্বি-শর্করা (disaccharide) —দুটি এক-শর্করার সমন্বয়, ত্রি-শর্করা (trisaccharide)—তিনটি এক-

সুক্রোজ:

গ্লুকোজ-একক ফ্রুক্টোজ-একক
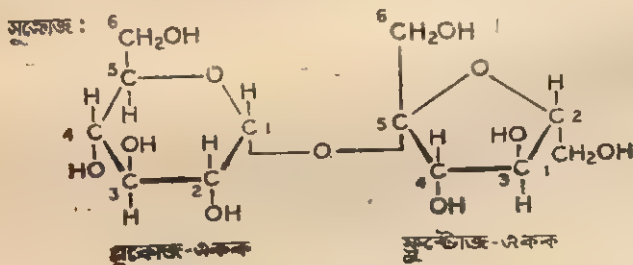
চিত্র ৫-২ (a)

শর্করার সমন্বয়, ইত্যাদি। দুটি এক-শর্করা অণু যুক্ত হয়ে দ্বি-শর্করা গঠনের সময় এক অণু জল মুক্ত হয় আর যে বন্ধনীটি এদের যুক্ত করে তাকে বলে গ্লাইকোসাইড যোজক (glycoside link)। সুক্রোজ, ল্যাক্টোজ, মল্টোজ ইত্যাদি দ্বি-শর্করার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ 1,5-α গ্লাইকোসাইড যোজক দ্বারা যুক্ত হয়ে গঠন করে সুক্রোজ (চিত্র ৫-২a)। আবার দুই অণু গ্লুকোজ 1,4-α যোজকের সাহায্যে যুক্ত হয়ে গঠন করে মল্টোজ (চিত্র ৫-২b দ্রষ্টব্য)।
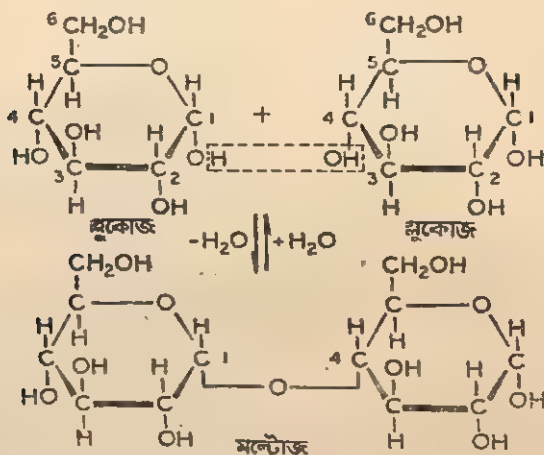
চিত্র ঃ ৫-২ (b)

শ্বেতসার (Polysaccharides) ঃ

অনেকগুলি এক-শর্করা অণু গ্লাইকোসাইড যোজকের সাহায্যে জুড়ে শ্বেতসার গঠন করে। উপাদান এক-শর্করা এককগুলি, গ্লাইকোসাইড যোজকের প্রকৃতি এবং সামগ্রিক ত্রিমাত্রিক গঠন ভঙ্গিমার উপর নির্ভর করে শ্বেতসারের ধর্মাবলী। শ্বেতসার উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে গঠনমূলক উপাদান (structural components) এবং মজুত খাদ্যরূপে বিরাজ করে। উপাদান এক-শর্করা অণুগুলির কার্বনসংখ্যা অনুযায়ী এদের পেণ্টোসান (pentosans), হেক্সোসান (hexosans) ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

পেণ্টোসান ঃ এদের সাধারণ সংকেত হল $(C_5H_8O_4)_n$—এরা হল পেণ্টোজ শর্করার সমষ্টি। অ্যারাবান (araban), জাইলান (xylan) ইত্যাদি পেণ্টোসানের উদাহরণ।

হেক্সোসান ঃ এদের সাধারণ সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$—অর্থাৎ হেক্সোজ শর্করার সমষ্টি। পেণ্টোসানের চেয়ে এরা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সেলুলোজ, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি হেক্সোসানের উদাহরণ। অনেকগুলি গ্লুকোজ অণু 1,৪-β যোজকের সাহায্যে জুড়ে তৈরী করে সেলুলোজ—উদ্ভিদ কোষের গঠনমূলক উপাদান হিসেবে কাজ করে (যেমন—কার্পাস তুলো)। আবার অনেকগুলি গ্লুকোজ অণু 1,৪-α যোজকের সাহায্যে জুড়ে তৈরী হয় স্টার্চ—মজুত খাদ্যের উৎস হিসেবে অধিকাংশ উদ্ভিদেই স্টার্চ পাওয়া যায়।

গ্লুকোজের ফসফোরাইলেশন (Phosphorylation of Glucose)

১৯০৫ সালে হার্ডেন এবং ইয়ং (Harden and Young) ঈস্ট নির্যাসের ক্রিয়ার প্রথম সার্থক বিশ্লেষণ করেন। গ্লুকোজ দ্রবণে pH ৫-এ তারা যখন সদ্য প্রস্তুত ঈস্ট নির্যাস মেশালেন দেখা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধানক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের হার (অর্থাৎ সন্ধান ক্রিয়ার হার) গেল কমে: তখন অজৈব ফসফেট যোগ করে বিক্রিয়ার বেগ পুনরুদ্ধার করা হল। এইবারও কিন্তু সন্ধানক্রিয়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না; কেননা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফসফেট যোগ নিঃশেষিত হয়ে গেল এবং ফসফেটের ঘনত্ব কমার সাথে সাথে সন্ধান ক্রিয়ার বেগও গেল কমে। তারা আরো ফসফেট মেশালেন এবং ফলস্বরূপ সন্ধানক্রিয়া আরো কিছুক্ষণ দ্রুতগতিতে চললো। বিক্রিয়া মিশ্রণে (fermentation mixture) তারা যে অজৈব ফসফেট যোগ করছিলেন তা সর্বদাই অন্তর্হিত হচ্ছিল: অতএব বিজ্ঞানীদ্বয় ভাবলেন অজৈব ফসফেটটির বায়ে সম্ভবতঃ একটি জৈব ফসফেট এস্টার (organic phosphate ester) তৈরী হচ্ছে এবং শীঘ্রই তারা এই সন্দেহের নিরসন করলেন একটি জৈব ফসফেট এস্টার ফ্রুক্টোজ ডাই ফসফেট পৃথক করে। হার্ডেন এবং ইয়ং আরো দেখলেন যে সদ্য প্রস্তুত ঈস্ট নির্যাস এই যৌগটির সন্ধানক্রিয়া যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সহিত ঘটাতে পারে; অতএব, তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে উক্ত যৌগটি সম্ভবতঃ অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়ার একটি অন্তর্বর্তী যৌগ (intermediate)।

পরবর্তী কালে রবিনসন আরেকটি শর্করা-ফসফেট (sugar phosphate) পৃথক করেছিলেন। বিশদভাবে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল এই শর্করা ফসফেটটি গ্লুকোজ-৬-ফসফেট (ফসফেট মূলক গ্লুকোজের ষষ্ঠ কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত) এবং ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেটের একটি সমতা-মিশ্রণ

(equilibrium mixture)। যেহেতু এই মিশ্রণের উভয় শর্করা ফসফেটেরই সন্ধানক্রিয়া সম্ভব, অতএব একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হল যে এই যৌগদ্বয় গ্লুকোজের ষষ্ঠ কার্বন পরমাণু এবং অজৈব ফসফেটের সংযোগে উৎপন্ন। এই ফসফেট এস্টারদ্বয় কিরূপে গঠিত হয় এবং কী উপায়ে ফ্রুক্টোজ ডাই ফসফেট অবশেষে ইথাইল অ্যালকোহল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হচ্ছে এ প্রশ্ন বহু সুদক্ষ জীব রসায়নবিদকে বেশ কয়েক দশক ধরে ভাবিয়েছে। যাহোক, পরে আমরা দেখব যে পেশী নির্য্যাস (muscle extract) সম্পর্কিত গবেষণা সন্ধান ক্রিয়ার কতিপয় রাসায়নিক ধাপ (chemical steps) উদ্ঘাটন করেছে এবং ক্রমে ক্রমে একথাও পরিষ্কার হয়েছে যে ঈস্ট নির্য্যাসের সাহায্যে গ্লুকোজের সন্ধান ক্রিয়া, বায়ুর অনুপস্থিতিতে (anaerobic) পেশী নির্য্যাসের সাহায্যে গ্লাইকোজেনের বিভঞ্জন প্রক্রিয়ার (breakdown) সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্য যুক্ত।

সন্ধানক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনায় আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য হার্ডেন এবং ইয়ং-এর পরীক্ষায় ফিরে যাওয়া যাক। হার্ডেন এবং ইয়ং দেখালেন যে ঈস্ট নির্য্যাসের অভিক্রমণ (dialyse) করানো হলে (অর্থাৎ নির্বাচনীক্ষমতা সম্পন্ন পর্দা নির্মিত থলিতে ভরে জলে ডুবিয়ে রাখা হলে) ওর সক্রিয়তা (activity) বিনষ্ট হয়। এই থলিটি প্রায় সেলোফেন পর্দার মতই; এবং এর অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলি দিয়ে ক্ষুদ্রাকার অণুগুলি বেরিয়ে যেতে পারে কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অণুগুলি ভেতরেই থেকে যায়। থলির অভ্যন্তরস্থ পদার্থ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এর দ্বারা সন্ধানক্রিয়া ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু যে পদার্থটি ব্যাপনক্রিয়ার (diffusion) ফলে থলির বাইরেকার জলে গিয়ে মিশেছে তা যোগ করা হলে পূর্বোক্ত বস্তুটি (থলির আধেয়) পুনরায় ওর সক্রিয়তা (activity) ফিরে পায়। গবেষণার ফলে আরো জানা গেল থলির আধেয় সমূহ (contents)-কে সহজেই তাপদ্বারা বিনষ্ট করা যায় কিন্তু থলির বাইরেকার পদার্থ অপেক্ষাকৃত সুস্থির (stable)।

এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীদ্বয় সিদ্ধান্ত করলেন যে থলির মধ্যেকার অতিকায় অণু (যাদের এখন আমরা এনজাইম বলে জানি) ছাড়াও ঈস্ট নির্য্যাসে আছে আরেক প্রকার অভিক্রমক্ষম (dialysable), তাপসহ (thermostable) পদার্থ, এনজাইমের কাজ করবার জন্য যাদের উপস্থিতি

একান্ত আবশ্যক। এই অভিক্রমক্ষম প্রভাবকদের (যারা থলের মধ্যেকার অনুঘটকের কাছ থেকে ব্যাপন ক্রিয়ার ফলে বাইরে চলে যায়) বলা হয় এনজাইম-সহযোগী বা কোএনজাইম (coenzyme)। সুতরাং ধরে নেওয়া হয়েছিল, ঈস্ট নির্য্যাসে আছে এনজাইম জাইমেজ এবং কোএনজাইম (বা কোফ্যাক্টর) কোজাইমেজ (cozymase)। জাইমেজ অভিক্রমণে অক্ষম (nondialysable) এবং তাপ-অসহ (thermolabile), কিন্তু কোজাইমেজ অভিক্রমক্ষম এবং তাপসহ। যাহোক, এখন আমরা জানি জাইমেজ হচ্ছে অনেকগুলি এনজাইমের একটি জটিল মিশ্রণ এবং এই এনজাইমগুলির কাজ (function) করবার জন্য দরকার আরো অনেকগুলি কোএনজাইম।

এই পর্যন্ত এসে আমরা এখানে কার্বোহাইড্রেট বিপাক সম্পর্কিত গবেষণার ইতিহাসে একটি বড়ো অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমরা গ্লুকোজ বিপাকের প্রাথমিক ধাপগুলি (initial steps) সম্পর্কেও আমাদের লব্ধজ্ঞান পর্য্যালোচনা করে দেখবো। গ্লুকোজ থেকে অ্যালকোহলের রূপান্তরে যে সকল অন্তর্বর্তী যৌগ গঠিত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করবো না। এখানে কেবলমাত্র কতিপয় মৌল বিক্রিয়া (key reactions) সম্পর্কেই আলোচনা করবো যা সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে চালিত করে অ্যালকোহল গঠনের দিকে; এবং মাঝে মাঝে প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত বিভিন্ন এনজাইম বা কোএনজাইমের বিবরণ দিতে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাবো।

গ্লুকোজ এবং অজৈব ফসফেট যৌগ অভিক্রমণের পর ঈস্ট নির্য্যাসে মেশালে কোন রকম সন্ধানক্রিয়া সংঘটিত হয় না এবং গঠিত হয় না কোন শর্করা-ফসফেট এস্টারও। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে প্রক্রিয়াটিতে কোন একটি কোএনজাইমের অবশ্যই বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। যাহোক, যদি অভিক্রমিত (dialysed) নির্য্যাসে এটিপি (ATP) মেশানো যায় তবে শর্করার ফসফোরাইলেশন (অর্থাৎ শর্করার সাথে ফসফেট সংযুক্তি পুনরায় শুরু হয় এবং তৈরী হেক্সোজ ডাই ফসফেট পৃথক করাও সম্ভব হয়। একান্ত বিশুদ্ধ এনজাইম নিয়ে কাজ করে এই শ্রেণীর বিক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।

এই বিক্রিয়াক্রমটির শুরুতে এটিপি (ATP) থেকে একটি ফসফেট মূলক

স্থানান্তরিত হয় গ্লুকোজে—ফলে উৎপন্ন হয় গ্লুকোজ-৬-ফসফেট এবং এডিপি (ADP)। এই বিক্রিয়াটিতে অনুঘটকরূপে কাজ করে হেক্সোকাইনেজ

গ্লুকোজ + ATP ⇌ গ্লুকোজ-৬-ফসফেট + ADP

ADP + ফ্রুক্টোজ-১,৬-ডাইফসফেট ← ATP + ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট

গ্লুকোজ + এটিপি ⇌ গ্লুকোজ-৬-ফসফেট + এডিপি

⇅

এডিপি + ফ্রুক্টোজ-১, ৬-ডাই ফসফেট ← এটিপি + ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট
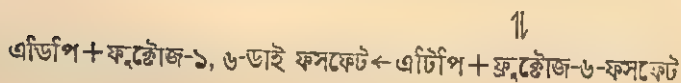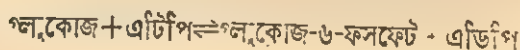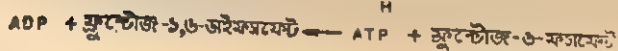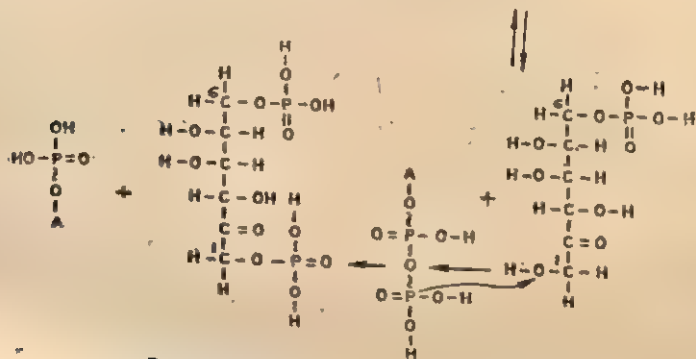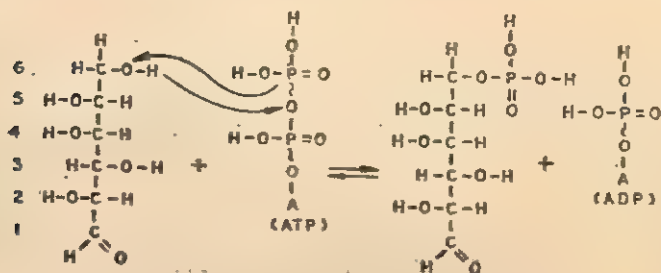
চিত্র ৫-৩ ঃ

গ্লুকোজ ফসফোরাইলেশন বিপাকের প্রাথমিক ধাপ সমূহ।

(hexokinase) নামক একটি এনজাইম। [এই ধরণের বিক্রিয়া (যাতে এটিপি অংশগ্রহণ করে)-র সাথে যুক্ত সকল এনজাইমকেই বলা হয় 'কাইনেজ' (kinase)—যথা, ফ্রুক্টোকাইনেজ, গ্লুকোকাইনেজ, ইত্যাদি।] পরবর্তী পর্য্যায়ে বেশ কয়েকবার রূপান্তরের পর গ্লুকোজ-৬-ফসফেট অণু পুনরায়

এটিপির সাথে বিক্রিয়া করে এবং গঠিত হয় ফ্রুক্টোজ ডাইফসফেট ; এটি একটি হেক্সোজ ডাই ফসফেট (৫-৩ নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে)। এবার একটি হেক্সোজ ডাইফসফেট অণু দুটি ট্রায়োজ ফসফেট অণুতে (তিন কার্বন বিশিষ্ট শর্করা, প্রত্যেকটিতেই রয়েছে একটি করে ফসফেট মূলক) বিভক্ত হয়। যদিও এই বিভাজন প্রক্রিয়ার (splitting) প্রাথমিক বিক্রিয়াজাত পদার্থদুটি বিভিন্ন, একটি উভমুখী বিক্রিয়ার মাধ্যমে এদের পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব

ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট

ফ্রুক্টোজ-১,৬-ডাইফসফেট
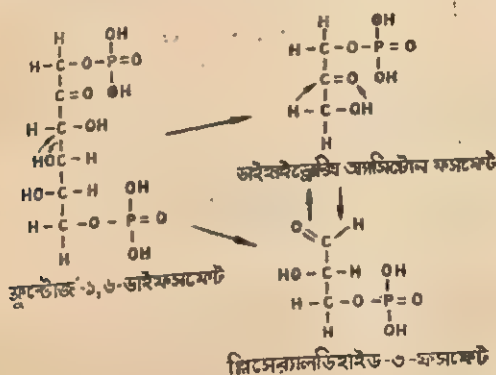
গ্লিসেরাল্ডিহাইড-৩-ফসফেট

চিত্র ৫-৪ :

ফ্রুক্টোজ-১, ৬-ডাইফসফেটের বিভাজন (Splitting)।

(চিত্র ৫-৪)। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী যৌগটি হল গ্লিসার্যালডিহাইড-৩-ফসফেট (একটি ট্রায়োজ ফসফেট)।

গ্লিসার্যালডিহাইড-৩-ফসফেটের জারণ (Oxidation of Glyceraldehyde-3-Phosphate) :

অ্যালডিহাইড যখন অ্যাসিডে জারিত হয় তখন তার কী পরিবর্তন ঘটে তা আমরা জানি। ঈস্ট নির্যাসের একটি এনজাইম, ট্রায়োজ ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ যার নাম, এই জারণ প্রক্রিয়ায় (হাইড্রোজেন অপসারিত হয় এই প্রক্রিয়ায়) অনুঘটকের কাজ করে। প্রথমে গ্লিসার্যাল-

ডিহাইড-৩-ফসফেট ৫-৫ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে এনজাইমের—SH মূলকের সাথে যুক্ত হয়; তারপর সংঘটিত হয় জারণ ক্রিয়া এবং উৎপন্ন হয় একটি শক্তি
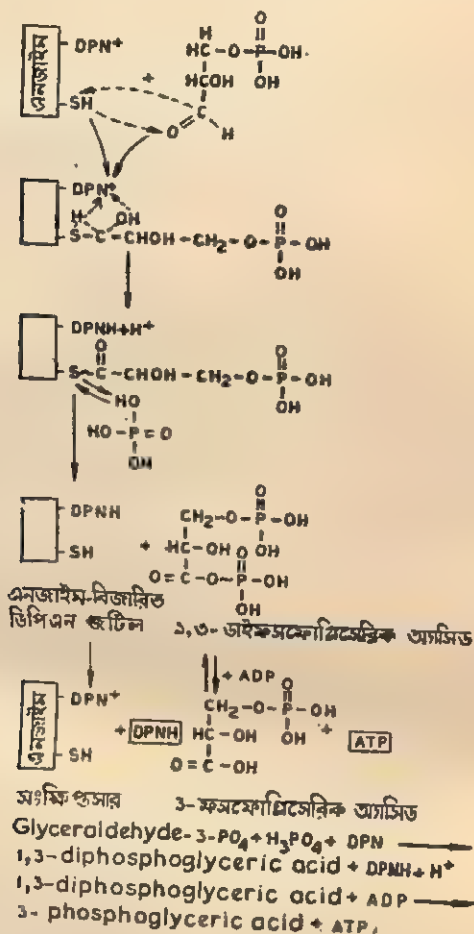
চিত্র ৫-৫ : গ্লিসার্যালডিহাইড-৩ ফসফেটের জারণ—ডিপি এন (কোএনজাইম-১)-এর ভূমিকা।

সমৃদ্ধ মূলক। এনজাইমে উৎপন্ন এই শক্তি সমৃদ্ধ মূলকটি প্রতিদানে অজৈব ফসফেটের সাথে বিক্রিয়া করে গঠন করে ১, ৩-ডাই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড। পরবর্তী পর্যায়ে ১,৩-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের ১নং কার্বন পরমাণু

থেকে একটি শক্তি-সমৃদ্ধ ফসফেট মূলক এডিপির অণুতে স্থানান্তরিত হয়—ফলে গঠিত হয় ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এবং এটিপি। এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এনজাইম ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড কাইনেজ, এবং বিক্রিয়াটি উভমুখী (reversible)।

ট্রায়োজ ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজের সহযোগী কোএনজাইমটি (coenzyme) এই বিক্রিয়ায় জারক (oxidant) রূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পূর্বেই বলেছি, হার্ডেন এবং ইয়ং দেখিয়েছেন অ্যালকোহলীয় সন্ধান
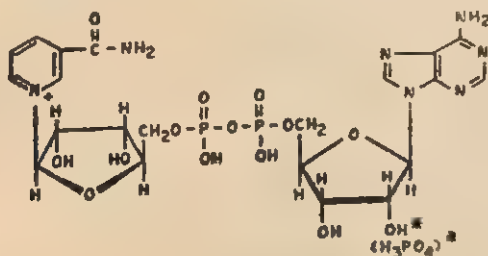
চিত্র : ৫-৬

ডিপিএন এবং টিপিএন-এর গঠন (structure)।
*টি পি এন-এর ক্ষেত্রে অ্যাডিনিন সংলগ্ন রাইবোজের
সাথে অতিরিক্ত ফসফেটটি যুক্ত থাকে।

ক্রিয়ার জন্য একটি ক্ষুদ্রাকার তাপসহ (heat-stable) সহপ্রভাবক (কোফ্যাক্টর) আবশ্যক। অল্পকালের মধ্যেই এই অভিক্রমক্ষম (dialysable) কোজাইমেজ (কোএনজাইম-১)-কে পৃথক ও সনাক্ত করা গেল। দেখা গেল এই যৌগটিতে আছে অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড, নিকোটিন্যামাইড [পেলাগ্রা (pellagra) প্রতিরোধে কার্যকরী একটি বি-ভিটামিন], এবং ফসফেট মূলক (চিত্র ৫-৬ দ্রষ্টব্য)। এই আবিষ্কার কোষীয় বিপাক ক্রিয়ায় ভিটামিনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রথম সূত্র (clue) যোগালো। জীব-রসায়নবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যতই অগ্রসর হবো ততই দেখবো ভিটামিন-গুলি কোএনজাইম অণুতে কী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাই না গ্রহণ করে।

কোএনজাইম-১ এর গঠন ভঙ্গিমা (structure) নির্দ্ধারিত হওয়ার পর

এর নাম দেওয়া হল 'ডাই ফসফোপাইরিডিন নিউক্লিওটাইড' বা **ডিপিএন** (diphosphopyridine nucleotide or DPN)। বর্তমানে অবশ্য এর নতুন নামকরণ হয়েছে—নিকোটিন্যামাইড অ্যাডিনাইন ডাই নিউক্লিওটাইড (NAD)। জৈবিক জারণ প্রক্রিয়ায় (in biological oxidations) ডিপিএন এবং টিপিএন এর সক্রিয় অংশটি হচ্ছে পাইরিডিন বলয় (pyridine ring)। [টিপিএন বা ট্রাইফসফোপাইরিডিন নিউক্লিওটাইড একটি কো-এনজাইম—ডিপিএনের সাথে এর পার্থক্য শুধু এইখানে যে অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিডের রাইবোজ বলয়ে এর একটি অতিরিক্ত ফসফেট মূলক আছে]। এই পাইরিডিন বলয় একজোড়া ইলেকট্রণ এবং একটি প্রোটন গ্রহণ করে একটি নূতন গঠন ভঙ্গিমা নিতে সমর্থ হয়। গ্লিসার‍্যালডিহাইড-৩-ফসফেটের জারণে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারিত হয়, কিন্তু ডিপিএন-এর বিজারণে পাইরিডিন বলয়ে যুক্ত হয় একটি মাত্র হাইড্রোজেন আয়ন। যেহেতু ডিপিএন-এ দুটো ইলেকট্রণ স্থানান্তরিত হয়, অতএব একটি হাইড্রোজেন বিক্রিয়ার মাধ্যমে থেকে যায় ($DPN^+ + 2H^+ + 2e \rightarrow DPNH + H^+$); বিজারিত ডিপিএন-কে লেখা হয় ডিপিএনএইচ (DPNH) রূপে। অতএব গ্লিসার‍্যালডিহাইড-৩-ফসফেটের জারণে কোএনজাইমটি (DPN) বিজারিত হয়, গঠিত হয় ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, এবং এডিপি রূপান্তরিত হয় এটিপি-তে (চিত্র৫-৫)। বিক্রিয়ক মিশ্রণের সমস্ত ডিপিএন একবার বিজারিত হয়ে গেলে সন্ধানক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার কথা ; কিন্তু, পরে আমরা দেখবো, ঈস্ট নির্য্যাসে আছে আরো বিভিন্ন প্রকারের এনজাইম যারা ডিপিএনএইচের জারণ অনুঘটিত করে, ফলে সক্রিয় কোএনজাইমটি (DPN) পুনরুৎপন্ন হয়। আরো লক্ষণীয় যে, এনজাইমের বহিরাঙ্গে (surface-এ) উৎপন্ন শক্তিসমৃদ্ধ অন্তর্বর্তী যৌগের অপসারণের জন্য বিক্রিয়ক মিশ্রণে ক্রমাগত অজৈব ফসফেট এবং এডিপি সরবরাহ করে যেতে হবে অথবা পুনরুৎপন্ন (regenerate) করতে হবে।

৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়া (**Metabolism of 3-Phosphoglyceric acid**) **:**

ঈস্ট নির্য্যাস নিম্নলিখিতরূপে ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়া সম্পাদন করে। ৩-ফসফেট এস্টার প্রথমে রূপান্তরিত হয় ২-ফসফেট এস্টারে

(২-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে); শেষোক্ত পদার্থটি তখন জল বিমোচন করে (dehydration)। ফলস্বরূপ অণুতে শক্তির পুনর্বণ্টন হয়ে গঠিত হয় একটি শক্তিসমৃদ্ধ ফসফেট মূলক—উৎপন্ন হয় ফসফোএনল পাইরুভিক অ্যাসিড (চিত্র ৫-৭)। ২-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে ফসফো এনল পাইরুভিক অ্যাসিডের উৎপাদন এনোলেজ (enolase) নামক একটি এনজাইম দ্বারা অনুঘটিত হয়। ফসফেটের উপস্থিতিতে এনলেজের ক্রিয়া ফ্লুয়োরাইড দ্বারা নিবারিত হয়, কেননা ম্যাগনেসিয়াম এই পরিস্থিতিতে (অর্থাৎ ফ্লুয়োরাইড ও ফসফেটের উপস্থিতিতে) ম্যাগনেসিয়াম ফ্লুয়োরো ফসফেট গঠন করে অপসারিত হয় ; অথচ এনলেজের কাজ করবার জন্য ম্যাগনেসিয়াম অপরিহার্য। অতএব, ঈস্ট নির্যাসের সন্ধানক্রিয়ায় ফ্লুয়োরাইড ব্যবহার করলে ২-ফসফোগ্লিসারিক

$CH_2OH_2PO_3$ – CHOH – COOH (৩-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড) ⟶ H–HC–OH / HC–O–PO_3H_2 / COOH (২-ফসফো গ্লিসেরিক অ্যাসিড) $\xrightarrow{-H_2O}$ HCH = C–O–PO_3H_2 / COOH (ফসফোএনল পাইরুভিক অ্যাসিড)

+ADP ⟶ CH_2 = C–OH / COOH + ATR (পাইরুভিক অ্যাসিড (এনল)) ⇌ CH_3 / C=O / COOH (পাইরুভিক অ্যাসিড (কিটো))
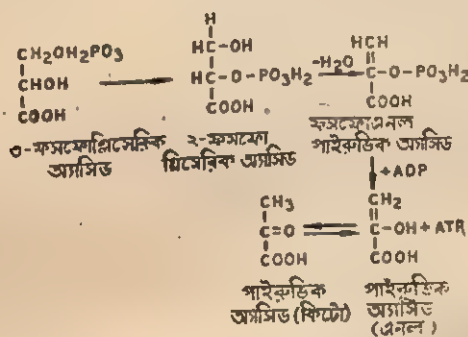
চিত্র ৫-৭ :
৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়া

অ্যাসিডের বিপাক নিবারণ করা যাবে—এই নীতি অবলম্বন করে জীব-রসায়নবিদগণ বেশ খানিকটা সঞ্চিত ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড পৃথকীকরণ (isolation) ও সনাক্তকরণে সক্ষম হয়েছেন। পরে তাঁরা দেখিয়েছেন যে অ-নিবারিত (uninhibited) ঈস্ট নির্যাসে (অর্থাৎ ফ্লুয়োরাইড মেশানো হয়নি) ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড মেশালে ওটি দ্রুত ফসফোএনল পাইরুভিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

এই নতুন 'শক্তি-সমৃদ্ধ ফসফেট মূলক'টি গ্লিসার‍্যালডিহাইড-৩-ফসফেটের জারণ-ক্রিয়ায় উৎপন্ন ফসফেট মূলক থেকে ভিন্ন নয়। এই ফসফেট

যৌগটিকে সুনির্দিষ্ট একটি 'কাইনেজ' এনজাইমের উপস্থিতিতে এডিপি-র সহিত বিক্রিয়া করিয়ে এটিপি এবং পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করা যেতে পারে। পাইরুভিক অ্যাসিড হচ্ছে একটি আলফা কিটো অ্যাসিড (α-keto acid, $CH_3COCOOH$)। এই জাতীয় অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়ার প্রথম ধাপটি হল হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিমোচন বা ডিকার্বোক্সিলেশন (decarboxylation)। ঈস্ট নির্যাসের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিডের ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়ার ফলে গঠিত হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অ্যাসিটালডিহাইড ($CH_3CO.COOH \rightarrow CO_2 + CH_3CHO$)। এই বিক্রিয়াটি অনুঘটিত করে কার্বোক্সিলেজ এনজাইমটি এবং এর জন্য চাই একটি কোফ্যাকটর (কোকার্বোক্সিলেজ)। এই কোফ্যাকটরটি হচ্ছে আরেকটি বি-ভিটামিন, নাম থিয়ামিন (thiamine)। থিয়ামিনকে এনজাইম ক্রিয়াধর্মী করে তোলার জন্য এটির সঙ্গে ফসফেট যুক্ত (phosphorylated) করে। থিয়ামিন পাইরোফসফেট (TPP) গঠন করা আবশ্যক। অ্যালকোহল গঠনের সর্বশেষ পর্যায়ে অ্যাসিটালডিহাইড বিজারিত হয়ে উৎপন্ন করে ইথাইল অ্যালকোহল—এই বিজারণে অংশগ্রহণ করে সেই হাইড্রোজেন যা গ্লিসার‍্যালডিহাইড-৩-ফসফেটের জারণকালে ডিপিএন-এ যুক্ত হয়েছিল। অ্যাসিটালডিহাইডের ইথাইল অ্যালকোহলে বিজারণ অথবা ইথাইল অ্যালকোহলের অ্যাসিটালডিহাইডে জারণ অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ নামক এনজাইম দ্বারা অনুঘটিত হয়। এই এনজাইমের কাজ করবার জন্য দরকার ডিপিএন কোএনজাইমটি।

$$CH_3CHO + DPNH + H^+ \rightleftharpoons CH_3CH_2OH + DPN^+$$
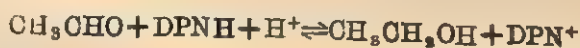
ঈস্ট নির্যাস অনুঘটিত এই সকল উল্লেখযোগ্য বিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্তসার ৫-৮ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। অসংখ্য এনজাইম ও কোএনজাইমের পৃথকীকরণ ও পরিশোধন, প্রতিটি পর্যায়ের ব্যাখ্যা, এবং সর্বোপরি সমগ্র ঈস্টকোষের বিক্রিয়ার সার্বিক ক্রিয়া প্রণালী নির্দ্ধারণ জীব রসায়ন বিদ্যার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গ্লুকোজ থেকে শুরু করে এই বিক্রিয়ার সামগ্রিক পরিণতি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ, প্রতি অণু গ্লুকোজের সন্ধানক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় দুই অণু ইথাইল অ্যালকোহল এবং দুই অণু কার্বন ডাই অক্সাইড।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতি অণু গ্লিসার‍্যালডিহাইড-৩-ফসফেট জারিত হওয়ার

দরূণ এক অণু ডিপিএন বিজারিত হয় এবং অ্যাসিটালডিহাইড বিজারিত হওয়ার ফলে দ্বিতীয়োক্ত যৌগটি পুনর্জারিত হয়—অ্যাসিটালডিহাইড গঠিত হয় পাইরুভিক অ্যাসিডের কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিমোচনের (ডিকার্বোক্সিলেশনের)
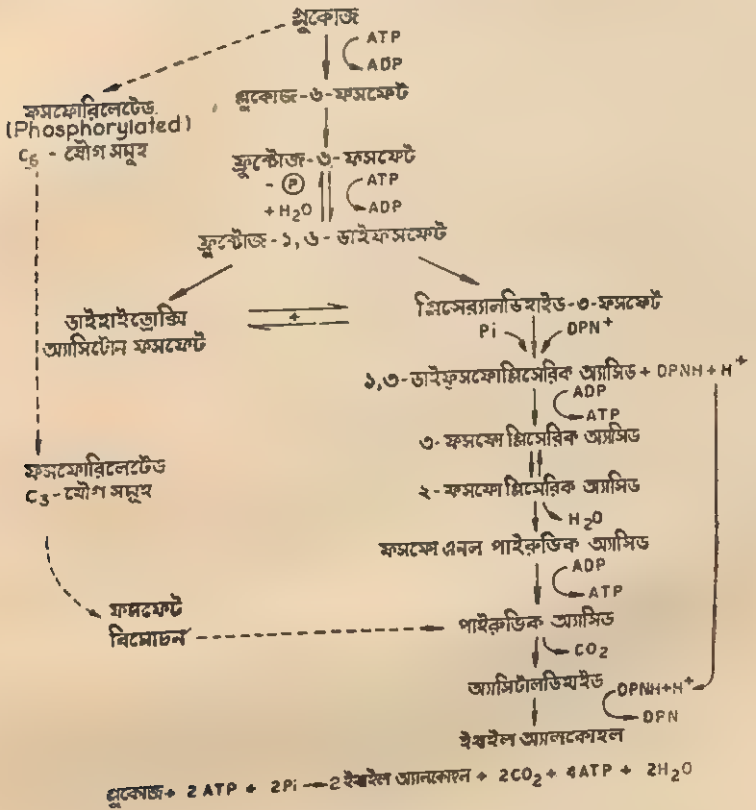
চিত্র ৫-৮ ঃ

এখানে, Pi = অজৈব ফসফেট (Inorganic Phosphate)

এবং P = ফসফেট

অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়ার বিক্রিয়াসমূহের সংক্ষিপ্তসার।

ফলে। প্রতি অণু গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন হয় দুটো করে ট্রায়োজ অণু, যার থেকে গঠিত হয় দুই অণু অ্যালকোহল ও দুই অণু কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

তৃতীয়তঃ, প্রতি অণু গ্লুকোজের ফসফোরাইলেশনের জন্য দুটো করে এটিপি অণু লাগে। দ্বিতীয় এটিপি অণুটি ব্যবহৃত হয় হেক্সোজ ডাই ফসফেটের গঠনে; হেক্সোজ ডাই ফসফেটের প্রতি অণু আবার দুটি করে গ্লিসার্যাল ডিহাইড-৩-ফসফেট অণু উৎপন্ন করে। গ্লিসার্যালডিহাইড-৩-ফসফেট তখন জারিত হয়ে শক্তি-সমৃদ্ধ ফসফেট মূলক গঠন করে এবং অজৈব ফসফেটের (১ঃ১) সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে ১,৩-ডাই-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, যার থেকে শক্তিসমৃদ্ধ ফসফেট মূলক স্থানান্তরিত হয় এডিপিতে—ফলস্বরূপ এটিপি পুনরুৎপন্ন হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সন্ধান ক্রিয়ার এই ধাপ অবধি ঈস্ট কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্য্যায়ে ব্যবহৃত এটিপির পুনরুদ্ধার করেছে। যাহোক, দুই অণু ২-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের জল বিমোচনে (dehydration) দুটো অতিরিক্ত শক্তিসমৃদ্ধ ফসফেটমূলক গঠিত হয়। অ্যালকোহলীয় সন্ধান-ক্রিয়ায়, এইরূপে, প্রতি অণু গ্লুকোজ বিপাকের দরুণ সামগ্রিকভাবে দুই অণু এটিপি উৎপন্ন হয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, সমগ্র সন্ধান প্রক্রিয়ায় (fermentation) সম্ভবতঃ পাইরুভিক অ্যাসিডের বিভাজনই (splitting) একমাত্র একমুখী (irreversible) বিক্রিয়া। ফ্রুকটোজ-১,৬-ডাইফসফেটের ফ্রুকটোজ-৬-ফসফেটে রূপান্তর এটিপির পুন-র্গঠনে সহায়তা করে না। এই বিক্রিয়ার উভমুখিতা (reversibility) আর্দ্র বিশ্লেষণের সাহায্যে এক নম্বর কার্বন পরমাণু থেকে ফসফেট মূলক অপসারণের উপর নির্ভর করে। একটি বিশেষ এনজাইম ফসফেটেজ দ্বারা এই বিক্রিয়াটি অনুঘটিত হয়। পরিশেষে, কোষীয় বিপাকক্রিয়ায় (cellular metabolism) নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক (controlling factor)·রূপে অজৈব ফসফেট (Pi) এবং এডিপির ভূমিকাও লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোষীয় শ্বাসক্রিয়া ঃ গ্লাইকোলিসিস

শ্বাসক্রিয়া থেকে শক্তির উদ্ভব—কোষীয় শ্বাসক্রিয়ার দুটি পর্যায়—পেশী সংকোচন ও গ্লাইকোলিসিস ঃ পেশী সংকোচনে ল্যাকটিক অ্যাসিড ও ক্রিয়েটিন ফসফেট—ক্রিয়েটিন ফসফেট ও এটিপি—পেশীর সংকোচী প্রোটিন ঃ অ্যাকটিন ও মায়োসিন—গ্লাইকোলিসিসের সূচনা—গ্লাইকোজেনের ফসফোরোলিসিস—UDPG ঃ গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ ও বিভজন—ডি পি এন এইচ (DPNH)-এর জারণে ফ্লেবিন ও সাইটোক্রোমের ভূমিকা—কয়েকটি জারক দ্রব্যের (ইলেকট্রণ গ্রহীতা) প্রস্তুতিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা।

শ্বাসক্রিয়া থেকে শক্তির উদ্ভব ঃ

কোষীয় শ্বাসক্রিয়ার সময় জটিল জৈব যৌগসমূহ ভেঙ্গে গিয়ে উৎপন্ন করে ক্ষুদ্রতর অজৈব যৌগসমূহ এবং এই সকল জৈব যৌগের আভ্যন্তরীণ স্থৈতিক (রাসায়নিক শক্তিরূপে) শক্তি মুক্তিলাভ করে—বিভিন্ন জীবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য কোষ এই শক্তিই ব্যবহার করে থাকে। যেহেতু সকল কোষেরই শক্তি প্রয়োজন, শ্বসন একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। আর বেশির ভাগ জীবের ক্ষেত্রেই শ্বসন হয় বায়ুর উপস্থিতিতে (সবাত). কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ, জীবাণু ও ছত্রাকের বেলা অবাত শ্বসনও হতে পারে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই গ্লুকোজ শ্বসনে শক্তির প্রধান উৎস রূপে কাজ করে, যদিও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থ ও প্রোটিনও শ্বসন ক্রিয়ার সাবস্ট্রেট (মূল বিক্রিয়ক) রূপে কাজ করতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের বিপাক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কোষীয় শ্বাসক্রিয়ার সময় গ্লুকোজ অণু ধাপে ধাপে ভেঙ্গে গিয়ে ওর রাসায়নিক কাঠামোর অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তি মুক্ত করে—এই নির্গত শক্তির অধিকাংশই ATP-তে ফসফেট যোজকের শক্তিরূপে সংরক্ষিত হয়। সবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে প্রাপ্য শক্তির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ফসফেট যোজকের শক্তিরূপে ব্যবহারযোগ্য শক্তি হিসেবে পাওয়া যায়—বাকিটা তাপশক্তি রূপে অপচয়িত হয়।

কোষীয় শ্বাসক্রিয়া মুখ্যতঃ দুইটি পর্যায়ে সংঘটিত হয় ঃ

(ক) **গ্লাইকোলিসিস (glycolysis)** :

এটি হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব, ছয় কার্বন বিশিষ্ট শর্করা গ্লুকোজ অণু তিন-কার্বন বিশিষ্ট দুইটি অণুতে (পাইরুভিক অ্যাসিড) পরিণত হয় এই পর্বে। গ্লাইকোলিসিস সংঘটিত হয় কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং এর জন্যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না। অবাত পরিস্থিতিতে (বায়ুর অনুপস্থিতিতে) পাইরুভিক অ্যাসিড প্রাণিকোষে (animal cells) পরিণত হয় ল্যাকটিক অ্যাসিডে আর উদ্ভিদ কোষে (in plant cells) পরিণত হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর ইথাইল কোহলে। তাহলে, অবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিক্রিয়াটি হল :

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CH_3.CHOH.COOH + \text{শক্তি (প্রাণিকোষে)}$$
গ্লুকোজ ল্যাকটিক অ্যাসিড

এবং

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + \text{শক্তি (উদ্ভিদ কোষে)}$$
ইথাইল কোহল
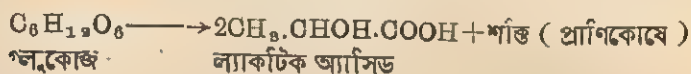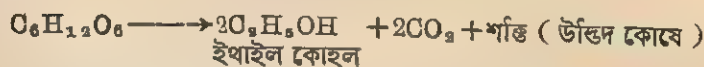
এই পর্যন্ত এসে প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয় এবং এতে কেবল গ্লুকোজের শক্তির শতকরা তিন ভাগ (৩%) মুক্তিলাভ করে, যা কিনা পরিণতিতে ATP-র ফসফেট যোজকের শক্তিরূপে বিধৃত হয়। অতএব বোঝা যাচ্ছে, **অবাত কোষসমূহকে** (anaerobic cells) এই সামান্য পরিমাণ শক্তির উপর নির্ভর করে কৃচ্ছ্রসাধন করে চলতে হয়। তবে সবাত পরিস্থিতিতে (aerobic conditions) **গ্লাইকোলিসিস** প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড ভেঙ্গে গিয়ে একেবারে এক কার্বন বিশিষ্ট যৌগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে (ক্রেবস চক্রে) এবং সেই সঙ্গে উদ্ভূত হয় আরো অনেক অনেক শক্তি।

(খ) **ক্রেব্স্ চক্র (The Krebs Cycle)** :

এই চক্রক্রম বিক্রিয়াশ্রেণী অক্সিজেনের উপস্থিতিতে গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত তিন-কার্বন বিশিষ্ট যৌগ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল এবং প্রভূত পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে। এই চক্রক্রম বিক্রিয়া শ্রেণীটি সংঘটিত হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে। মাইটোকন্ড্রিয়ার চতুর্দিকে থাকে সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোলিসিস পর্বে পাইরুভিক অ্যাসিড (C_3) উৎপন্ন হবার পর এটি মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করে ক্রেব্স্ চক্রে অংশ নেয়। ক্রেব্স্ চক্র সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

পেশী সংকোচন ও গ্লাইকোলিসিস ঃ

হার্ডেন এবং ইয়ং কর্তৃক অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়ায় হেক্সোজের ফসফোরাইলেশন আবিষ্কৃত হওয়ার পর দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া তখন ব্যবহৃত হত কেবলমাত্র সন্ধান ক্রিয়া মূলক বিভঞ্জনের (fermentative breakdown) জন্য হেক্সোজ অণুকে উপযোগী করে তোলবার উপায় হিসেবে। যাহোক, অন্যান্য প্রকারের কোষ, বিশেষ করে পেশীকোষ নিয়ে এই ধরণের গবেষণা থেকে জানা গেছে শক্তির রূপান্তরে বিশেষ করে পেশী সংকোচনের ক্ষেত্রে ফসফেটের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পেশী সংকোচনের ব্যাপারে পথিকৃৎ গবেষকদের যে দুটি মূল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হল ঃ পেশীযন্ত্রকে কর্মক্ষম করে যে শক্তি তার রাসায়নিক উৎস কী এবং কি উপায়ে এই শক্তি সংকোচনের যান্ত্রিক শক্তিতে (mechanical energy of contraction) রূপান্তরিত হয়?

গবেষকরা অল্পকালের মধ্যেই নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আবিষ্কার করলেন ঃ

(১) অক্সিজেনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে পেশী স্বাভাবিক ভাবেই সংকুচিত হতে পারে ;

(২) বায়ুর অনুপস্থিতিতে (anaerobic) সংকোচনের সময় ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং যতক্ষণ না পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে ততক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন উদ্দীপনার সাথে ল্যাকটিক অ্যাসিড সঞ্চিত হতে থাকে ;

(৩) ক্লান্ত পেশীকে তখন অক্সিজেনের মধ্যে প্রবেশ করানো হলে পেশী পুনরায় সংকোচনের ক্ষমতা ফিরে পায় এবং যুগপৎ ল্যাকটিক অ্যাসিড অন্তর্হিত হয়। এবং আরো দেখা গেছে,

(৪) সংকোচনের সময় অক্সিজেন পাওয়ার সুবিধে থাকলে অপেক্ষাকৃত (বায়ুর অনুপস্থিতিতে যে পরিমাণ ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তার তুলনায়) কম ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

এই সকল তথ্য সম্পন্ন কাজ (work done), সৃষ্ট তাপ, পেশীতে জাত টান বা পীড়ন (tension) এবং উৎপন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণের মধ্যে সমানুপাত সম্পর্কের (proportionality) কথাই নির্দেশ করে।

যাহোক, বিগত ১৯২৫-৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই একথা পরিষ্কার হয়েছিল যে বায়ুর অনুপস্থিতিতে পেশী সংকোচনে ব্যয়িত শক্তির কিছুটা আসে

পলিস্যাকারাইড গ্লাইকোজেনের (যা পেশীতে সঞ্চিত হয়) ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তর থেকে,—আর এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় গ্লাইকোলিসিস (glycolysis)। অনেক বছর ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে পেশী যখন সংকুচিত হয় ঠিক তখনই শক্তিপ্রদ গ্লাইকোজেন বিভঞ্জন বিক্রিয়া (glycogen breakdown) সংঘটিত হয়। কিন্তু হিল (Hill) একক পেশীতন্তুর (single muscle fibre) সংকোচনের সময়কার তাপ যথেষ্ট সতর্কতার সাথে পরিমাপ করে দেখালেন যে সংকোচনের সাথে যুক্ত প্রাথমিক তাপ (initial heat) ছাড়াও আরো দুই প্রকারের তাপ উদ্ভূত হয় ; এরা হল : শিথিলতা জনিত তাপ (relaxation heat) এবং বিলম্বে উদ্ভূত আরেক প্রকার তাপ (a delayed heat output) যাকে বলা হয় পূর্বাবস্থা প্রাপ্তিজনিত তাপ (recovery heat)। যাহোক, তিনি যখন পেশীকে বায়ুর অনুপস্থিতিতে (anaerobic condition) রাখলেন দেখা গেল এক্ষেত্রে সংকোচন তাপ এবং শিথিলতাজনিত তাপ আছে, কিন্তু কোন 'পূর্বাবস্থা প্রাপ্তিজনিত' তাপ নেই ; অতএব, হিল সিদ্ধান্ত করলেন যে 'রিকভারী তাপ' পাওয়ার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। হিলের পরীক্ষায়ও যেহেতু ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে, অতএব একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গ্লাইকোলিসিস এবং পেশী সংকোচনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

```
        O
        ‖  OH
H-N~P<
   |     OH
   C=NH
   |
   N-CH3
   |
   CH2
   |
   COOH
```
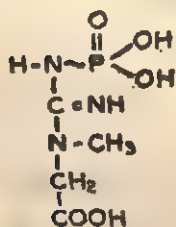
চিত্র ৬-১
ক্রিয়েটিন ফসফেট

প্রায় এই সময়েই পেশী থেকে একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেল ; পদার্থটি আম্লিক দ্রবণে খুব সহজেই ভেঙ্গে গিয়ে উৎপন্ন করে ক্রিয়েটিন (creatine) এবং ফসফেট। এই যৌগটিকে ক্রিয়েটিন ফসফেট রূপে সনাক্ত করা হল এবং দেখা গেল এটিপির মতই এতেও একটি শক্তি-সমৃদ্ধ ফসফেট মূলক আছে (চিত্র ৬-১ দ্রষ্টব্য)। যেহেতু পদার্থটি পেশী সংকোচনের সময় অন্তর্হিত হয়, অতএব মনে করা হল ওটি কোন না কোন প্রকারে শক্তি সরবরাহ (energy supply) এবং গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত। আরো দেখা গেল বিশুদ্ধ যৌগটি থেকে (অর্থাৎ ক্রিয়েটিন ফসফেট থেকে) আর্দ্র বিশ্লেষণের সময় প্রচুর পরিমাণ তাপ নির্গত হয় ; অতএব সন্দেহাতীত রূপে

প্রমাণিত হল যে নাইট্রোজেন-ফসফরাস যোজকে প্রচুর পরিমাণ স্থৈতিক শক্তি (potential energy) বর্তমান আছে। কিন্তু তবুও একথা স্বীকার্য যে গ্লাইকোজেনের ল্যাকটিক অ্যাসিডে বিভঞ্জনের সাথে পেশী সংকোচনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

১৯৩০ সালে এই কুয়াশা ক্রমে পরিষ্কার হতে থাকে, যখন লুন্ডস্‌গার্ড (Lundsgaard) দেখালেন যে আয়োডোঅ্যাসেটিক অ্যাসিড নামক একটি যৌগ দ্বারা পেশীকে বিষদুষ্ট (poisoned) করলে ল্যাকটিক অ্যাসিডের তৈরী ছাড়াই পেশীর সংকোচন হতে পারে। তিনি জানালেন এই ল্যাকটিক অ্যাসিড-এর অবর্তমানে সংকোচনের (non lactic acid contraction) সময় অবধারিত রূপেই ক্রিয়েটিন ফসফেট ভেঙ্গে যায়; এবং সমস্ত ক্রিয়েটিন ফসফেট নিঃশেষিত হয়ে গেলে পেশী আর সংকুচিত হতে পারে না। ক্রিয়েটিন ফসফেটের আর্দ্র বিশ্লেষণের সময় কতটা তাপ উৎপন্ন হয় গবেষণা থেকে তা আমাদের আগেই জানা আছে। এবার গবেষকরা পেশী সংকোচনের সময় কতটা ক্রিয়েটিন ফসফেট বিযোজিত হয়েছে তা পরিমাপ করলেন এবং প্রত্যাশিত পরিমাণ তাপের সাথে তুলনা করে দেখালেন যে উৎপন্ন তাপ এবং বিযোজিত ক্রিয়েটিন ফসফেটের পরিমাণের সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। অন্যকথায়, গ্লাইকোজেনের বিভঞ্জন ছাড়াই বায়ুর অনুপস্থিতিতে (anaerobically) যখন পেশীর সংকোচন হয় তখনকার উৎপন্ন তাপ ক্রিয়েটিন ফসফেটের বিভঞ্জন (break down) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

স্তন্যপায়ী জীবের কলাতন্ত্রে (বিশেষ করে পেশীকোষের সাহায্যে) গ্লুকোজ এবং গ্লাইকোজেনের বিভঞ্জন বিক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা থেকে জানা গেল যে উপরিউক্ত যৌগদ্বয়ের বিভঞ্জনে যে সকল অন্তর্বর্তী যৌগ গঠিত হয় তাদের এবং অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়ায় উৎপন্ন অন্তর্বর্তী যৌগ সমূহের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। ল্যাকটিক অ্যাসিডের উৎপাদন ছাড়াই লুন্ডস্‌গার্ড পেশী সংকোচন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন, কারণ আয়োডো অ্যাসেটিক অ্যাসিড অণু ট্রায়োজ ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ-এর সালফহাইড্রাইল (–SH) মূলকের সাথে যুক্ত হয়ে গ্লিসার‍্যালডিহাইড-৩-ফসফেটের জারণ নিবারিত করে। এইরূপে এটিপি সংশ্লেষণ নিবারণের দরুণ ক্রিয়েটিন ফসফেট অন্তর্হিত হয়। ডায়ালাইস করা (অভিক্রমিত, dialyzed) পেশী

নির্য্যাস ব্যবহৃত হলে ক্রিয়েটিন ফসফেটের বিভঞ্জন কেবলমাত্র এডিপির উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়; এ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে ক্রিয়েটিন ফসফেট প্রত্যক্ষভাবে পেশীর প্রোটিনে (muscle protein)-র সাথে বিক্রিয়া করে না। এরপর অল্পদিনের মধ্যেই ইঙ্গল হার্ড (Engle hardt)-এর গবেষণা থেকে জানা যায় পেশীর প্রোটিন (এটিপি-এজ) এটিপির সাথে বিক্রিয়া করে গঠন করে এডিপি এবং অজৈব ফসফেট। এই তথ্য থেকেই প্রথম পরিষ্কার বোঝা গেল যে পেশী সংকোচনের ক্ষেত্রে এটিপিই শক্তির তাৎক্ষণিক উৎস। আরো দেখা গেল ক্রিয়েটিন ফসফেট (CP) উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ফসফেটের (high energy phosphate) আধার স্বরূপ, এবং এই ক্রিয়েটিন ফসফেট নিম্নলিখিত (উভমুখী বিক্রিয়ার) সমীকরণ অনুযায়ী এডিপি-তে পুনরায় ফসফেট যোগ (phosphorylate) করে এটিপি-তে রূপান্তরিত করতে পারে :

$$CP+ADP \rightleftharpoons ATP+C$$
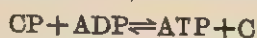
এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক রূপে কাজে করে ক্রিয়েটিন ফসফোকাইনেজ নামক একটি এনজাইম। অতএব, দেখা যাচ্ছে, অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়ার মত গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়াতেও এটিপি উৎপন্ন হয়; এবং অতিরিক্ত পরিমাণ এটিপি বর্তমান থাকলে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফসফেট মূলক ক্রিয়েটিনে যুক্ত হয়— ফলস্বরূপ গঠিত হয় ক্রিয়েটিন ফসফেট। আর আয়োডো অ্যাসেটিক অ্যাসিড বিষদুষ্ট (poisoned) পেশী যখন সংকুচিত হয় তখন কেবলমাত্র ক্রিয়েটিন ফসফেট থেকেই এটিপি উৎপাদন সম্ভব।

পেশীর সংকোচী (contractile) প্রোটিন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা থাকলেও ঠিক কী উপায়ে (mechanism) এটিপির রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তা কিন্তু এখনও অজ্ঞাত। পেশীতে আছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন—অ্যাকটিন এবং মায়োসিন (actin and myosin)। অ্যাকটিন এবং মায়োসিন মিশিয়ে দিলে তারা একটি জটিল পদার্থ অ্যাক্টো-মায়োসিন গঠন করে—এই জটিলটির দ্বারা কৃত্রিম তন্তু (synthetic threads) গঠিত হতে পারে যা এটিপির দ্রুত বিভঞ্জন ঘটিয়ে নিজে সংকুচিতও হতে পারে। তাহলে এখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে সংকোচী পেশী তন্তুর মুখ্য প্রোটিনদ্বয় হচ্ছে অ্যাকটিন এবং মায়োসিন। পেশীতে, বিশেষ করে কঙ্কাল পেশীতে, (skeletal muscle-এ) এই সকল তন্তুর বিন্যাস এবং

সংকোচন ঘটানোর ব্যাপারে এটিপির ভূমিকা এখন ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হচ্ছে। বর্তমান মতবাদ অনুযায়ী অ্যাকটিন এবং মায়োসিন তন্তুর একের অন্যের উপর গড়িয়ে যাওয়ার (sliding) ফলে পেশীর সংকোচন হয়। আমরা জানি এটিপি যথোপযুক্ত পরিবেশে অ্যাকটিন ও মায়োসিনকে আলাদা করে দিতে পারে; কাজেই স্নায়ুর দ্যোতনা (nerve impulse) যখন কোন পেশীকে সংকোচনে উত্তেজিত করে এটিপি-এজ উৎসেচক সমূহের (ATPase system) সক্রিয় হয়ে ওঠাই বোধ হয় তখনকার প্রাথমিক ঘটনা। যাহোক, এটিপির বিনাশ অ্যাকটিন এবং মায়োসিনকে পুনরায় সংযুক্ত (reassociation) হতে সাহায্য করে, ফলে সংকোচন হয়, কিন্তু তন্তুগুলির স্বতন্ত্রভাবে আকৃতিগত কোন পরিবর্তন (change of shape) ঘটে না।

গ্লাইকোলিসিসের সূচনা ঃ

গ্লাইকোজেন হচ্ছে গ্লুকোজ একক দ্বারা গঠিত একটি জটিল পলিস্যাকারাইড(polysaccharide)। ৬-২ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে গ্লুকোজ অণুগুলো গ্লাইকোজেনে পরস্পর গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী (glycosidic bond) দ্বারা যুক্ত থাকে—এই যোজক বা বন্ধনী গঠিত হয় একটি গ্লুকোজ অণুর এক নং এবং অপরটির চার নম্বর কার্বন পরমাণুর মধ্যে। এই ঋজু শৃংখল (straight chain) থেকে আবার শাখা বিস্তৃত হতে পারে (যাতে প্রায় আঠারোটি পর্যন্ত গ্লুকোজ অণু থাকতে পারে)—শাখাগুলি গঠিত হয় ১-৬-গ্লাইকোসাইডিক যোজকের সাহায্যে, তারপর যথারীতি ওটি আবার ১-৪ যোজকের সাহায্যে বিস্তৃত হতে থাকে। অতএব, বলা যেতে পারে, গ্লাইকোজেন হচ্ছে একটি শাখাযুক্ত (branched) জটিল পলিস্যাকারাইড যার আণবিক ওজন প্রায় চল্লিশ লক্ষ ডাল্টন। এনজাইম গ্লাইকোজেনের ১-৪ বা ১-৬ যোজকে আক্রমণ করে। এমন অনেক আর্দ্রবিশ্লেষণকারী এনজাইম (গ্লাইকোসাইডেজ-অ্যামাইলেজ, glycosidases-amylases) আছে যারা গ্লাইকোজেনকে ক্ষুদ্রতর পলিস্যাকারাইড বা মুক্ত গ্লুকোজ এককে ভেঙ্গে দিতে পারে। পেশীতে কিন্তু (গ্লাইকোজেনের) বিভঞ্জনের সময় জলের সাথে বিক্রিয়া করার পরিবর্তে গ্লাইকোজেন প্রথমে ১-৪ গ্লাইকোসাইডিক যোজকে অজৈব

যোজকে আক্রমণ করে বিক্রিয়া ঘটায়। গ্লাইকোজেন বিভঞ্জনে যে ফসফেট এস্টারটি (গ্লুকোজ-১-ফসফেট) প্রথমে গঠিত হয় তা ফসফো-গ্লুকোমিউটেজ (phosphoglucomutase) এনজাইম দ্বারা অতি সহজেই গ্লুকোজ-৬-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়ে যায়; স্মরণ থাকতে পারে এটিপি এবং গ্লুকোজের বিক্রিয়ায় এই ফসফেট এস্টারটিই গঠিত হয়। আলোচ্য এই সকল বিক্রিয়াই উভমুখী, অতএব যদি গ্লুকোজ এবং এটিপি অধিক পরিমাণে থাকে তাহলে ভরক্রিয়া সূত্রানুসারে বিপরীতমুখী বিক্রিয়াটি সংঘটিত হবে, অর্থাৎ গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হবে।

কিন্তু, সাম্প্রতিক কালের গবেষণার ফলাফল থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে গ্লাইকোজেনের জৈবিক সংশ্লেষণের (biosynthesis) প্রাথমিক বিক্রিয়া-পথ কিন্তু এটা নয়, অর্থাৎ ফসফোরাইলেজ বিক্রিয়ার বিপরীতমুখী বিক্রিয়াটি

গ্লুকোজ-১-ফসফেট + HO–P(=O)(OH)–O–P(=O)(OH)–O–P(=O)(OH)–O–CH_2–[রাইবোজ]–ইউরাসিল (UTP)

↓

গ্লুকোজ–O–P(=O)(OH)–O–P(=O)(OH)–O–ইউরিডিন (UDPG) + HO–P(=O)(OH)–O–P(=O)(OH)–OH পাইরোফসফোরিক অ্যাসিড

চিত্র ৬-৩ :

U T P থেকে UDPG গঠন :

নয়। তবে গ্লাইকোজেনের জৈব সংশ্লেষণে গ্লুকোজ-১-ফসফেট যে প্রাথমিক বিক্রিয়ক রূপে কাজ করে এতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় বিক্রিয়কটিও ATP-র সংগে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ একটি যৌগ, UTP (ইউরিডিন ট্রাই ফসফেট)। চিত্র ৬-৩ এ প্রদর্শিত মতে UTP গ্লুকোজ-১-ফসফেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে অজৈব পাইরোফসফোরিক অ্যাসিড এবং ইউরিডিন ডাইফসফেট গ্লুকোজ

ফসফেটের সাথে বিক্রিয়া করে; অতএব প্রক্রিয়াটি প্রকৃতিতে হাইড্রোলিসিস বা আর্দ্র বিশ্লেষণ নয়, ফসফোরোলিসিস (phosphorolysis)।

এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে 'ফসফোরাইলেজ এনজাইম' এবং তৈরী হয় গ্লুকোজ-১-ফসফেট ও গ্লাইকোজেন অণুর অবশিষ্টাংশ। ১-৪ গ্লাইকোসাইডিক যোজকের বাইরেকার বন্ধনীটি (outer tier) একবার ভেঙ্গে গেলে কিন্তু বিক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। যাহোক, কতিপয় আর্দ্রবিশ্লেষণকারী (hydrolytic) এনজাইম আছে যারা ১-৬ যোজককে বিদীর্ণ

চিত্র ৬-২

গ্লাইকোজেন বিপাকের শুরু

(split) করতে পারে, ফলে আরো অনেক ১-৪ গ্লাইকোসাইডিক যোজক উন্মুক্ত (exposed) হয় এবং এনজাইম 'ফসফোরাইলেজ' উক্ত

(UDPG)। এই UDPG-কে বলা হয় 'সক্রিয় গ্লুকোজ' (active glucose)। কেননা, গ্লাইকোজেন সিন্থেটেজ (glycogen synthetase) এনজাইমের উপস্থিতিতে UDPG-র গ্লুকোজ এককটি গ্লাইকোজেনে যুক্ত হতে পারে (১,৪-গ্লাইকোসাইড যোজকের সাহায্যে)—এই ভাবে গ্লাইকোজেনের শৃঙ্খল দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ ও বিভঞ্জনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ
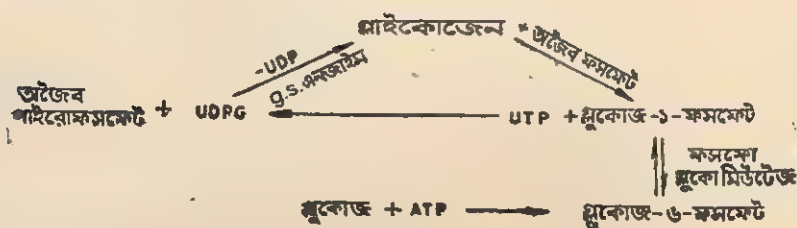
চিত্র ৬-৩ (a)

গ্লুকোজ-৬-ফসফেট গঠিত হওয়ার পর গ্লাইকোলিসিস এবং অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়া পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরী হওয়া পর্যন্ত একই পথ ধরে এগোয়। পাইরুভিক অ্যাসিড গঠিত হওয়ার পর প্রক্রিয়াদ্বয়ের গতিপথ আবার আলাদা হয়ে যায়; কেননা ঈস্টের মত পেশীকোষে 'কার্বোক্সিলেজ এনজাইম' নেই (কার্বোক্সিলেজ পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে এক অণু কার্বন-ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে)। যাহোক, পাইরুভিক অ্যাসিড (পেশীর ক্ষেত্রে) বিজারিত ডিপিএন (DPNH)-এর সাথে বিক্রিয়া করে এবং ঈস্ট নির্যাসে যে ভাবে অ্যাসিটাল-ডিহাইড বিজারিত ডিপিএন-কে জারিত করে অনেকটা সেইভাবেই এক্ষেত্রে ডিপিএনএইচ পাইরুভিক অ্যাসিড দ্বারা জারিত হয়। এইরূপে পাইরুভিক অ্যাসিড ডিপিএনএইচ দ্বারা বিজারিত হলে উৎপন্ন হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড—এই উভমুখী জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়াটি অনুঘটিত করে যে এনজাইম তাকে বলে ল্যাকটিক ডিহাইড্রোজেনেজ। তাহলে, মোটকথা হচ্ছে এই, পেশীতে সংঘটিত অবাত (anaerobic) এই বিক্রিয়াক্রমের সামগ্রিক পরিণতি হ'ল গ্লাইকোজেন থেকে উৎপন্ন প্রতি গ্লুকোজ অণু থেকে দু' অণু করে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন। আর, অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়ার মতোই এক্ষেত্রেও ডিপিএন পর্যায়ক্রমে বিজারিত এবং জারিত হয়।

পেশী নির্য্যাসের মত ঈস্ট নির্য্যাসের ক্ষেত্রেও প্রতিটি গ্লুকোজ অণুর বিপাকের জন্য চারটি করে নতুন শক্তি-সমৃদ্ধ ফসফেট বন্ধনী উৎপন্ন হয়। অযুক্ত গ্লুকোজের (free-glucose) সন্ধান ক্রিয়ায় এই নতুন চারটি বন্ধনীর দুটি গ্লুকোজের প্রারম্ভিক ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার জন্য লাগে; সুতরাং এক্ষেত্রে মোটের উপর লাভ (net gain) হচ্ছে কেবলমাত্র দুই অণু এটিপি। কিন্তু, গ্লাইকোলিসিসের প্রাথমিক পর্য্যায়ে গ্লাইকোজেন অজৈব ফসফেট দ্বারা বিভাজিত হয়, এটিপি দ্বারা নয়; সুতরাং গ্লাইকোজেন বিভজন-জাত গ্লুকোজ-১-ফসফেট গ্লুকোজ-৬-ফসফেটে রূপান্তরিত হওয়ার পর প্রতি অণু হেক্সোজ-ডাই-ফসফেট গঠনের জন্য কেবলমাত্র একটি করে এটিপি অণু দরকার হয়। তাহলে, পেশীয় গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গ্লাইকোজেনের প্রতি একক গ্লুকোজ বিপাকের জন্যে সামগ্রিক লাভ হচ্ছে তিন অণু এটিপি। এই কারণে গ্লাইকোজেনকে আমরা শক্তির আধার (energy reservoir) রূপে গণ্য করে থাকি। মুক্ত গ্লুকোজ থেকে যে গ্লুকোজ ফসফেট গঠিত হয় তার এস্টার যোজক (ester link) গঠনের জন্য এটিপি ব্যবহৃত হয় ঠিকই কিন্তু গ্লাইকোজেনের গ্লাইকোসাইডিক যোজক গঠিত হওয়ার সময় শক্তি অপচয়িত হয় না, কারণ এই শক্তি এরকমই যে অজৈব ফসফেট ওর সাথে বিক্রিয়া করে পুনরায় হেক্সোজ ফসফেট এস্টার উৎপন্ন করতে পারে; শেষোক্ত পদার্থটির তখন আবার বিপাক ক্রিয়া হতে পারে।

পেশীতে গ্লাইকোজেন বা গ্লুকোজ বিপাক ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ পূর্বে বর্ণিত ঈস্টের প্রক্রিয়ার সাথে সদৃশ। ডি পি এন এইচের পুনর্জারণ (reoxidation), অজৈব ফসফেটের ক্রিয়া, এটিপির ব্যবহার (utilisation) ইত্যাদি প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তাহলে এখন কী বলা যেতে পারে কোন পেশীতে একশো মিটার দৌড়ের সময় কি কি রাসায়নিক ঘটনা ঘটে? এটিপির কী পরিবর্তন হয়? এবং যদি অজৈব ফসফেটের ঘনত্ব বেড়ে যায় তাহলে গ্লাইকোজেন বিভজনেরই বা কী হয়?

পেশীয় গ্লাইকোলিসিসে তখন অ্যালকোহলীয় সন্ধানক্রিয়ার মতই সেই একই মৌলিক প্রক্রিয়াগুলি জারণ-বিজারণ, উদ-বিমোচন (dehydration) এবং ফসফোরাইলেশন—সংঘটিত হয়। সন্ধান প্রক্রিয়ায় শক্তির এবং কার্বন কাঠামোর রূপান্তরের এই বিক্রিয়াগুলিই হচ্ছে ভিত্তি স্বরূপ। গত চল্লিশ বছরে আমরা

লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন জীবের বিপাকক্রিয়ায় এই অপেক্ষাকৃত সরল প্রক্রিয়াগুলিই শর্করা ও শ্বেতসারের (carbohydrates) সন্ধানক্রিয়া জাত পদার্থগুলির প্রায় সকলেরই গঠনের হেতু। অর্থাৎ কিনা এই বিক্রিয়াগুলিই কার্বোহাইড্রেট থেকে সন্ধান ক্রিয়ায় উৎপন্ন প্রায় সকল পদার্থেরই গঠনের জন্য দায়ী। উদাহরণ স্বরূপ, ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটিরিয়া (lactic acid bacteria) যে বিক্রিয়া-ক্রমের মাধ্যমে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে তা পেশীতে সংঘটিত বিক্রিয়া-ক্রমের সাথে অভিন্ন। বিভিন্ন জীবের দ্বারা সংঘটিত কিছুসংখ্যক বিক্রিয়া ৬-৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, এই সকল যৌগের
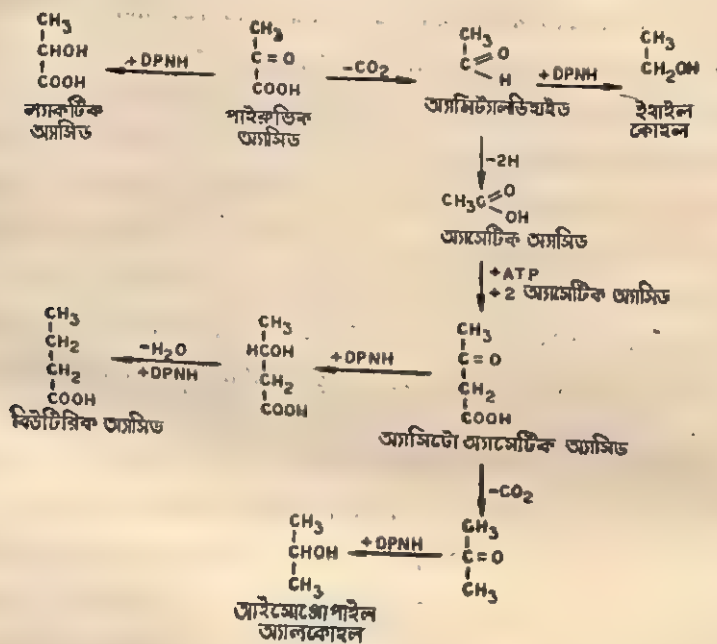
চিত্র ৬-৪ঃ
সন্ধান ক্রিয়ামূলক বিপাক (fermentative metabolism)-প্রক্রিয়ায় জাত কয়েকটি পদার্থ।

অধিকাংশেরই গঠনে কেবলমাত্র সাধারণ জারণ-বিজারণ, আর্দ্রবিশ্লেষণ বা কার্বন-ডাইঅক্সাইড বিমোচন প্রক্রিয়াগুলিই সংঘটিত হয়—এর সামগ্রিক ফল হচ্ছে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রণ গ্রহীতার (electron-acceptors) উৎপাদন, যারা

পরবর্তী পর্য্যায়ে ট্রায়োজ ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বিজারিত
ডিপিএন-কে জারিত করে দেয়। এই সকল জীবের দ্বারা পাইরুভিক অ্যাসিড
ও এই একই উপায়ে তৈরী হয়।

DPNH-এর জারণে ফ্লেবিন ও সাইটোক্রোমের ভূমিকা ঃ

এ পর্যন্ত যে সকল জারণ ক্রিয়া আলোচিত হয়েছে তাতে, আমরা
দেখেছি, ডিপিএন ইলেকট্রণ গ্রহীতার (electron-acceptor) কাজ করে। বেশ
কিছু সংখ্যক পদার্থের বিপাক ক্রিয়াতেই এই ধাপটি হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ
প্রাথমিক হাইড্রোজেন বিমোচন (initial dehydrogenation)। উল্লেখযোগ্য
কয়েকটি গবেষণায় (বিশের দশকের গোড়ার দিকে) ভারবুর্গ সবাত
পরিস্থিতিতে (aerobic conditions) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষে আরো দুইটি গুরুত্ব-
পূর্ণ কোএনজাইমের সন্ধান পান। ইলেকট্রণ গ্রহীতা রূপে আণবিক অক্সিজেন
ব্যবহার করে অনেক প্রকার জৈব পদার্থের জারণ ক্রিয়ায় লৌহ ঘটিত যৌগের,
বিশেষ করে শোণিত অঙ্গারের (blood charcoal), অনুঘটক রূপে কাজ
করবার সামর্থ্য দেখে তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আরো দেখা গেল
যে সুক্রোজকে উত্তপ্ত করে যে বিশুদ্ধ অঙ্গার পাওয়া যায় তার এই ধর্ম নেই।
সুতরাং, ভারবুর্গ (Warburg) রক্তজ অঙ্গারের বিশিষ্ট উপাদান লৌহকেই ওর
(রক্ত-অঙ্গারের) অনুঘটকীয় ক্রিয়ার জন্য দায়ী করলেন। এই পরীক্ষা এবং
আরো অন্যান্য পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি অবশেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে অক্সিজেনের
সক্রিয়করণ ও ব্যবহারের জন্য কোষে লৌহ-ঘটিত একটি পদার্থ থাকা একান্ত
প্রয়োজন।

আরেকটি পর্যবেক্ষণ থেকেও অক্সিজেন কাজে লাগানোর ব্যাপারে লৌহ-
ঘটিত যৌগের উপযোগিতার কথা জানা গেল ; দেখা গেল সায়ানাইড এবং
কার্বন মনোক্সাইড অতি সামান্য পরিমাণে থাকলেও শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হয়।
ভারবুর্গ লক্ষ্য করলেন লৌহ-অনুঘটিত জারণ ক্রিয়া সায়ানাইড রোধ করতে
সক্ষম ; এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বললেন যে সায়ানাইড একটি লৌহ ঘটিত
'রেসপিরেটরী এনজাইম' (Respiratory enzyme) এর সাথে যুক্ত হয়ে কোষীয়
শ্বাসক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও তিনি লক্ষ্য করলেন যে কার্বন
মনোক্সাইড কর্তৃক শ্বাসক্রিয়ার নিবারণ দৃশ্যমান আলোর (visible light)

অ্যামাইড থেকে গঠিত)। ফ্লেবিনদ্বয় জারিত বা বিজারিত দুই অবস্থাতেই থাকতে পারে। আর নির্দিষ্ট কিছু এনজাইমের উপস্থিতিতে ডি পি এন এইচ একটি উত্তম বিজারক দ্রব্য রূপে কাজ করে। দ্রবণে মুক্ত অবস্থায় বিজারিত ফ্লেবিন সহজেই অক্সিজেন দ্বারা পুনর্জারিত হয় : কিন্তু যখন কোন এনজাইমের সাথে যুক্ত থাকে তখন জারণ খুব সামান্যই হয়। এর কারণ অবশ্য পুরোপুরি জানা নেই।

রাইবোফ্লেবিন ফসফেট বা
ফ্লেবিন মোনো নিউক্লিওটাইড (FMN)

+ATP

ফ্লেবিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (FAD)

DPNH + FMN OR FAD ⟶ DPN + $FMNH_2$ OR $FADH_2$

চিত্র ৬-৫

রাইবোফ্লেবিন কোএনজাইম দ্বয়।

অক্সিজেন বিজারিত হওয়ার পূর্বে ফ্লেবিন বিজারিত ডি পি এন এবং অন্যান্য ইলেকট্রণ গ্রহীতাদের মধ্যে হাইড্রোজেনের 'অন্তর্বর্তী' বাহক (intermediate carrier) রূপে কাজ করে। গবেষণা থেকে জানা গেছে, বিজারিত ফ্লেবিনদের জারিত করে সাইটোক্রোম। সাইটোক্রোম রঞ্জকদ্রব্যগুলি সকল সবাত (aerobic) কোষেই বর্তমান এবং অনেক পদার্থের দ্বারাই ওদের পর্যায়ক্রমে বিজারিত ও জারিত করা যায়। এ ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে সাইটোক্রোমের মধ্যে আছে একটি প্রোটিন এবং একটি আয়রণ-

সাহায্যে প্রতিরোধ করা যায়। অন্যান্যরা পূর্বেই যেহেতু পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছেন যে কার্বন মনোক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং এই যুক্ত যৌগকে আবার দৃশ্যমান আলো দ্বারা বিয়োজিতও করা যায়, অতএব ভারবুর্গ সিদ্ধান্ত করলেন যে তার পূর্ব কথিত 'রেসপিরেটরী এনজাইমটি' একটি লৌহ ঘটিত যৌগ এবং হিমোগ্লোবিনের সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ।

কাইলিনের (Keilin) পরবর্তী গবেষণা থেকে ইলেকট্রণ পরিবহনে হিম (hemes) বা লৌহ ঘটিত পরফাইরিনের (porphyrins) গুরুত্ব স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হল। এই সকল কোষীয় রঞ্জক পদার্থের (pigments) তিনি নাম দিলেন সাইটোক্রোম (cytochromes) ; এবং পরীক্ষা দ্বারা অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন হিম (লৌহ যুক্ত) প্রোটিন (heme proteins) দেখাতে সক্ষম হলেন। এদের তিনি নাম দিলেন যথাক্রমে সাইটোক্রোম 'এ', 'বি' এবং 'সি'।

ভারবুর্গ এবং ক্রিস্টিয়ান (Christian) কোষ থেকে দ্বিতীয় আরেকটি কোএনজাইম পৃথক করলেন ; এটি জারণ প্রক্রিয়া শুরু করতে আবশ্যক। তারা ঈস্ট থেকে আরেকটি হলুদ বর্ণের প্রোটিন পৃথক করলেন ; এই প্রোটিনটি বিজারিত ডিপিএন থেকে অন্য কোন ইলেকট্রণ গ্রহীতাতে ইলেকট্রণ স্থানান্তর ত্বরান্বিত করতে পারে। বিজ্ঞানীদ্বয় ঈস্টের এই হলুদ বর্ণের উপাদানটিকে অভিস্রবণ (dialysis) প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথক করলেন এবং বিশুদ্ধ-করণে সমর্থ হলেন। প্রমাণিত হল এটি রাইবোফ্লেবিন (Riboflavin) ভিটামিন যা ডিপি এন এইচ থেকে ইলেকট্রণ গ্রহণে সক্ষম। বিজারিত ফ্লেবিন যৌগ যেহেতু বর্ণহীন, বিজ্ঞানীদ্বয় পদার্থটির হলুদ বর্ণের অন্তর্ধান লক্ষ্য করে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করলেন। প্রত্যাশানুযায়ী ইলেকট্রণ পরিবহনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী এই যৌগটি কিন্তু মুক্ত রাইবোফ্লেবিন নয়, বরং ওটির নিউক্লিওটাইড সঞ্জাত যৌগ।

ইলেকট্রণ পরিবহনের সাথে যুক্ত দুই প্রকারের রাইবোফ্লেবিন যৌগ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। ওদের একটি হচ্ছে ফ্লেবিন মোনোনিউক্লিওটাইড (flavin mononucleotide) বা রাইবোফ্লেবিন ফসফেট ; এবং দ্বিতীয়টি হল ফ্লেবিন অ্যাডিনিন ডাই নিউক্লিওটাইড (চিত্র নং ৬-৫ দ্রষ্টব্য) ; শেষোক্তটি ডি পি এন-এর সাথে সদৃশ (ডি পি এন আরেকটি বি-ভিটামিন নিকোটিনিক অ্যাসিড

পরফাইরিন বলয় (Iron porphyrin ring)। সাইটোক্রোমের আয়রন পরফাইরিন বলয়টি ৬-৬ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে চারটি পাইরোল বলয় (pyrrole ring) এবং একটি লৌহ আয়ন দ্বারা গঠিত, এবং হিমোগ্লোবিনের রক্তিম দ্রব্যটির (হিম) সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্য পূর্ণ। সায়ানাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড এই সকল লৌহ ঘটিত অনুঘটকের পক্ষে তীব্র বিষ স্বরূপ। সাইটোক্রোমে পরফাইরিন গ্রুপের লৌহই জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ঃ $Fe^{+++} + e \rightarrow Fe^{++}$. সাইটোক্রোমদের একটি, সাইটোক্রোম-সি, অক্সিজেনে ইলেকট্রণ স্থানান্তরের (অক্সিজেনকে বিজারিত করবার) ব্যাপারে বিশেষ

$FMNH_2$ + 2 সাইটোক্রোম $C(Fe^{+++}) \longrightarrow$
OR
$FADH_2$
FMN OR FAD + 2 সাইটোক্রোম $C(Fe^{++})$
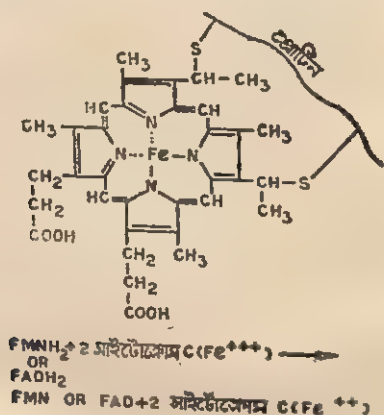
চিত্র ৬-৬ঃ
সাইটোক্রোম-সি

গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এই সাইটোক্রোমের পরফাইরিন গ্রুপটি একজোড়া যোজকের সাহায্যে নিজেকে একটি প্রোটিনের সাথে যুক্ত করে—এই যোজকদ্বয় (linkage) গঠিত হয় পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের সিস্টাইন অণুর দুটি সালফার পরমাণুর সাথে। বিজারিত 'সাইটোক্রোম-সি' কে আণবিক অক্সিজেন দ্বারা জারিত করতে আরেকটি এনজাইম (সাইটোক্রোম-সি অক্সিডেজ) দরকার হয়।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে, অতএব, একথাই প্রতীয়মান হয় যে অক্সিজেনে ইলেকট্রণ পরিবহনের প্রক্রিয়াটি (অক্সিজেন দ্বারা জারণের প্রক্রিয়াটি) নিম্নরূপে সম্পন্ন হয়ঃ প্রথমে ফ্লেবিন কোএনজাইম থেকে সাইটোক্রোমে এবং

তারপর সাইটোক্রোম থেকে আণবিক অক্সিজেনে ইলেকট্রণ স্থানান্তরিত হয়। যে সকল বায়ুজীবীদের (aerobic organisms) নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রেই ইলেকট্রণ নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী প্রবাহিত হয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে ঃ ডিপি এন এইচ → ফ্লেবিন → সাইটোক্রোম → আণবিক অক্সিজেন।

কয়েকটি জারক দ্রব্যের (ইলেকট্রণ গ্রহীতা) প্রস্তুতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা

অনেক জীবই দেহাভ্যন্তরে সার্কাসিনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এটি একটি চার কার্বন বিশিষ্ট দ্বিকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড (dicarboxylic acid), HOOC. CH_2. CH_2. COOH, ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক বছর ধরে এই সার্কাসিনিক অ্যাসিডের গঠন কিন্তু জীবরসায়নবিদদের কাছে প্রহেলিকা পূর্ণ ছিল ; কেননা একটি ছয়-কার্বন-শর্করা থেকে বা তিন-কার্বন যৌগ (যেমন পাইরুভিক অ্যাসিড) থেকে কী করে একটি চার কার্বন যৌগের উৎপত্তি হতে পারে তা বিজ্ঞানীদের কাছে মোটেই পরিষ্কার ছিল না। যাহোক, পূর্বেকার গবেষণা থেকে এখন আমাদের জানা আছে বাড়ন্ত কোষপূর্ণ (growing cell) মাধ্যমের কার্বন-ডাই-অক্সাইড টান (tension) সার্কাসিনিক অ্যাসিডের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রবণতা দেখায়। এ ব্যাপারে আরো তথ্য জানা গেল উড এবং ভার্কম্যানের (Wood and Workman) গবেষণা থেকে। তারাই প্রথম লক্ষ্য করেন যে ডিপিএনএইচ থেকে ইলেকট্রণ গ্রহণ করতে পারে এমন বিশেষ কিছু যৌগের গঠনে কার্বন ডাই অক্সাইডের অধিগ্রহণ (স্থিরণ বা অধিযোজন, uptake or fixation) অসালোক-সংশ্লেষীয় জীবের (non photosynthetic organisms) একটি অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া।

পরবর্তী কালে কার্বনের দু'টি উচ্চতর পরমাণুভর বিশিষ্ট আইসোটোপ (কার্বন-১৩ এবং কার্বন-১৪) দ্বারা চিহ্নিত (labeled) কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে পাইরুভিক অ্যাসিডের মিথাইল মূলকের সাথে কোন প্রকারে কার্বন ডাই অক্সাইড একবার জুড়ে দিতে পারলে একটি চার কার্বন অ্যাসিড (অক্সালো অ্যাসেটিক অ্যাসিড) গঠিত হয়। এই অক্সালো অ্যাসেটিক অ্যাসিড ডি পি এন এইচ দ্বারা বিজারিত হয়ে গঠন করে ম্যালিক অ্যাসিড (malic acid)। পরবর্তী পর্যায়ে ম্যালিক অ্যাসিড

উদ্‌বিমোচন করে ফিউমারিক অ্যাসিড গঠন করতে পারে এবং এই ফিউমারিক অ্যাসিডকে আবার ডি পি এন এইচ দ্বারা বিজারিত করলে গঠিত হয় সাকসিনিক অ্যাসিড। আলোচ্য বিক্রিয়াবলী ৬-৭ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এইরূপে কার্বন ডাই অক্সাইড পাইরুভিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে কিছু বিশেষ যৌগ গঠন করতে পারে যারা DPNH-কে জারিত করে অর্থাৎ ইলেকট্রণ-গ্রহীতা রূপে কাজ করতে পারে।
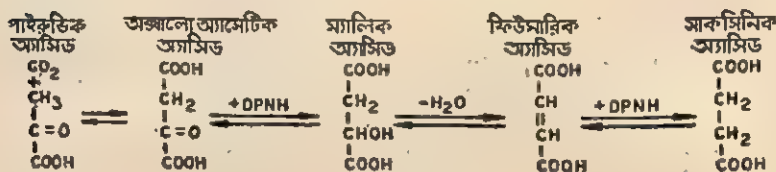
চিত্র ৬-৭

পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে সাকসিনিক অ্যাসিডের প্রস্তুতি (formation)।

Szent-Gyorgyi তার প্রথম দিককার গবেষণায় সাকসিনিক অ্যাসিড এবং ফিউমারিক অ্যাসিড জাতীয় যৌগগুলি দেহকলার শ্বাসক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোগায় (Stimulate) দেখে ভাবলেন যে এই সকল যৌগ হাইড্রোজেন পরিবহন প্রক্রিয়ায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এব্যাপারে এদের অনুঘটকীয় ক্রিয়াকলাপ (Catalytic role) রয়েছে। যতদিন না ক্রেবস্ (Krebs) আবিষ্কার করেন যে এরা ইলেকট্রণ পরিবহনের একটি চক্রক্রম প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ততদিন ইলেকট্রণ পরিবহনে এই সকল চার কার্বন বিশিষ্ট দ্বিকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের ভূমিকা রহস্যাবৃত ছিল। ক্রেবস্ বললেন শ্বাসক্রিয়ায় এই সকল অ্যাসিডের অনুঘটকীয় ভূমিকা রয়েছে তার কারণ হচ্ছে এদের এক চক্রক্রম বিক্রিয়া শ্রেণীতে অংশগ্রহণ। এই চক্রক্রম বিক্রিয়া শ্রেণী পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণের জন্য প্রয়োজনীয় (জারণজাত পদার্থ হল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল)। এই সকল বিক্রিয়ায় 'ডিপিএন-ফ্লেবিন-সাইটোক্রোম' তন্ত্রের মাধ্যমে ইলেকট্রণ অক্সিজেনে পরিবাহিত হয়। আলোচ্য বিক্রিয়া শ্রেণীটির সামগ্রিক পরিণতি হল পাইরুভিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ দহন (complete combustion)—এই দহনক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জারণ মূলক বিপাক ক্রিয়া
ও
ক্রেব্স্ চক্র

পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ ঃ অ্যাসিটাইল কো-এনজাইম-এ'র গঠন—সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র—কোষের শক্তির আধার মাইটোকন্ড্রিয়া—স্নেহপদার্থ—স্নেহপদার্থ ঘনীভূত খাদ্যের উৎস—ট্রাইগ্লিসেরাইড—ফসফোলিপিড ও গ্লাইকোলিপিড—ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপাক—অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাক ঃ বিজারণ মূলক অ্যামিনেশন—ট্রান্স অ্যামিনেশন—অর্ণিথিন চক্র—কার্বোহাইড্রেট বিপাকের বিকল্প পদ্ধতিসমূহ ঃ পেণ্টোজ সাণ্ট—সংক্ষিপ্তসার।

ব্যবহৃত গ্লুকোজ এককের সংখ্যা বিবেচনা করলে গ্লাইকোলিসিসকে এটিপি সংশ্লেষণের খুব কার্যকরী প্রক্রিয়া বলা চলে না; কেননা বিক্রিয়া-জাত পদার্থে তখনও যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি নিহিত থেকে যায়। আগের পরিচ্ছেদেই একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ মূলক বিপাক ক্রিয়াই (oxidative metabolism) বায়ুজীবীদের (aerobic organisms) ফসফেট যোজক শক্তি উৎপাদনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। কার্বোহাইড্রেট বিপাকের এই পর্যায় (stage)-কে বলে ক্রেব্সের সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র (Krebs cycle বা tricarboxylic acid cycle বা citric acid cycle) এবং এই ক্রিয়া-চক্রটি কোষীয় *বিপাক ক্রিয়ার মূলপথগুলির (main routes) মিলনস্থলকে* কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এই বিপাক চক্রটি (cyclic metaboli machine) কেবলমাত্র গ্লুকোজ সংক্রান্ত পদার্থ নিয়েই কাজ করে না, অ্যামিনো অ্যাসিড ও স্নেহজ অম্লের (fatty acid) বিপাকজাত পদার্থও এর এক্তিয়ার ভুক্ত।

পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ (Pyruvic Acid Oxidation)

প্রারম্ভিক মৌল বিক্রিয়া সমূহের (Initial key reactions) একটিতে

(পাইরুভিক অ্যাসিড বিপাকে) কার্বন-ডাই-অক্সাইড অপসারিত হয় এবং গঠিত হয় একটি সক্রিয় (শক্তিসমৃদ্ধ) দুই কার্বন একক। পাইরুভিক অ্যাসিডের এই প্রাথমিক বিক্রিয়াটির অ্যালকোহল গঠনের ক্ষেত্রে যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তার সাথে অনেক মিল আছে ; যেহেতু এক্ষেত্রে প্রথম ধাপটি হচ্ছে পাইরুভেটের (pyruvate) কার্বন ডাই অক্সাইড বিমোচন (decarboxylation) এবং ফল-স্বরূপ একটি সক্রিয় অ্যালডিহাইড গঠন। যাহোক, এদের মূল বৈসাদৃশ্যটি হল এইখানে যে পাইরুভিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে উৎপন্ন দুই-কার্বন এককটি মুক্ত অ্যাসিট্যালডিহাইড নয়,—ওটি ডিকার্বোক্সিলেজ এনজাইমটির কোএনজাইম থিয়ামিন পাইরোফসফেটের (TPP) সাথে যুক্ত অবস্থায় বর্তমান (চিত্র নং ৭-১

$CH_3-C(=O)-COOH + TPP \xrightarrow[\text{বিমোচন}]{\text{কার্বন ডাইঅক্সাইড}} TPP[CH_3C(=O)H] + CO_2$

উদ্দীপিত অ্যাসিট্যালডিহাইড

↓ + S–S>L (লিপোয়িক অ্যাসিড)

TPP + CH–C(=O)~S–L–S–H

অ্যাসিটাইল লিপোয়িক অ্যাসিড

↓ +HS–CoA (কোএনজাইম-এ)

$CH_3-C(=O)\sim S\,CoA$ + HS–L–HS

অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ

বিজারিত লিপোয়িক অ্যাসিড

↓ + DPN

S–S>L + DPNH

মোট বিক্রিয়া

$CH_3COCOOH + CoA + DPN \longrightarrow CH_3C(=O)\sim S-CoA + DPNH + CO_2$
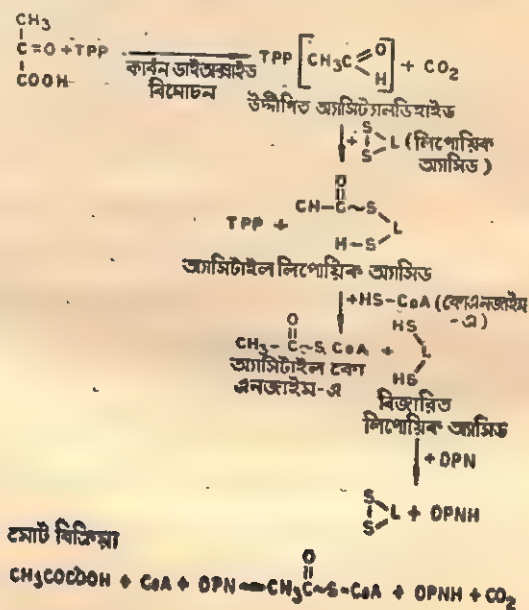
চিত্র ৭-১

পাইরুভিক অ্যাসিডের 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ'-তে (Acetyl CoA) রূপান্তর

দ্রষ্টব্য)। এই সক্রিয় (activated) অ্যালডিহাইডটি আবার দ্বিতীয় একটি কোএনজাইম লিপোয়িক অ্যাসিডে (lipoic acid) স্থানান্তরিত হয় ; লিপোয়িক অ্যাসিডে আছে একটি ডাইসালফাইড (S—S) যোজক। সক্রিয় অ্যালডিহাইডটি

দ্বারা এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় ডাইসালফাইড যোজকটি বিজারিত হয় এবং গঠিত হয় একটি সালফহাইড্রাইল (—SH) মূলক ; আর ডাইসালফাইড যোজকের দ্বিতীয় গন্ধক পরমাণুটির সাথে এসে যুক্ত হয় শক্তিসমৃদ্ধ অ্যাসিটাইল মূলকটি।

ট্রায়োজ ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ বিক্রিয়ায় যে 'শক্তি সমৃদ্ধ তিন কার্বন একক'টি গঠিত হয় তার সাথে এক্ষেত্রের এই দ্বিকার্বন এককটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই সক্রিয় C_2-এককটি এখন আরেকটি কোএনজাইম (কোএনজাইম-এ, CoA)-এর SH মূলকে স্থানান্তরিত হয় ; ফলস্বরূপ উৎপন্ন হয় পূর্ণ বিজারিত লিপোয়িক অ্যাসিড (দুটি—SH মূলক গঠিত হয়) এবং 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ'। বিজারিত লিপোয়িক অ্যাসিড ডিপিএনের সাথে বিক্রিয়া করে বিজারিত ডিপিএন (DPNH) এবং লিপোয়িক অ্যাসিড অণুর মূল সক্রিয় রূপটি (S—S যোজক) উৎপন্ন করে। অতএব, এই জটিল বিক্রিয়াবলীর (৭-১ নং চিত্রে বর্ণিত) সামগ্রিক ফল হচ্ছে একটি শক্তি সমৃদ্ধ দ্বিকার্বন একক, ডিপিএনএইচ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গঠন। লক্ষণীয় যে এই জারণ মূলক কার্বন ডাই অক্সাইড বিমোচনে (Oxidative decarboxylation) বিমুক্ত শক্তি তাপরূপে অপচয়িত হয় না, যেমন ঘটে মুক্ত অ্যাসেটিক অ্যাসিড বিক্রিয়াজাত পদার্থ (product) রূপে গঠিত হবার বেলায়। 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ' কে আর্দ্র বিশ্লেষিত করা হলে উৎপন্ন হয় 'কোএনজাইম-এ' (CoA) এবং অ্যাসেটিক অ্যাসিড ; এই বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ তাপ উদ্ভূত হয়।

পাইরুভিক অ্যাসিড বিপাকে অংশ গ্রহণ কারী কোএনজাইমগুলির গঠন ভঙ্গী (Structures) চিত্র নং ৭-২-এ দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, চিত্রে প্রদর্শিত কোএনজাইম তিনটির প্রত্যেকটিরই গঠনে গন্ধক পরমাণু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে রয়েছে এবং বি-ভিটামিন প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (Pantothenic acid) 'কোএনজাইম-এ' অণুর একটি বিশেষ অংশ। ৭-১ নং চিত্রে বর্ণিত বিক্রিয়া শ্রেণীটির সঠিক ক্রিয়া কৌশল (exact mechanism) বর্তমানে পরিষ্কার রূপে বোঝা না গেলেও মূল বিক্রিয়াজাত পদার্থ 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ' র গঠন কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত। বহু সংখ্যক জৈব অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়ার মূল বিক্রিয়াজাত পদার্থ এই 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ'।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে এই C_2-এককের (C_2 unit) জারণের মাধ্যমে সংঘটিত হয় যে অতিরিক্ত বিপাকক্রিয়া তা 'শেষ পর্যন্ত আণবিক অক্সিজেনে ইলেকট্রণ স্থানান্তরকারী বিক্রিয়া শ্রেণীর' সাথে সম্পর্ক যুক্ত। ফলস্বরূপ, অক্সিজেনের উপস্থিতিতেই এই বিক্রিয়া সমূহ পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায় (ক্রেব্‌স্ চক্রে পাইরুভিক অ্যাসিডের কার্বন ডাই অক্সাইডে রূপান্তরের জন্য অক্সিজেন অত্যাবশকীয়) এবং উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তি ;—এই শক্তি এটিপি রূপে সংরক্ষিত হয়।

থিয়ামিন পাইরোফসফেট (TPP)

লিপোয়িক অ্যাসিড

কোএনজাইম-এ

প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড
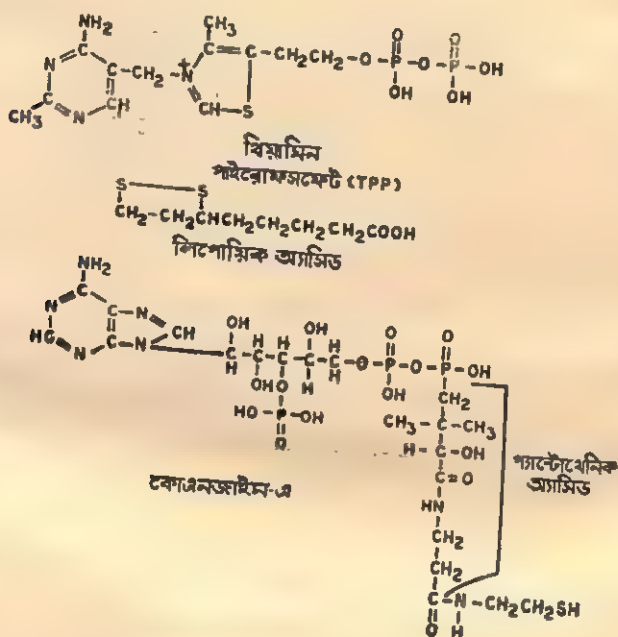
চিত্র ৭-২

পাইরুভিক অ্যাসিড বিপাকে অংশগ্রহণকারী কোএনজাইম সমূহ।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র শুরু হয় অক্সালো অ্যাসেটিক অ্যাসিডের সাথে সক্রিয় অ্যাসেটিক অ্যাসিড অণুর সংযুক্তি (condensation) দিয়ে—এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তিনটি কার্বোক্সিল মূলক বিশিষ্ট একটি ছয়-কার্বন্ যৌগ, যার নাম সাইট্রিক অ্যাসিড (চিত্র ৭-৩ দ্রষ্টব্য)। লক্ষণীয় যে, 'অ্যাসিটাইল-

কোএনজাইম-এ' যোজকের (Acetyl-CoA link) শক্তি এই সংযোজন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, এবং ফলস্বরূপ, কোএনজাইম-এ অণু অতি সহজেই অপসারিত হয়। পরবর্তী দুটি ধাপে জলের অণুর অপসারণ ও সংযুক্তির মাধ্যমে সাইট্রিক অ্যাসিড পুনর্বিন্যস্ত (rearranged) হয়—গঠিত হয় আইসো সাইট্রিক অ্যাসিড।

৭ ৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে আইসো সাইট্রিক অ্যাসিড তখন জারিত হয়ে

চিত্র ৭-৩ঃ

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের বিক্রিয়াসমূহঃ (তারকা * চিহ্ন অক্সালো সাকসিনিক অ্যাসিড এবং আলফা কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস নির্দেশ করে)।

একটি নতুন কিটো অ্যাসিড (keto acid) গঠন করে। এই কিটো অ্যাসিডটি দ্রুত কার্বন ডাই অক্সাইড বিমোচন করে আলফা-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিডে

পরিণত হয়। α-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিডটির বিপাকক্রিয়া পাইরুভিক অ্যাসিড বিপাকের প্রাথমিক পর্য্যায় গুলির সাথে সদৃশ একটি পর্য্যায় ক্রমে সংঘটিত হয়, এবং এই কিটো অ্যাসিডটির জারণমূলক কার্বন ডাই-অক্সাইড বিমোচন প্রক্রিয়ায় (oxidative decarboxylation) উৎপন্ন হয় সাক্সিনিক অ্যাসিড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ডিপিএনএইচ এবং এটিপি। সাক্সিনিক অ্যাসিড তখন ফিউমারিক অ্যাসিডে জারিত হয়; প্রতিদানে ফিউমারিক অ্যাসিড উদসংযোজন (hydration) প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করে ম্যালিক অ্যাসিড। ম্যালিক অ্যাসিড (malic acid) জারিত হয়ে অক্সালো অ্যাসেটিক অ্যাসিড পুনরুৎপাদন করে এবং এইখানেই চক্রটি (cycle) সম্পূর্ণ হয়। কেননা, উৎপন্ন অক্সালো অ্যাসেটিক অ্যাসিড পুনরায় চক্রের প্রারম্ভিক বিক্রিয়ায় (অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ'র সংযোগ) অংশ নেয় এবং সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে—এইরূপে চক্রটি পুনরায় অগ্রসর হতে থাকে। প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলি সব উপস্থিত থাকলে চক্রের অন্তর্গত যে কোন যৌগ দিয়েই বিক্রিয়াক্রমটি শুরু করা যেতে পারে। তবে চক্রটিকে চালু রাখতে গেলে নিরবচ্ছিন্নভাবে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ অবশ্যই সরবরাহ করে যেতে হবে।

নিম্নোক্ত এই এনজাইম সমষ্টি—অর্থাৎ ডিহাইড্রোজেনেজ গোষ্ঠী, ডিকার্বোক্সিলেজ গোষ্ঠী, ইত্যাদি—যারা ক্রেবস্ চক্রের জটিল বিক্রিয়াগুলি পরিচালনা করে তাদের অবস্থান কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায়। কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে এই মাইটোকন্ড্রিয়ায় অবস্থান করছে বহু কোএনজাইম; এদের মধ্যে রয়েছে কোএনজাইম-এ, ডিপিএন (বা NAD), ফ্লেবিনদ্বয়, এবং সাইটোক্রোম গোষ্ঠী, এছাড়াও রয়েছে আরেকটি নতুন ইলেকট্রণ-পরিবাহক কোএনজাইম, যার নাম দেওয়া হয়েছে কোএনজাইম 'কিউ' (Q)। শেষোক্ত কোএনজাইমটি একটি কুইনোন (Quinone) জাতীয় যৌগ এবং এটি ভিটামিন-কে (vitamin-K)-র সাথে সম্পর্ক যুক্ত। বিজারিত ফ্লেবিনের জারণের জন্য 'কোএনজাইম-কিউ' অপরিহার্য। বিভিন্ন প্রকারের বহু কোষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া পৃথক করা গেছে এবং কোষীয় বিপাকক্রিয়ার অন্তিম জারণ বিক্রিয়াগুলি মাইটোকন্ড্রিয়া নিজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া এ তথ্যটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে মাইটোকন্ড্রিয়া বিজারিত কোএনজাইম

ডিপিএনএইচ বা টিপিএনএইচ-কে জারিত করতে পারে; এসঙ্গে উদ্ভূত হয় শক্তি। এই জারণমূলক ফসফোরাইলেশন (এই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য কোএনজাইমদেরও দরকার হয়) জারণক্রিয়া ঘটিত বিপাকের (oxidative metabolism) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়। এবং এইসকল সহ-প্রভাবকের (কোফ্যাক্টরের তথা কোএনজাইমের) জারণ থেকে উদ্ভূত শক্তি এটিপি সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

অতএব, বিজারিত ডিপিএনের উচ্চশক্তি স্তর (high energy level) থেকে অন্যান্য কোএনজাইমের নিম্নশক্তি স্তরে ইলেকট্রণ প্রবাহের ফলে শক্তি নির্মুক্ত (liberated) হয়—এবং এই শক্তি ব্যবহার করে গঠিত হয় এটিপি। বিভিন্ন মাইটোকনড্রীয় অংশ নিয়ে সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় দেখা গেছে, অক্সিজেনের দ্বারা ডিপিএনএইচ জারিত হওয়ার কালে তিনটি ক্ষেত্রে (sites) এটিপি সংশ্লেষিত হয়। এটিপি গঠনের এই ক্ষেত্রত্রয় (বিক্রিয়া স্থল তিনটি) নিম্নরূপ (তীর চিহ্ন ইলেকট্রণ প্রবাহের দিক্ নির্দেশ করছে):

ডিপিএনএইচ→ফ্লেবো প্রোটিন→কোএনজাইম কিউ: এক অণু এটিপি গঠিত হয়

কোএনজাইম কিউ→সাইটোক্রোম বি→সাইটোক্রোম সি: এক অণু এটিপি গঠিত হয়

সাইটোক্রোম-সি→সাইটোক্রোম অক্সিডেজ→অক্সিজেন: এক অণু এটিপি গঠিত হয়

অতএব, মাইটোকণ্ড্রীয় এনজাইম-গোষ্ঠী (mitochondrial enzyme complex) দ্বারা এক অণু ডিপিএনএইচ জারণের ফলে উৎপন্ন হয় তিন অণু এটিপি। এর ফলে অক্সিজেনে স্থানান্তরিত হয় দুটি ইলেকট্রণ (অর্থাৎ 2H) এবং ফলস্বরূপ তিনটি অজৈব ফসফেট অণুর এস্টারায়ণ (esterification) ঘটে। যেহেতু, একটি মাত্র অক্সিজেন পরমাণু ব্যবহৃত হচ্ছে ($2H+O\rightarrow H_2O$) অতএব, ব্যয়িত ফসফেট এবং অক্সিজেনের পারস্পরিক অনুপাত হল ৩ : ১ (P/O = 3)। লক্ষণীয় যে, এখানে একটি পাইরুভিক অ্যাসিড অণুর জারণে চার অণু বিজারিত পাইরিডিন নিউক্লিওটাইড গঠিত হয় এবং তাদের জারণের ফলে উৎপন্ন হয় মোট বারো অণু এটিপি। সাকসিনিক অ্যাসিডের জারণে গঠিত হয় আরো দুই অণু এটিপি (যেহেতু বিজারিত ফ্লেবো প্রোটিনের

জারণ থেকে দুই অণু ATP সংশ্লেষিত হতে পারে) এবং কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডের জারণে একটি। তাহলে এক অণু পাইরুভিক অ্যাসিডের পরিপূর্ণ দহনক্রিয়ার (এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল) ফলস্বরূপ সামগ্রিকভাবে পনের অণু এ টি পি সংশ্লেষিত হচ্ছে। আর এই ঘটনাটি ঘটছে মাইটোকন্ড্রিয়ায়। তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের 'শক্তির আধার' (Powerhouses of the cell) বলা হয়। আধুনিক জীবরসায়ন বিদ্যার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বিষয় হল এই জারণমূলক ফসফোরাইলেশন (Oxidative Phosphorylation)। এবং বর্তমানে এই প্রকার জারণমূলক প্রক্রিয়ায় এ টি পি সংশ্লেষণের মূলকৌশল (mechanism) নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

তাহলে এখন ক্রেব্স্ চক্রের সারমর্ম নীচের সরল চিত্রটির (চিত্র ৭-৪) সাহায্যে সহজেই বোঝানো যেতে পারে।
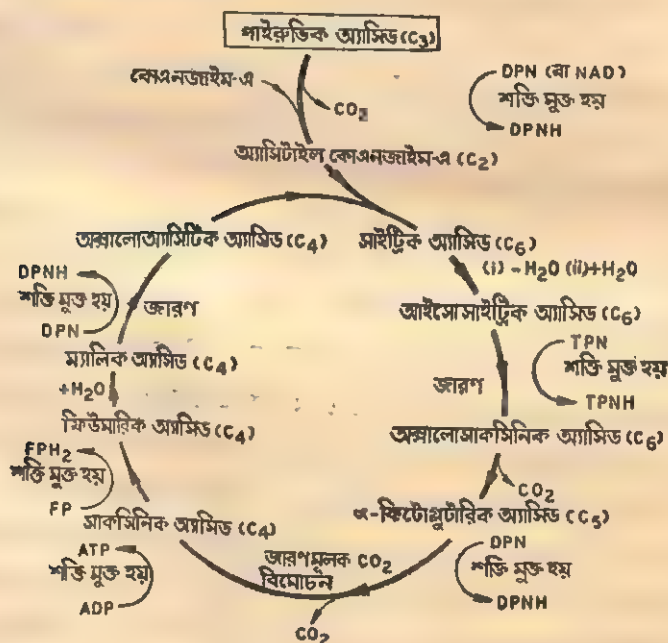
চিত্র ৭-৪ঃ

সুতরাং, ক্রেবস্ চক্রে শক্তি উৎপাদন নিম্নরূপ ঃ

$$\left.\begin{array}{l} 4\ DPNH \Rightarrow 12\ ATP \\ 1\ FPH_2 \Rightarrow 2\ ATP \\ 1\ ATP \Rightarrow 1\ ATP \end{array}\right\}$$ মোট 15 অণু ATP উৎপন্ন হচ্ছে প্রতিটি পাইরুভিক অ্যাসিড অণু থেকে।
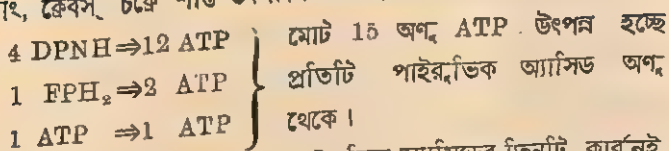
উপরের চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পাইরুভিক অ্যাসিডের তিনটি কার্বনই শেষ পর্যন্ত CO_2-এ রূপান্তরিত হয়। তাহলে, সবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে সর্ব মোট বিক্রিয়াটি দাঁড়াচ্ছে এই রকম ঃ

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি}$$
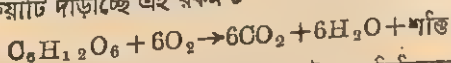
সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল বিক্রিয়কের জারণ এবং এটিপি উৎপাদনের ভিত্তিতে বিবেচিত হলেও এটি কিন্তু আরো অনেক যৌগের কার্বন কাঠামো (carbon skeletons) গঠনে ও কাজে লাগানোয় (utilisation) বিশেষ উপযোগী। অনেক বছর ধরে শর্করা ও শ্বেতসারের বিভঞ্জনকে মুখ্যতঃ একটি ভাঙ্গাচোরার প্রক্রিয়া (degradation process) বলে মনে করা হত, যার উদ্দেশ্য হল কেবল শক্তি উৎপাদন। শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে এই তথ্য নিঃসন্দেহে সত্য ; কিন্তু এখন আমরা জানি জৈবিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বহু যৌগের সংশ্লেষণের জন্য কার্বোহাইড্রেট বিভঞ্জন প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ অন্তর্বর্তী যৌগের উৎপাদনও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তবিক পক্ষে, বর্তমানে বিজ্ঞানীদের ধারণা, কোষের দ্রুত বৃদ্ধির সময় সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের প্রধান কাজ হল জৈবিক সংশ্লেষণের জন্য দরকারী কোষীয় কার্বন কাঠামো সমূহ তৈরী ও সরবরাহ করা।

একথাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে বিবর্তনের সময় বিভিন্ন প্রকারের কোষ শর্করার সন্ধানজাত পদার্থ ও অন্যান্য কোষীয় খাদ্যদ্রব্য বিপাকের জন্য বিভিন্ন তন্ত্রের সৃষ্টি করে নি। বরং, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মাইটোকন্ড্রিয়ন ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অন্যান্য জ্বালানীরও কোষীয় চুল্লী (Cellular furnace) রূপে কাজ করে।

ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদির বিপাক আলোচনার পূর্বে কার্বোহাইড্রেট বিপাকের সারমর্মটি একবার পর্যালোচনা করে নিই। অবাত বা সবাত শ্বসন উভয় ক্ষেত্রেই গ্লুকোজ অ্যালকোহলীয় সন্ধান ক্রিয়ার বেলা যে বিক্রিয়া শ্রেণী দেখানো হয়েছে সেই একই প্রকার বিক্রিয়া শ্রেণীতে (চিত্র ৫-৮

দ্রষ্টব্য) পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। তারপর অবাত শ্বসনের বেলা পাইরুভিক অ্যাসিড DPNH-এর ব্যয়ে বিজারিত হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ইথাইল অ্যালকোহলে। আর সবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে পাইরুভিক অ্যাসিড ক্রেবস্ চক্রে অংশ নেয়।
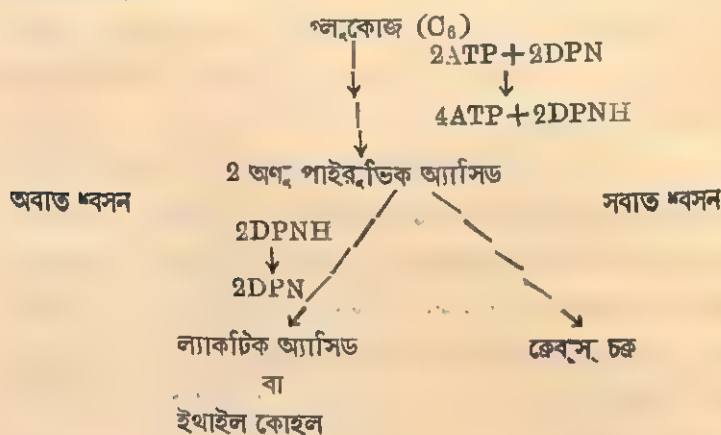
সুতরাং,

অবাত শ্বসনে শক্তি উৎপাদন
প্রতি গ্লুকোজ অণু থেকে ঃ
২ অণু ATP

সবাত শ্বসনে শক্তি উৎপাদন
প্রতি গ্লুকোজ অণু থেকে ঃ
গ্লাইকোলিসিস ঃ
২অণু ATP
২ অণু DPNH ⇒ ৬ অণু ATP } ৮ অণু ATP
ক্রেবস চক্র ঃ ৩০ অণু ATP

সর্বমোট ঃ ৩৮ অণু ATP

স্নেহপদার্থ (LIPIDS & FATS)

কোষের জৈব পদার্থের সম্ভার মূলতঃ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট আর স্নেহপদার্থ নিয়ে গঠিত। স্নেহপদার্থ (lipid and fat) জলে সাধারণতঃ অদ্রাব্য কিন্তু কোন কোন জৈব দ্রাবকে দ্রাব্য ; ফলস্বরূপ কোষ থেকে এদের পৃথক করবার জন্য ইথানল বা ইথার জাতীয় জৈব দ্রাবক ব্যবহার করা আবশ্যক। লিপিড বিভিন্ন

উপাদানে গঠিত এক অসমসত্ত্ব শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থ (a heterogeneous group of chemicals)। অধিকাংশ লিপিডই জৈব এস্টার (Ester) শ্রেণীর যৌগ, অর্থাৎ কোহল আর অ্যাসিডের সংযোগে উদ্ভূত। সাধারণ শ্রেণীর লিপিডে থাকে কেবলমাত্র কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ; তবে কার্বো-হাইড্রেটের তুলনায় লিপিডে অক্সিজেনের পরিমাণ কম। এবং এই সকল লিপিডকে আর্দ্র বিশ্লেষিত করা হলে উৎপন্ন হয় গ্লিসেরল (glycerol) এবং ফ্যাটী অ্যাসিড। ফ্যাটী অ্যাসিড বা স্নেহজ অম্ল অপেক্ষাকৃত সরল জৈব যৌগ—এতে থাকে একটি প্রান্তিক কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড মূলক (terminal carboxylic acid radical) আর একটি হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খল (hydrocarbon chain)। কার্বোক্সিল মূলকটি ধ্রুবীয় (polar) এবং জলে দ্রবণীয়, কিন্তু হাইড্রোকার্বন অংশটি অধ্রুবীয় (nonpolar) এবং জলে অদ্রবণীয়। ফলে হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলটি যতো বড়ো হয় ফ্যাটী অ্যাসিডটি জলে ততই অদ্রবণীয় হয়ে পড়ে।
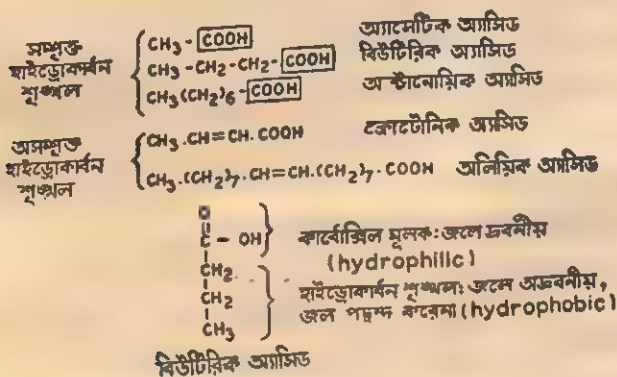
চিত্র ৭ ৫

কয়েকটি ফ্যাটী অ্যাসিড

ফ্যাটী অ্যাসিডের এই হাইড্রোকার্বন অংশটি সম্পৃক্তও হতে পারে আবার অসম্পৃক্তও হতে পারে ; অর্থাৎ শৃঙ্খলে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা কার্বনের যোজ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ (সম্পৃক্ত) হতেও পারে নাও পারে (অসম্পৃক্ত)। ফ্যাটী অ্যাসিডের হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলটি শাখাযুক্তও (branched) হতে পারে। ফ্যাটী অ্যাসিডের হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খল অসম্পৃক্ত হলে লিপিডটি

সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে—উক্ত লিপিডকে তখন বলা হয় তেল (oil)। আর লিপিডের ফ্যাটী অ্যাসিড অংশটি যদি সম্পৃক্ত (saturated) হয় তাহলে ওটি সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থাতে থাকে—একে বলা হয় চর্বি (fat)। চর্বি এবং তেল উভয়েই প্রথম শ্রেণীর লিপিড (neutral lipids)। চিত্র ৭-৫-এ কয়েকটি ফ্যাটী অ্যাসিডের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

স্নেহপদার্থ ঘনীভূত খাদ্যের উৎস (concentrated food source), কেননা কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিনের এক গ্রাম যত ক্যালোরি শক্তি দেয় এক গ্রাম স্নেহ পদার্থ দেয় তার দ্বিগুণেরও বেশী শক্তি। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট অংশ থেকে প্রাপ্ত কার্বন-কাঠামো থেকে কোষ, সব না পারলেও, বেশীর ভাগ ফ্যাটী অ্যাসিডই তৈরী করে নিতে পারে। যে কটি ফ্যাটী অ্যাসিড কোষ সংশ্লেষিত করতে পারে না খাদ্যের সাথে অবশ্যই তাদের গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, তারা অপরিহার্য বা **অত্যাবশ্যক স্নেহজ অম্ল** (essential fatty acids)। অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড খুবই সামান্য পরিমাণে দরকার হয় এবং যেটুকু দরকার হয় তা প্রায় যে কোন খাদ্যই (diet) যোগাতে পারে। যে সমস্ত জটিল স্নেহপদার্থ কোষ সংশ্লেষিত করে তা যে কেবল শক্তির উৎস হিসেবেই দরকার তাই নয়, কোষের গঠনমূলক উপাদান (structural components) তৈরীর জন্যও এদের দরকার। বিশেষ করে কোষীয় পর্দা এবং আরো অন্যান্য অতিআণুবীক্ষণিক পদার্থ (submicroscopic particles) যাদের পর্দা (membrane) আছে তাদেরও গঠনে স্নেহপদার্থ বা লিপিডের (fat or lipid structure) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দেহযন্ত্রের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ষাপ্রদ আবরণী নির্মাণে লিপিডের ভূমিকা রয়েছে—এছাড়া লিপিডের আবরণী কোষে তাপ ও বিদ্যুতের অন্তরক (insulator) রূপে কাজ করে। আর মজুদ খাদ্যরূপে জীবদেহে বা উদ্ভিদের ফল এবং বীজে লিপিড সঞ্চিত থাকতে পারে।

অনেক স্নেহ পদার্থ (স্নেহাক্ত তৈল, যেমন অলিভ অয়েল, কড লিভার অয়েল, ইত্যাদি) হল এক একটি ট্রাইগ্লিসেরাইডের মিশ্রণ (a mixture of triglycerides)—ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলের একপ্রকার যৌগকে বলে ট্রাইগ্লিসেরাইড। ৭-৬ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বোক্সিল মূলক (–COOH) গ্লিসেরলের হাইড্রোক্সিল মূলক (–OH)-এর সাথে

বিক্রিয়া করে গঠন করে ট্রাইগ্লিসেরাইড। ৭-৬ নং চিত্রের R^1, R^2, R^3 মূলক বিশিষ্ট যৌগ ত্রয় একটি অভিন্ন দীর্ঘ শৃংখল ফ্যাটি অ্যাসিডও হতে পারে (যেমন স্টিয়ারিক অ্যাসিড ট্রাইস্টিয়ারিন এই ট্রাইগ্লিসেরাইডটি তৈরী করে) আবার বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডও হতে পারে।

$$CH_2OH-CHOH-H_2C-O-PO(OH)_2 + R_1CO-SCoA + R_2CO-SCoA \longrightarrow H_2C(-O-CO-R_1)-HC(-O-CO-R_2)-H_2C-O-PO(OH)_2 + 2CoASH$$

গ্লিসেরোফসফোরিক অ্যাসিড → ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড

$$\downarrow -H_3PO_4$$

$$H_2C(-O-CO-R_1)-HC(-O-CO-R_2)-HCOH(H) + R_3CO-SCoA \longrightarrow H_2C(-O-CO-R_1)-HC(-O-CO-R_2)-H_2C(-O-CO-R_3)$$

১,২-ডাইগ্লিসেরাইড → ট্রাইগ্লিসেরাইড
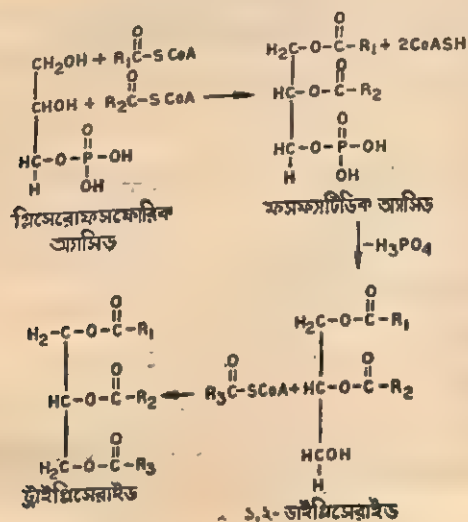
চিত্র ৭-৬ঃ

ট্রাইগ্লিসেরাইডের সংশ্লেষণ

ট্রাইগ্লিসেরাইডের সংশ্লেষণ মুখ্যতঃ সংঘটিত হয় যকৃতে এবং অ্যাডিপোজ কলায় (adipose tissue)। গ্লিসারো ফসফোরিক অ্যাসিড বা ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট প্রথমে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং কোএনজাইম-এ সঞ্জাত যৌগ 'R – CO – SCoA'-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরী করে ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড (phosphatidic acid)। এই বিক্রিয়াটি বেশ দ্রুতবেগে সংঘটিত হয় যখন ষোল কার্বন এবং আঠারো কার্বন বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিডের কো-এনজাইম-এ বিক্রিয়া করে। একটি সুনির্দিষ্ট ফসফেটেজ (phosphatase) এনজাইমের উপস্থিতিতে ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড ফসফেট বিমোচন করে উৎপন্ন করে ১, ২-ডাইগ্লিসারাইড (1, 2-liglyceride)–এটি আরেকটি ফ্যাটি অ্যাসিড-কোএনজাইম-এ'র সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরী করে প্রথম ট্রাইগ্লিসারাইড।

মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড নিম্নোক্ত বিক্রিয়াম্বয়ের মাধ্যমে কোএনজাইম-এ সঞ্জাত যৌগে (R – CO – SCoA) পরিণত হয়—এই বিক্রিয়াক্রমটি অনুঘটিত করে একটি একক এনজাইম। প্রথমে ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বোক্সিল মূলকটি ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে উদ্দীপিত হয় এবং তৈরী করে অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড (AMP) সঞ্জাত যৌগ। শেষোক্ত যৌগটি দ্বিতীয় ধাপে কোএনজাইম-এ'র —SH মূলকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে উদ্দিষ্ট থায়োল অ্যাসাইল অন্তর্বর্তী যৌগটি (thiolacyl intermediate) গঠন করে :

$$\text{(i)}\quad R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OH+ATP \rightleftharpoons R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-AMP+PP$$

(অজৈব পাইরোফসফেট)

$$\text{(ii)}\quad R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-AMP+CoASH \rightleftharpoons R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-S-CoA+AMP$$
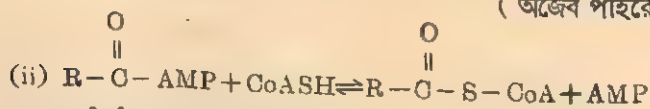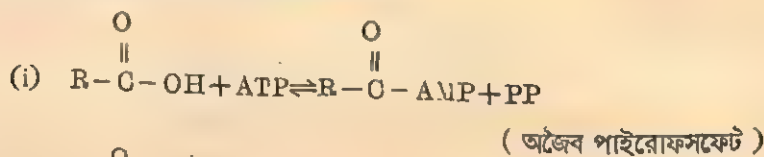
সাধারণ লিপিডের সাথে মোম (wax) এবং মোম জাতীয় যৌগের পার্থক্য এইখানে যে এইসকল যৌগে গ্লিসেরলের পরিবর্তে থাকে দীর্ঘ শৃঙ্খল অ্যালকোহল (longer chain alcohol)। উদাহরণস্বরূপ, মৌচাকের মোম (Bees wax) হচ্ছে পামিটিক অ্যাসিড (palmitic acid, একটি ফ্যাটী অ্যাসিড) এবং মাইরিসাইল অ্যালকোহল (myricyl alcohol)-এর একটি এস্টার।

$$\begin{array}{l} CH_2COOR_1 \\ | \\ CHCOOR_2 \\ | \qquad \overset{\displaystyle O}{\|} \\ CH_2O-\underset{\underset{\displaystyle OH}{|}}{P}-O-CH_2-CH_2-N(CH_3)_3 \end{array}$$

R_1, R_2=বিভিন্ন হাইড্রো কার্বন শৃঙ্খল
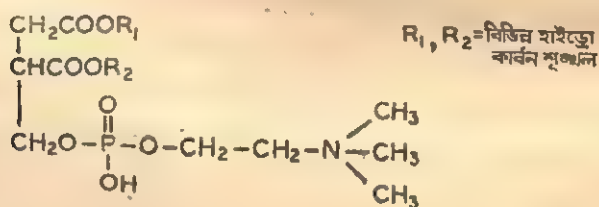
লেসিথিন (Lecithin), একটি ফসফো লিপিড

চিত্র ৭-৭

পামিটিক অ্যাসিড ষোল কার্বন সদস্য বিশিষ্ট এবং মাইরিসাইল অ্যালকোহল ত্রিশ কার্বন সদস্য বিশিষ্ট যৌগ (উভয়েই সম্পৃক্ত)। উদ্ভিদ এবং প্রাণিকলার বহিপৃষ্ঠ জল-অভেদ্য (water-proof) করে এই মোম জাতীয় যৌগ সমূহ (waxes)। সরল লিপিডের একটি ফ্যাটী অ্যাসিড ফসফরাস

এবং নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে ফসফেটাইড যৌগ (phosphatides), লেসিথিন (lecithin) এবং সেফালিন (cephalin) গঠন করা যেতে পারে। এদের ফসফোলিপিড (phospholipids)-ও বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোষীয় লিপিডের একটা বড়ো অংশ হচ্ছে এই সকল যৌগ। এরা জল এবং স্নেহপদার্থ উভয় জাতীয় দ্রাবকেই দ্রাব্য হওয়ার দরুণ জলে দ্রবণীয় পদার্থ (যেমন প্রোটিন) এবং লিপিডে দ্রবণীয় যৌগসকল একত্রে যুক্ত করে কোষে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। লেসিথিন কোষ পর্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক পদার্থ, কেননা এটি কোষের ভিতর ও বাইরেকার জলীয় ও লিপিড দশার মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) বজায় রাখতে পারে। এছাড়াও আমরা জানি, কতকগুলি এনজাইমের কার্য-কারিতা নির্ভর করে এনজাইমটি কোনো লিপিডের (যেমন লেসিথিন) সাথে যুক্ত হতে পারছে কিনা তার উপর। অনেক কোষীয় পর্দায় আরেক শ্রেণীর লিপিড দেখা যায়, যাদের বলা হয় গ্লাইকোলিপিড (glycolipid)। এরা কার্বোহাইড্রেট সঞ্জাত লিপিড এবং প্রকৃতিতে প্রশম (neutral)।

ফ্যাটী অ্যাসিডের বিপাক (Fatty Acid Metabolism):

ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপাক অনেকগুলি সুস্পষ্ট ধাপে অগ্রসর হয় ঠিকই, কিন্তু অন্তিম বিক্রিয়াজাত পদার্থ (final product) সেই একই যৌগ, সক্রিয় অ্যাসেটিক অ্যাসিড একক, 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ'। তারপর ফ্যাটি অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড যেমন করে সেইভাবে এই দুই-কার্বন একক দিয়ে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের ইন্ধন যোগায়। এখন ফ্যাটি অ্যাসিড বিপাকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জারণমূলক পর্য্যায় নিয়ে আলোচনা করবো। জৈবিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাটী অ্যাসিডদের মধ্যে রয়েছে ঋজু শৃংখল অ্যাসিডের একটি দীর্ঘ শ্রেণী—ফরমিক অ্যাসিড দিয়ে যার শুরু আর অ্যাসেটিক অ্যাসিড হয়ে কুড়ি কার্বনেরও বেশী সদস্য বিশিষ্ট যৌগ পর্যন্ত যার বিস্তার। বেশ মজার ব্যাপার এই যে, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সমূহের অধিকাংশেরই কার্বনসংখ্যা যুগ্ম ; অর্থাৎ অধিকাংশই জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু দিয়ে গঠিত।

চার কার্বন সদস্য বিশিষ্ট বিউটিরিক অ্যাসিডের সাহায্যে এখন ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়া পর্যালোচনা করা যাক। ফ্যাটী অ্যাসিডের জারণ সম্পর্কে আবিষ্কৃত প্রথম তথ্যটি হল ঃ এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল এনজাইম এবং কোফ্যাক্টরই রয়েছে মাইটোকনড্রিয়ায়। দ্বিতীয় কথা হল, ফ্যাটী অ্যাসিডের জারণ শুরু করবার জন্য সামান্য পরিমাণ এটিপির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। পরবর্তী গবেষণা থেকে জানা গেছে ফ্যাটি অ্যাসিডের কোএনজাইম-এ সঞ্জাত যৌগ (derivative) গঠনের জন্য এটিপি (ATP) দ্বারা এই সক্রিয়করণ দরকার। ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বোক্সিল মূলক এটিপির সাথে বিক্রিয়া করে একটি শক্তি সমৃদ্ধ অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড সঞ্জাত যৌগ গঠন করে। এই অন্তর্বর্তী যৌগটি (intermediate) অতঃপর 'কোএনজাইম-এ'র সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে ফ্যাটি অ্যাসিডের 'কোএনজাইম-এ' সঞ্জাত যৌগ।

৭-৮ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে এই কোএনজাইম-এ (CoA) সঞ্জাত

$CH_3CH_2CH_2COOH$ বিউটিরিক অ্যাসিড
$+ATP$
⇅
$CH_3CH_2CH_2C(=O)-O\sim AMP + PP$ (পাইরোফসফেট)
বিউটিরাইল অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড
⇅ $+CoASH$
$CH_3CH_2CH_2C(=O)-S-CoA + AMP$
বিউটিরাইল CoA
⇅ $FAD \rightarrow FADH_2$ বিটা জারণ
$CH_3-CH=CH-C(=O)-S-CoA$ ক্রোটোনাইল CoA
⇅ $+H_2O$
$CH_3CHOHCH_2-C(=O)-S-CoA$ বিটা-হাইড্রোক্সিবিউটিরাইল CoA
⇅ $DPN^+ \rightarrow DPNH + H^+$
$CH_3C(=O)-CH_2C(=O)-S-CoA$ অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল CoA
⇅ $+CoASH$
$2CH_3C(=O)-S-CoA$ অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ
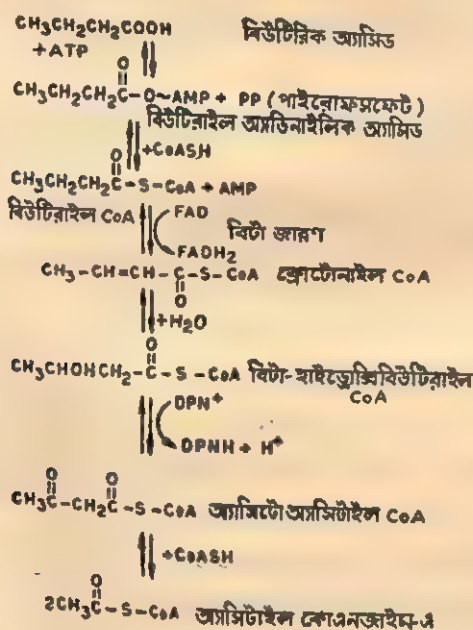
চিত্র ৭-৮
ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়া।

যৌগটি (এখানে বিউটিরাইল-কোএনজাইম-এ) দুই ও তিন নম্বর কার্বনের মধ্যে জারিত হয়ে একটি দ্বিযোজক (double bond) গঠন করে; এই প্রক্রিয়াকে বলে **বিটা-জারণ** (β-oxidation)। এই জারণ প্রক্রিয়াটিতে ইলেকট্রণ-গ্রাহকের (অর্থাৎ জারকের) কাজ করে সাধারণতঃ ফ্লেবিন (flavin)। এবার দ্বিযোজক বরাবর জলের অণু যুক্ত হয়ে বিটা কার্বনে হাইড্রোক্সিল মূলক উৎপন্ন করে—প্রক্রিয়াটি ফিউমারিক অ্যাসিডের উদ্‌যোজনের (হাইড্রেশন) ফলে ম্যালিক অ্যাসিড গঠনের অনুরূপ। পরবর্তী জারণ ক্রিয়ায় তিন নম্বর কার্বনে একটি দ্বিযোজী অক্সিজেন গঠিত হয় (অর্থাৎ >CH·OH মূলক জারিত হয় >C=O মূলকে)। এটি কোএনজাইম-এ'র সাথে বিক্রিয়া করে দু'টি অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ এককে বিভক্ত হতে পারে। (বিটা জারণের মাধ্যমে ফ্যাটি অ্যাসিড বিভঞ্জনে 'কোএনজাইম-এ'র চক্রক্রম ব্যবহার সম্ভবতঃ যে কোন শৃঙ্খল দৈর্ঘ্যের ফ্যাটি অ্যাসিড বিপাকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। সুতরাং, আমরা যদি জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু-বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে শুরু করি তবে তার ঠিক অর্দ্ধ সংখ্যক 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ' একক উৎপন্ন হবে। এইরূপে একটি দশ-কার্বন (C_{10}) ফ্যাটি অ্যাসিড পর্য্যায় ক্রমে উৎপন্ন করবে:

$$\begin{array}{ccccccccc} C_{10}CoA & \longrightarrow & C_8CoA & \longrightarrow & C_6CoA & \longrightarrow & C_4CoA & \longrightarrow & 2C_2CoA \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ C_2CoA & & & & C_2CoA & & C_2CoA & & \end{array}$$
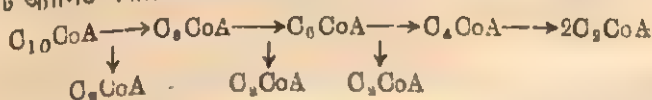
প্রত্যেক ধাপে একটি করে ও শেষ ধাপে দুটি C_2CoA উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ মোট পাঁচটি 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ' একক (C_2CoA) উৎপন্ন হবে।

বেজোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপাকে কিন্তু কয়েকটি বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। আমরা যদি নয় কার্বন (C_9) বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে শুরু করি তবে যতক্ষণ না C_3CoA (প্রোপানোয়িল কোএনজাইম-এ) উৎপন্ন হচ্ছে ততক্ষণ বিক্রিয়ার ধাপগুলি একই প্রকারের মনে হবে ($C_9 \rightarrow C_7 \rightarrow C_5 \rightarrow C_3$)। কিন্তু, সাম্প্রতিক তথ্যাদি থেকে একথা প্রতীয়মান যে প্রোপানোয়িক অ্যাসিডের এই সক্রিয় যৌগটির বিপাকক্রিয়া পুনরায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ওটি অবশ্যই কার্বন ডাই অক্সাইড অধিগ্রহণ করে সাকসিনিক অ্যাসিড (জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট) গঠন করবে। কার্বন ডাই

অক্সাইডের এই স্থিতায়ণ (fixation) প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল প্রকৃতির এবং এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি বোধগম্য নয়। ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণে যদিও সক্রিয় C_2-একক (অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ) ব্যবহৃত হয় তাহলেও এর বিক্রিয়া পথ কিন্তু ৭-৮ নং চিত্রে বর্ণিত প্রণালীর ঠিক বিপরীত নয়।

লক্ষ্য করা যেতে পারে, বিউটিরিক অ্যাসিডের জারণে দুই একক 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ' উৎপন্ন হয়,—এরা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করে উৎপন্ন করে চব্বিশ অণু এটিপি। এ ছাড়াও, প্রাথমিক জারণ মূলক বিক্রিয়া সমূহে (যে বিক্রিয়াগুলি অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ উৎপন্ন করে) আরো পাঁচ অণু এটিপি সৃষ্ট হয়। অতএব, একথা এখন নিশ্চয়ই পরিষ্কার হল যে ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণে তুল্য পরিমাণ কার্বোহাইড্রেটের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে।

অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাক ক্রিয়া (Amino Acid Metabolism) :

জীবের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের মূলে আছে প্রোটিন। প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত ; এবং এই অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুতির পার্থক্যই, অংশতঃ, প্রোটিনকে কতকগুলি অসামান্য গুণের অধিকারী করে তোলে। অতএব, স্পষ্টতঃই, খাদ্য থেকে অথবা জৈব সংশ্লেষণী বিক্রিয়া থেকে কোষ ও দেহকলায় অ্যামিনো অ্যাসিডের সরবরাহ প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। 'অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি' খাদ্য থেকে পাওয়া গেলে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাদবাকি নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়ার লবণ রূপে সরবরাহ করা যেতে পারে। নাইট্রোজেন বিপাকক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া একটি অন্তর্বর্তী যৌগ ; এবং অধিকাংশ জীবই তাদের উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য কার্বন যৌগ এবং বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অত্যাবশক মৌল সমূহ পেলে সহজেই অ্যামোনিয়াকে প্রোটিন-নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস রূপে কাজে লাগাতে পারে। অ্যামোনিয়ার অধিগ্রহণ এবং প্রোটিনের উপাদানে পরিণত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়ায় সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের একটি অন্তর্বর্তী যৌগ অংশ নেয়। ৭-৯ নং চিত্রে বর্ণিত মতে আলফা-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড গ্লুটামিক অ্যাসিডে (একটি অ্যামিনো অ্যাসিড) রূপান্তরিত হতে পারে **বিজারণ মূলক অ্যামিনেশন** (reductive amination) প্রক্রিয়ায়—এই প্রক্রিয়ায় বিজারক হল

টিপিএনএইচ এবং নাইট্রোজেনের উৎস অ্যামোনিয়া। বিক্রিয়াটি উভমুখী (reversible) এবং বস্তুতঃ, যে এনজাইমটি বিক্রিয়াটিতে অনুঘটক রূপে কাজ

$$\begin{matrix} COOH \\ | \\ CH_2 \\ | \\ CH_2 \\ | \\ C=O \\ | \\ COOH \end{matrix} + TPNH + NH_3 \rightleftharpoons \begin{matrix} COOH \\ | \\ CH_2 \\ | \\ CH_2 \\ | \\ HC-NH_2 \\ | \\ COOH \end{matrix} + TPN + H_2O$$

α-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড — গ্লুটামিক অ্যাসিড

চিত্র ৭-৯ :

গ্লুটামিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ : বিজারণ মূলক অ্যামিনেশন

করে তাকে বলা হয় গ্লুটামিক ডিহাইড্রোজেনেজ। একথা স্পষ্ট যে, এই বিক্রিয়াটিই অ্যামিনো অ্যাসিড এবং কার্বোহাইড্রেট বিপাকক্রিয়ার মধ্যে প্রধান যোগসূত্র রূপে কাজ করছে।

অ্যামোনিয়া একবার অ্যামিনো নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়ে গেলে ওকে অন্যান্য কার্বন কাঠামোতে স্থানান্তরিত করে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড গঠন করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **ট্রান্সঅ্যামিনেশন** (transamination) এবং এই প্রক্রিয়ায় একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ও একটি কিটো অ্যাসিড অংশ নেয়

$$\begin{matrix} COOH \\ | \\ CH_2 \\ | \\ CH_2 \\ | \\ HC-NH_2 \\ | \\ COOH \end{matrix} + \begin{matrix} COOH \\ | \\ CH_2 \\ | \\ C=O \\ | \\ COOH \end{matrix} \underset{\text{ফসফেট}}{\overset{\text{পাইরিডক্সাল}}{\rightleftharpoons}} \begin{matrix} COOH \\ | \\ CH_2 \\ | \\ CH_2 \\ | \\ C=O \\ | \\ COOH \end{matrix} + \begin{matrix} COOH \\ | \\ CH_2 \\ | \\ HC-NH_2 \\ | \\ COOH \end{matrix}$$

গ্লুটামিক অ্যাসিড — অক্সালো অ্যাসেটিক অ্যাসিড — α-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড — অ্যাসপারটিক অ্যাসিড

(পাইরিডিন বলয়: H–C=O, HO, CH_3, N, $CH_2O-P(=O)(OH)-OH$)
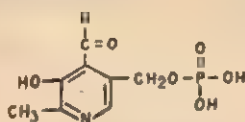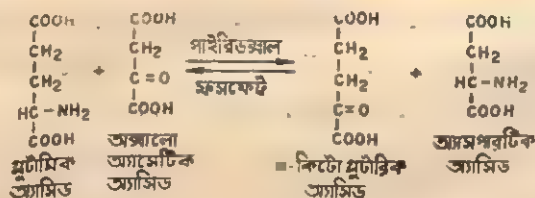
পাইরিডক্সাল ফসফেট

চিত্র ৭-১০ :

ট্রান্স অ্যামিনেশন

(চিত্র ৭-১০ দ্রষ্টব্য)। বিক্রিয়াটি যেহেতু উভমুখী (reversible) অতএব ওটি অ্যামিনো অ্যাসিড গঠন ও তার অ্যামিনোত্যজনের (deamination) একটি

মুখ্য বিপাকীয় ক্রিয়াপথ (principal metabolic pathways) রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এই ট্রান্সঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়া অনুঘটিত করে যে এনজাইম-গোষ্ঠী তাদের বলা হয় 'ট্রান্সঅ্যামিনেজ' (transaminases); বিভিন্ন প্রাণিকলা (animal tissue)-য়, উদ্ভিদে এবং জীবাণুতে (microorganisms) এই ট্রান্সঅ্যামিনেজ এনজাইম পাওয়া যায়। বি-ভিটামিন পাইরিডক্সিন (pyridoxine) পাইরিডক্সাল ফসফেট রূপে সকল ট্রান্সঅ্যামিনেজ এনজাইমের একটি অপরিহার্য কোফ্যাক্টর (essential cofactor) রূপে কাজ করে। অতএব, সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের দুটো অন্তর্বর্তী যৌগ দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরীর জন্য কার্বন কাঠামো রূপে কাজ করে। যতদূর জানা গেছে, বিজারণ-মূলক অ্যামিনেশন এবং ট্রান্সঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়াদ্বয় কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটি অ্যাসিড বিপাক ক্রিয়ায় গঠিত বহু কার্বন কাঠামোতে অ্যামিনো মূলকের অন্তর্ভুক্তি (incorporation) ঘটাতে পারে। কীভাবে বিশেষ কার্বন কাঠামোগুলি গঠিত হচ্ছে এখন তাহলে এটাই হল জীবকোষে অ্যামিনো অ্যাসিড সংশ্লেষণের (biosynthesis) মূল সমস্যা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের অন্তর্বর্তী যৌগসমূহই অ্যামিনো অ্যাসিড গঠনের প্রারম্ভিক পদার্থ।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের সাথে অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাক ক্রিয়ার সম্পর্ক নিম্নে বর্ণিত বিক্রিয়া শ্রেণীতে (চিত্র ৭-১১) সুস্পষ্ট রূপে দেখানো হয়েছে। এই বিক্রিয়া শ্রেণীতে উৎপন্ন হয় অ্যামিনো অ্যাসিড আর্জিনিন (arginine) এবং মানুষের (মূল নাইট্রোজেন ঘটিত) রেচনক্রিয়া জাত পদার্থ ইউরিয়া। প্রাণীকে অধিক পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড খাওয়ালে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের অধিকাংশই রেচনক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়ারূপে বর্জিত হয়। ইউরিয়া কীরূপে সংশ্লেষিত হয় সে পদ্ধতির রহস্যোদ্ঘাটন, বলা যেতে পারে, জীব রসায়ন বিদ্যার চক্রাবর্ত প্রক্রিয়াসমূহ বুঝবার পথে আরেকটি বিরাট প্রস্তর ফলক। নিম্নে বর্ণিতমতে **অর্ণিথিন** চক্র (ornithine cycle) অ্যামোনিয়াম আয়নের অপসারণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর কাজ করা নির্ভর করে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের যুগপৎ উপস্থিতির উপর। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইউরিয়া সংশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য চারটি যৌগ অত্যাবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এরা হল: এটিপি, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড।

৭-১১ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে বিজারণ ও ট্রান্সঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুটামিক অ্যাসিড অর্ণিথিনে (ornithine-এ) রূপান্তরিত হতে পারে।

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাকের সম্পর্ক ইউরিয়া ও আর্জিনিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে
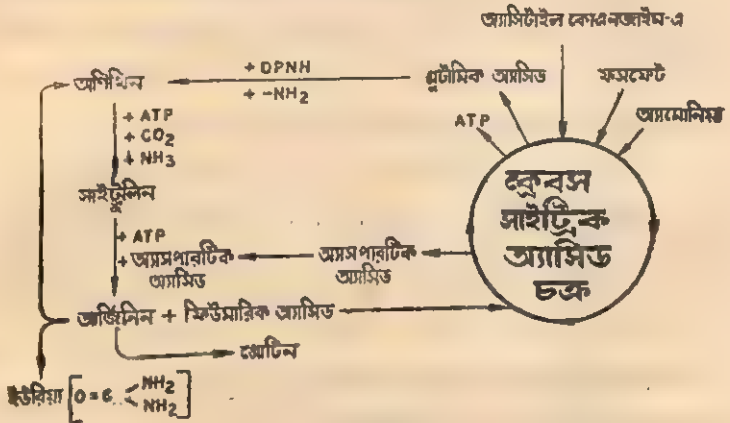
চিত্র ৭-১১ ঃ

সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাকের পারস্পরিক সম্পর্ক ইউরিয়া ও আর্জিনিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড, এটিপি এবং অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিতে অর্ণিথিন কার্বোক্সিলঅ্যামিন (NH_2. COOH)-যোজনের ফলে সাইট্রুলিনে (citrulline) রূপান্তরিত হয়; এটিপি এবং যথোপযুক্ত এনজাইমের উপস্থিতিতে এই NH_2 COOH যৌগটি গঠিত হয় কার্বন ডাই অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া থেকে। কতৃতঃপক্ষে, প্রকৃত অন্তর্বর্তী যৌগটি হল কার্ব্যামিল ফসফেট ঃ

$$CO_2 + NH_3 + ATP \rightarrow NH_2.COO{\sim}\overset{\displaystyle O \atop \displaystyle \|}{P}\begin{matrix} \diagup OH \\ \diagdown OH \end{matrix} + ADP$$
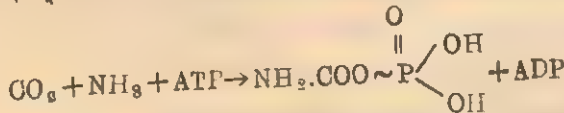
অ্যাসপারটিক অ্যাসিড সাইট্রুলিনে একটি অ্যামিনো ($-NH_2$) মূলক যুক্ত করে—ফলে উৎপন্ন হয় অ্যামিনো অ্যাসিড আর্জিনিন। যকৃত (liver)-এ আর্জিনিন প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত না হলে এনজাইম আর্জিনেজের (Arginase) সাহায্যে ভেঙ্গে যায় এবং উৎপন্ন করে ইউরিয়া ও অর্ণিথিন।

সুতরাং, অর্ণিথিন বা ইউরিয়া চক্র ইউরিয়া রূপে দুটি নাইট্রোজেন পরমাণু বর্জন করে (excretes)। এবং উপরিউক্ত বিক্রিয়াক্রম থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অ্যাসপারটিক ও গ্লুটামিক অ্যাসিডদ্বয় সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত অন্তর্বর্তী কার্বন কাঠামোসমূহ এবং ATP সরবরাহের জন্য সামগ্রিক ভাবে প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের উপর।

অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংশ্লেষণ ও বিভঞ্জন প্রক্রিয়ার মূল পদ্ধতি খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার ; কিন্তু সে সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড এবং আর্জিনিনের সংশ্লেষণ ও বিভঞ্জন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে ছক বর্ণিত হয়েছে তা অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও খাটে।

কার্বোহাইড্রেট বিপাকের বিকল্প প্রণালীসমূহ—পেণ্টোজ সাণ্ট (Alternate Pathways of Carbohydrate Metabolism—Pantose Shunt) :

গ্লুকোজ বিপাকের মূল পদ্ধতি দুটো—গ্লাইকোলিসিস ও সন্ধানক্রিয়া। কার্বোহাইড্রেট থেকে অধিকাংশ পাইরুভিক অ্যাসিডের উৎপত্তি সাধারণতঃ এই প্রক্রিয়া দুটোতেই সম্পন্ন হয়। যাহোক, এছাড়াও আরো বহু বিকল্প প্রণালী আছে কার্বোহাইড্রেট বিপাকের ; এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল জারণ মূলক পেণ্টোজ ফসফেট সাণ্ট (oxidative pentose phosphate shunt)। এই প্রণালীটির একটি বিশেষ সুবিধে হল এই যে এক্ষেত্রে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের কোন রকম অংশগ্রহণ ছাড়াই গ্লুকোজের কার্বন ডাই-অক্সাইডে দহন সম্ভব। পেণ্টোজ সাণ্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী যৌগ হ'ল রাইবুলোজ-৫ ফসফেট যা থেকে উৎপন্ন হয় পাঁচ কার্বন সদস্য বিশিষ্ট শর্করা রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ—এই শর্করাদ্বয় নিউক্লিক অ্যাসিড এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিওটাইড যেমন ATP, NAD (নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাই নিউক্লিওটাইড), FAD (ফ্লেবিন অ্যাডিনিন ডাই নিউক্লিওটাইড), অন্যান্য কোএনজাইম ও বিভিন্ন কোষীয় যৌগের উপাদান।

সালোকসংশ্লেষীয় জীবের (photosynthetic organisms) কার্বন ডাই-

অক্সাইড অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও কার্বোহাইড্রেট বিপাকের এই প্রণালীটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত।

জারণমূলক প্রণালীতে গ্লুকোজ বিপাকের প্রথম ধাপটি শুরু হয় গ্লুকোজ ৬-ফসফেট দিয়ে ; এই ধাপটি সন্ধান ক্রিয়ামূলক বিক্রিয়া পথের (fermentative pathway) যে কোন ধাপের থেকেই ভিন্ন। ৭-১২ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট জারিত হয়ে গঠন করে ৬-ফসফোগ্লুকোনিক অ্যাসিড। এক্ষেত্রে ডিপিএনের পরিবর্তে ইলেকট্রণ গ্রাহকের (জারকের) কাজ করে টিপিএন

গ্লুকোজ-৬-ফসফেট → ৬-ফসফোগ্লুকোনিক অ্যাসিড → ৬-ফসফো-৩-কিটো গ্লুকোনিক অ্যাসিড → ($-CO_2$) রাইবুলোজ-৫-ফসফেট → রাইবোজ-৫-ফসফেট

রাইবুলোজ-৫-ফসফেট → (+ATP) রাইবুলোজ-১, ৫-ডাইফসফেট → ($+CO_2$, $+H_2O$) ৩-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড
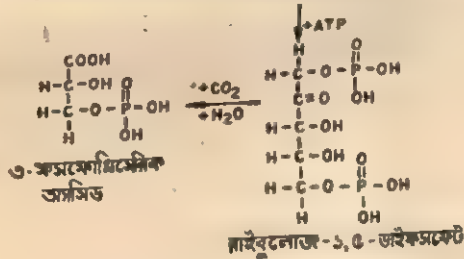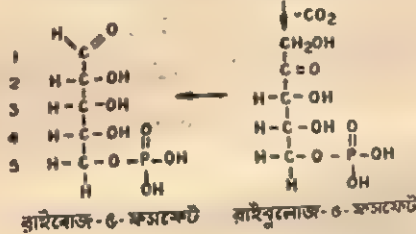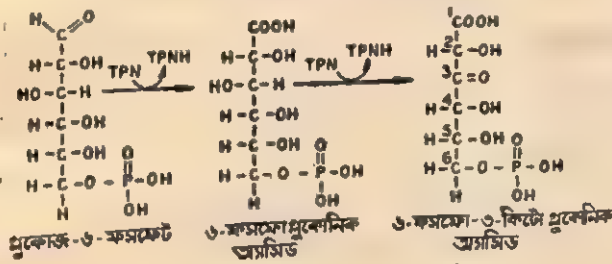
চিত্র-৭-১২ :

গ্লুকোজ মনোফসফেটের জারণ

(TPN)। প্রারম্ভিক জারণের পর ৬-ফসফোগ্লুকোনিক অ্যাসিড টিপিএন দ্বারা জারিত হয়ে উৎপন্ন করে একটি অন্তর্বর্তী যৌগ (৭-১২নং চিত্র দ্রষ্টব্য) ;

একাধিক 'অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ' এককে এবং ক্রেব্‌স্‌ চক্রে অংশ নেয় (চিত্র ৭-১৩)।

প্রোটিন কোষের গঠন এবং জৈবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এইজন্য স্নেহপদার্থের সঞ্চয়ও ফুরিয়ে এলেই কেবলমাত্র তখন প্রোটিন কোষীয় শক্তির শেষ অবলম্বনরূপে কাজ করে (ব্যতিক্রম হল সেই ধরণের প্রাণী যারা খাদ্যে অত্যধিক প্রোটিন গ্রহণ করে)। প্রোটিন প্রথমে উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলোতে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে যায়। অ্যামিনো অ্যাসিড তখন অ্যামোনিয়া

চিত্র ৭-১৩ : কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন বিপাকের সারসংক্ষেপ

বিমোচন (deamination) করে উৎপন্ন করে কিটো-অ্যাসিড। অ্যামোনিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিয়া বা মুক্ত অ্যামোনিয়া রূপে কোষ থেকে নির্গত হয়। আর কিটো-অ্যাসিড মোটামুটি তিন রকমের হয়—পাইরুভিক অ্যাসিড,

এটি হচ্ছে ৬-ফসফো-৩-কিটোগ্লুকোনিক অ্যাসিড। এই অন্তর্বর্তী যৌগটি দ্রুত কার্বন ডাই অক্সাইড বিমোচন করে (decarboxylation) গঠন করে রাইবুলোজ-৫-ফসফেট (Ribulose-5-phosphate)। এনজাইম আইসোমারেজের (Isomerase) সাহায্যে রাইবুলোজ-৫-ফসফেট সহজেই রাইবোজ-৫-ফসফেটে রূপান্তরিত হতে পারে।

সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রাথমিক গ্রাহক (primary acceptor) রূপে কাজ করে রাইবুলোজ-১,৫-ডাই ফসফেট। এই যৌগটি রাইবুলোজ-৫-ফসফেট এবং এটিপি থেকে গঠিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার ঃ

কোষীয় শক্তির মূল উৎস হোল তিন শ্রেণীর যৌগ—কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ-পদার্থ এবং প্রোটিন।

স্নেহপদার্থ এবং প্রোটিন কখনও কখনও শক্তির উৎসরূপে কাজ করলেও, স্বাভাবিক অবস্থায় অধিকাংশ কোষই কার্বোহাইড্রেট-জারণ থেকেই শক্তির মূল যোগান পেয়ে থাকে। বেশীর ভাগ কোষেই গ্লুকোজ পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি-সমূহে জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। কোষে পলিস্যাকারাইড (polysa-ccharides), রূপে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট মূল বিপাকক্রিয়ায় প্রবেশের পূর্বে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে এক-শর্করা (monosaccharides) অণু গঠন করে নেয়। যেমন, যকৃত কোষ এবং পেশীকোষের মত প্রাণিকোষে (animal cells) সঞ্চিত গ্লাইকোজেন উপস্থিত এনজাইম গোষ্ঠীর সাহায্যে ভেঙ্গে গিয়ে গ্লুকোজ এককগুলি উৎপন্ন করে এবং রূপান্তরিত হয় গ্লুকোজ-৬-ফসফেটে—শেষোক্ত যৌগটি মূল বিপাকক্রিয়ায় অংশ নেয়।

কোন কারণে গ্লুকোজের সরবরাহ কম থাকলেই স্নেহপদার্থ কোষে শক্তির মূল যোগানদার রূপে কাজ করে। অনাহার, বহুমূত্র (diabetes) জাতীয় রোগ বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য এই অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। কোষীয় বিপাকক্রিয়ায় প্রবেশের মুখে স্নেহপদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরলে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে যায়। গ্লিসেরল রূপান্তরিত হয় ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে এবং গ্লিসের্যালডিহাইড-৩-ফসফেট রূপে গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। আর ফ্যাটি অ্যাসিড রূপান্তরিত হয়

কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড এবং অক্সালোঅ্যাসেটিক অ্যাসিড—এরা সকলেই যথাযথ স্থানে বিপাকক্রিয়া প্রণালীর অংশীদার। আবার কিটোঅ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিডের মতো 'অ্যাসিটাইল কো-এনজাইম-এ'তে রূপান্তরিত হয়েও ক্রেব্‌স্ চক্রে অংশ নিতে পারে (চিত্র ৭-১৩)।

পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায় থেকে একথা স্বতঃই প্রতীয়মান যে জীবে শক্তি রূপান্তর ও তৎসাহায্যে জৈবিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সমূহের গবেষণায় গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের এবং কখনও কখনও বেশ জটিল কোষীয় পদ্ধতিগুলি চালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূল 'শক্তি উৎপাদনকারী' বিক্রিয়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত সরল—এই বিক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ ইলেকট্রণ বা হাইড্রোজেন পরিবহনের দৃষ্টান্ত মাত্র। প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়া চালানোর জন্য আমরা কেবল শক্তি উৎপাদনকারী বিক্রিয়ার সাথে শক্তি শোষণকারী বিক্রিয়া জুড়ে দিই মাত্র। এই সকল যুগ্ম বিক্রিয়ার জন্য জৈব পদ্ধতি (biological systems) রাসায়নিক শক্তির যে বিশেষ রূপটি ব্যবহার করে তা এটিপির পাইরোফসফেট বণ্ডে নিহিত থাকে। ক্রেব্‌স্ (Krebs)-এর মতানুসারে, সজীব বস্তুতে শক্তি রূপান্তরের প্রথম মুখ্য পর্য্যায়টি বিপাকক্রিয়ায় উদ্ভূত মুক্ত শক্তির (free energy) ব্যয়ে এটিপি সংশ্লেষণের সাথে সাথেই শেষ হয়। এই শক্তি রূপান্তরে আমরা, মূলতঃ, কয়েকটি মৌলিক প্রক্রিয়াই দেখতে পাই ; এরা হল যথাক্রমে—জারণ, বিজারণ, উদ্‌বিমোচন (dehydration), উদ্‌যোজন (hydration), কার্বন ডাই অক্সাইড বিমোচন (decarboxylation), অ্যাসিটাইলেশন, ফসফোরাইলেশন, অ্যামিনেশন, ডিঅ্যামিনেশন এবং ট্রান্সঅ্যামিনেশন। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রকার শক্তি উৎপাদনের আগেই কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং স্নেহ-পদার্থের বিপাকক্রিয়ায় যে তিনটি মূল যৌগ উৎপন্ন হয় তারা হল : অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ, আলফা কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড এবং অক্সালো অ্যাসেটিক অ্যাসিড। কোষীয় শক্তির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী উৎপন্ন হয় সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে এদের বিভঞ্জনের ফলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সালোক সংশ্লেষ এবং অন্যান্য কয়েক প্রকারের শক্তি রূপান্তর

শক্তিমুদ্রা এটিপি—জীবন সৌরালোকের উপর নির্ভরশীল—আলোক-জৈবিক প্রক্রিয়া—আলোর স্বরূপ—আলোর দ্বৈত ব্যবহার—আলোক-তড়িদীয় প্রভাব—আণবিক গঠন এবং আলোর শোষণ—শোষণ বর্ণালী—প্রতিপ্রভা এবং অনুপ্রভা—তড়িদ্‌প্রভা ও রসায়নী প্রভা—সালোক-সংশ্লেষ—সালোক সংশ্লেষ শ্বাসক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়া—সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার তিনটি পর্য্যায়—ক্লোরোপ্লাস্ট এবং সালোক সংশ্লেষ—দৃষ্টি শক্তি—রড এবং কোন—রোডোপসিন—দৃষ্টিশক্তি ও ভিটামিন-এ—জৈবপ্রভা—স্বপ্রভ জীব—লুসিফেরিন—জৈবপ্রভা ও বিবর্তন।

সকল জীবকোষকেই তার বিশেষ বিশেষ কাজগুলি করতে হয়, আর এজন্য প্রয়োজন হয় শক্তির। তাই কোষ যন্ত্রের (cellular machinery) প্রাথমিক লক্ষ্যই হ'ল শক্তি সরবরাহ করা এমন একটি রূপে, যা ব্যবহার করে সমস্ত জৈবিক ক্রিয়াকলাপই সম্পাদন করা যায়। কোষীয় শক্তির এই ব্যবহারিক এককটি হ'ল ATP ; ATP কে বলা যায় শক্তিমুদ্রা (energy currency)। সকল কোষই বিভিন্ন উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ATP-তে রূপান্তরিত করে নেয়, পরবর্তী বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে। সৌরশক্তিই এসকল শক্তির মূল উৎস। কতিপয় জীবাণু (bacteria) রাসায়নিক সংশ্লেষণের (chemosynthesis) মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক রাসায়নিক পদার্থ থেকে শক্তি পেতে পারে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র বিশেষ ধরণের ফোটোসিন্থেটিক কোষেরাই (Photosynthetic cells) পারে সৌরশক্তি সরাসরি কাজে লাগাতে। সূর্যালোক কাজে লাগিয়ে এই অটোট্রফিক কোষেরা (autotrophic cells) বিভিন্ন শক্তি সমৃদ্ধ জৈব যৌগ গঠন করে নিলে এই সকল যৌগ বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে কোষকে প্রয়োজনীয় শক্তি ATP রূপে সরবরাহ করতে পারবে।

সবুজ উদ্ভিদকুল এই সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই অক্সাইড ও জলকে জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এমন সকল জৈব যৌগতেই রূপান্তরিত করতে পারে : আর এই সঙ্গে উৎপন্ন হয় অক্সিজেন। শুধু তাই নয়, হেটারোট্রফিক জীবেরা (heterotrophic organisms) জৈব পৃথিবীর অনবরত যে ক্ষয়ক্ষতি করে চলেছে সবুজ উদ্ভিদকুল সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সাথে সাথে তাও পূরণ করে দিচ্ছে। সুতরাং, পৃথিবীতে জীবন সর্বতোভাবেই সৌরালোকের উপর নির্ভরশীল।
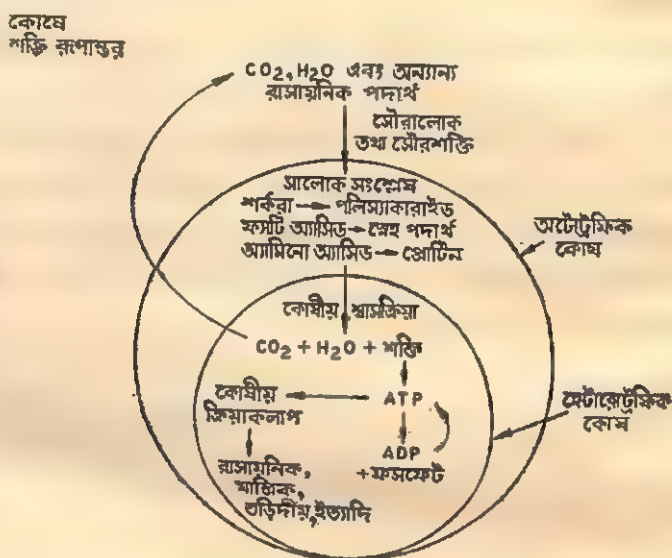
চিত্র ৮-১ : কোষে শক্তি রূপান্তর

সালোক সংশ্লেষই কিন্তু আলোর দ্বারা প্রভাবিত একমাত্র জৈবিক প্রক্রিয়া নয়। আলোর সাহায্যেই সকল প্রাণী দেখতে পায় যখন আলোকশক্তি তাদের চোখের বিশেষ কোষগুলিতে আঘাত করে। উদ্ভিদের এবং নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রাণীর আলোর দিকে অথবা আলোর বিপরীতে চলন (movement) এবং আরো অন্যান্য ছন্দোবদ্ধ জৈবিক প্রক্রিয়া সমূহ (rhythmic biological phenomena) থেকে বোঝা যায় জীবের কাজ করার ব্যাপারে আলোর কী অনন্য প্রভাব রয়েছে। এই সকল আলোক-জৈবিক (photobiological) প্রক্রিয়া আলোচনা করার পূর্বে আলোর ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

আলোর স্বরূপ ঃ

একগুচ্ছ আলোক রশ্মি (সূর্যালোক) কাচ নির্মিত প্রিজমের ভিতর দিয়ে গেলে সাতটি উপাদান বর্ণে (component colours) বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সাতটি বর্ণ হল যথাক্রমে—বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলদে, কমলা এবং লাল—'বেনীআসহকলা', ইংরেজীতে ভিবজিয়োর (VIBGYOR)। নিউটন দেখালেন এই বিচ্ছুরিত আলোকে যদি উল্টো করে বসানো দ্বিতীয় আরেকটি প্রিজমের ভিতর দিয়ে পাঠানো যায় তবে এই আলোক-সপ্তক যুক্ত হয়ে পুনরায় সাদা আলোয় (white light) রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এককভাবে বর্ণালীর (spectrum) যে কোন একটি বর্ণ বেছে নিয়ে এই পরীক্ষা চালালে তার আর কোন পরিবর্তনই হবে না; এই সরল পরীক্ষাটি থেকে নিউটন সিদ্ধান্ত করলেন সাদা আলোক সাতটি বর্ণের সমষ্টি মাত্র এবং তাকে সাতটি স্বতন্ত্র এককে বা কণিকাতে (discrete units or particles) বিভক্ত করা যায়। যাহোক, পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরীক্ষায় যখন দেখা গেল আলোকরশ্মি বেঁকতে (bend) পারে এবং একটি পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে দিলে যেমন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তেমনি আলোকরশ্মি তরঙ্গাকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে (spread) তখন আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের (wave theory)-র অনুকূলে নিউটনের কণিকা তত্ত্ব (corpuscular or particle theory) পরিত্যক্ত হল। যেহেতু আলোর ব্যবর্তন (diffraction) ঘটে (যে কারণে কোন ছায়ার ধার (edge) কখনই সুস্পষ্ট হয় না), দেখা গেল তরঙ্গতত্ত্ব আলোক বিজ্ঞানের বহু ঘটনার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ।

যাহোক, অনেক পরীক্ষা থেকে আবার একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে আলো কখনও কখনও সাধারণ বস্তুকণার মতোও ব্যবহার করে। এই সমস্ত আলোক-কণাকে (light particles), ফোটোন (photon) বা আলোর কোয়ান্টা (light quanta) রূপে বর্ণনা করা হয়। ফোটোন আবিষ্কৃত হয়েছে কঠিন বস্তুর উপর আলোর প্রভাব সম্পর্কিত পরীক্ষায়। দেখা গেছে কোন কোন ধাতব পাতে (metal plates) আলোকরশ্মি আপতিত হলে উক্ত ধাতুর পাত থেকে ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়। উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রণের গতিবেগ আপতিত আলোর প্রাখর্য (intensity) দ্বারা প্রভাবিত হয় না ঠিকই, কিন্তু, দেখা গেছে, আলোর প্রাখর্যের সাথে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়

আলোর সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদনের সেল বা আলোক-তড়িৎ কোষ (photo electric cell) এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই গঠিত। আলোক রশ্মি ধাতব পাতে আঘাত করলে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রণ একটি স্বল্পমাত্রার তড়িদ্-প্রবাহের সৃষ্টি করে। গবেষকরা বিভিন্ন বর্ণের (অর্থাৎ বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের) আলো ব্যবহার করে দেখিয়েছেন উৎপন্ন ইলেকট্রণের গতিবেগ এমন ভাবে প্রভাবিত হয় যে ইলেকট্রণের গতীয় শক্তি (kinetic energy) আপাতিত আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে ব্যস্তানুপাতে থাকে।

এই আলোক-তড়িদীয় প্রভাব (photoelectric effect) থেকে আইনস্টাইন প্রস্তাব করলেন যে আলোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটোন বা শক্তিগুচ্ছ (photon or quanta of energy) রূপে বর্তমান। ফোটোনের শক্তির উপর নির্ভর করে আলো কোন বর্ণের হবে; এবং একটি ফোটোনের সমস্ত শক্তি উৎক্ষিপ্ত একটি ইলেকট্রণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শোষিত (absorbed) হয়—ফলস্বরূপ ফোটনটির বিনাশ ঘটে। এর আগে ম্যাক্স প্ল্যাংক (Max Planck) যখন উত্তপ্ত বস্তু কর্তৃক নিঃসৃত আলোকে (বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে) শক্তির বণ্টন (energy distribution) ব্যাখ্যা করছিলেন তখন একটি মৌলিক ধ্রুবক আবিষ্কৃত হয়। এই ধ্রুবকটি আলোকের শক্তি ও কম্পাঙ্কের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে। আলোক তড়িদীয় প্রভাবের শক্তির ব্যাখ্যায়ও এই ধ্রুবকটি (h) আবশ্যক। কোন ফোটোন বা আলোকগুচ্ছের (light quanta) শক্তি (E) নিম্নলিখিত সমীকরণটি দ্বারা নির্ণয় করা যায়: $E = h\nu$; এখানে ν হচ্ছে আলোক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এবং h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (Planck's constant)। কম্পাঙ্ক কথাটি এখানে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই রাশিটিকে সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনের (vibration) সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কোন পুকুরের জলের উপরিভাগের তরঙ্গের কথা ধরা যাক। পুকুরের স্থির জলে ঢিল ছুঁড়লে আমরা দেখেছি, সংঘর্ষের স্থান থেকে চতুর্দিকে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। এইরূপে আমরা যদি পুনঃপুনঃ ঢিল ছুঁড়তে থাকি তাহলে বহুসংখ্যক তরঙ্গের সৃষ্টি হবে; আর যত তাড়াতাড়ি ঢিল ছোঁড়া হবে ঢেউয়ের চূড়াগুলি (peaks)-ও হবে ততই কাছাকাছি। দুটি তরঙ্গের চূড়াদ্বয়ের মধ্যবর্তী এই দূরত্বই হল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length)। তরঙ্গ বিস্তারের বেগ

যেহেতু অপরিবর্তিত (constant) থাকে, অতএব একথা স্পষ্ট যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে কম্পাঙ্ক হবে তত বেশী। অর্থাৎ, তরঙ্গ বিস্তারের বেগকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কম্পাঙ্কের সমান হবে। অতএব, আলোর ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি $\nu = \frac{c}{\lambda}$, c আলোর গতিবেগ (প্রতি সেকেণ্ডে ~ ৩ × ১০[১০] সেণ্টিমিটার) এবং λ সেণ্টিমিটার এককে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এখন ফোটনের শক্তি প্রকাশ করবার জন্য আমরা উপরিউক্ত সমীকরণটি ব্যবহার করতে পারি। তাহলে সম্পর্কটি দাঁড়ায়ঃ $E = h\nu = h.\frac{c}{\lambda}$। প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবকের (h) প্রকৃত মান হল ৬.৬২৪ × ১০[-২৭] আর্গ-সেকেণ্ড।

জীবরসায়ন বিদ্যায় আর্গ একক ব্যবহার না করে আমরা সাধারণতঃ পদার্থের প্রতি গ্রাম অণুতে ক্যালোরি হিসেবে শক্তির পরিমাণ প্রকাশ করে থাকি; এবং আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্যও বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হয়। বেতার তরঙ্গ (Radio waves) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মিটার বা সেণ্টিমিটার এককে প্রকাশ করা হয় এবং দৃশ্যমান আলোর (visible light) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় মিলিমাইক্রণ বা অ্যাংস্ট্রম একক (Angstrom unit)। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক হল ঃ এক মিটার = ১০[৬] মাইক্রণ (বা মাইক্রোমিটার) = ১০[৯] মিলি মাইক্রণ (বা ন্যানোমিটার); এবং এক অ্যাংস্ট্রম = ১০[-৮] সেণ্টিমিটার, সুতরাং এক অ্যাংস্ট্রম হচ্ছে ১০[-১] মিলিমাইক্রণের সমান। আলোকের শক্তি ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত উপরিউক্ত সমীকরণটিকে যথোপযুক্ত ধ্রুবক দ্বারা গুণ করে আমরা এখন নিম্নরূপে লিখতে পারি ঃ

$$E = \frac{\text{২.৮৬} \times \text{১০}^{\text{৭}} \text{ ক্যালোরি প্রতি গ্রাম অণুতে}}{\text{তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (মিলিমাইক্রণ এককে)}}$$

এক গ্রাম-অণু (one mole) পরিমাণ পদার্থ ৬.০২৩ × ১০[২৩] টি অণুর সমতুল; অতএব আলোক-রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক (photochemical equivalent) হ'ল ৬.০২৩ × ১০[২৩] টি ফোটোন। এই মতবাদের ভিত্তিতে শক্তি গণনা করে সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেমন করা হয় সেইরূপে আলোর ক্ষেত্রেও শক্তির পরিমাণ 'ক্যালোরি প্রতি গ্রাম অণুতে' (calories per mole) এই এককে প্রকাশ করা যায়। তাহলে, ৫০০ মিলিমাইক্রণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সবুজ আলো প্রায় ৫৭ কিলো ক্যালরি/গ্রাম অণু শক্তির সমতুল। এখন

আমরা বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন বর্ণের আলো মানেই হল বিভিন্ন শক্তির ফোটোন বা বিভিন্ন শক্তি গুচ্ছ (quanta of energy) ; নীল আলোরশক্তি লাল আলোর চেয়ে অনেক বেশী। আরো লক্ষণীয় যে, আলোর কণিকা তত্ত্ব এবং তরঙ্গ তত্ত্বের মধ্যে যোগসূত্র (connecting link) হল এই তথ্যটি ঃ ফোটোনের শক্তি আলোক তরঙ্গের কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক।

আমরা যার সাহায্যে দেখতে পাই সাধারণ কথায় তাকেই 'আলোক' (light) বলি [লক্ষণীয় যে আমরা আলো দেখি না, দেখি আলোকিত বস্তু]। যাহোক, বিজ্ঞানীরা অতিবেগুনী আলোকের কথা বলেন এবং আরো বলেন যে অন্যান্য বিকিরণ (radiation)-ও তারা আলোক-তড়িৎ কোষ (photo cells) এবং আরো অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে 'দেখতে' পান ; তাই বিজ্ঞানীদের কাছে 'আলো' বলতে কেবল যে বিকিরণ খালি চোখে দেখা যায় অর্থাৎ দৃশ্য আলোই (visible radiation) বোঝায় না, আলোর অর্থ তাদের কাছে ব্যাপকতর। বিভিন্ন বর্ণের আলোক বিকিরণের মধ্যে আপাত পার্থক্য আমাদের বর্ণনার সুবিধের জন্য ; তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর (electromagnetic spectrum) সকল বিকিরণই তাই এক জিনিসই বোঝায় এবং তাদের বিভিন্নতা কেবল ফোটোনের শক্তি (photon energy) আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে।

আণবিক গঠন ও আলোর শোষণ
(Molecular Structure & the Absorption of Light) ঃ

আমরা জানি আলোর কোয়াণ্টা ধাতব পাতে আপতিত হলে ইলেকট্রণ উৎ-ক্ষিপ্ত হয়। আলোর কোয়াণ্টা দ্রবণের অণু (molecules in solution) থেকেও ইলেকট্রণ উৎক্ষিপ্ত করতে পারে। সুস্থিত অবস্থায় (প্রশম) কোন পরমাণু বা অণুতে ধনাত্মক নিউক্লিয়াস বা নিউক্লিয়াস সমষ্টিতে যতগুলি প্রোটোন থাকে অর্থাৎ উপাদান নিউক্লিয়াস গুলির মোট পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) যত বহির্নিউক্লিয় গঠনে (extranuclear structure) ইলেকট্রণও থাকে ঠিক ততগুলিই। এই ইলেকট্রণগুলি নিউক্লিয়াসের চতুর্দিককার শূন্যস্থান (space) অধিকার করে থাকে ; কতকগুলি নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি এবং স্থির তড়িদীয় বলে (electrostatic forces) দৃঢ় রূপে সংবদ্ধ থাকে এবং কতকগুলি থাকে অপেক্ষাকৃত দূরে এবং তাদের বন্ধনশক্তিও হয় অপেক্ষাকৃত

ক্ষীণ (loosely bound)। ইলেকট্রণের ভরবেগ এবং স্পিন (momentum and spin) তাদের নিউক্লিয়াসের বাইরে কতকগুলি নির্দিষ্ট কক্ষে (orbit-এ) স্থাপন করে। নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি ইলেকট্রণই কেবলমাত্র একটি অরবিটের উপযুক্ত হতে পারে এবং যে ইলেকট্রণগুলির বন্ধন সবচাইতে শিথিল তারাই সবচাইতে দূরবর্তী কক্ষে (outermost filled orbit) থাকে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা (quantum mechanics) অনুযায়ী এর চাইতে দূরবর্তী কক্ষও ইলেকট্রণের জন্য 'অনুমোদিত' (allowed) (অর্থাৎ এর চাইতেও দূরবর্তী কক্ষে ইলেকট্রণ থাকা সম্ভব)। কিন্তু যেহেতু ধনাত্মক নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রণকে দূরে সরাতে গেলে শক্তির প্রয়োজন হয়, অতএব ইলেকট্রণ চেষ্টা করে নিউক্লিয়াসের যত কাছাকাছি সম্ভব থাকতে। পদার্থের সকল রাসায়নিক ধর্মই নিহিত থাকে মুখ্যতঃ এই দূরতম তথা যোজ্যতা কক্ষে (outermost or valency shell-এ)। কোন কক্ষে দুটো ইলেকট্রণ যখন একসঙ্গে থাকে তখন তাদের স্পিন অবশ্যই বিপরীতমুখী হতে হবে এবং তাহলেই আমরা বলি যে ইলেকট্রণদ্বয় জুটিবদ্ধ বা পেয়ার্‌ড্ (paired) অবস্থায় রয়েছে। এই ইলেকট্রণদ্বয়ের কোনটি যদি আলোর একটি কোয়াণ্টাম (quantum) শোষণ করে তাহলে ওটি উচ্চতর (higher) কক্ষে উন্নীত হতে পারে এবং তখন বলা হয় অণুটি উদ্দীপিত অবস্থায় (excited state) আছে (চিত্র ৮-২)।

চিত্র ৮-২ :
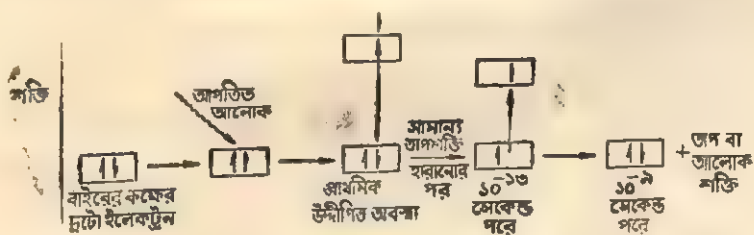
অণুর দ্বারা আলোর কোয়াণ্টা শোষণ

এক কক্ষ থেকে উচ্চতর অন্য আরেক কক্ষে ইলেকট্রণ পাঠাতে কত শক্তি দরকার হয় তা স্পষ্টতঃই নির্ভর করে কক্ষদ্বয়ের শক্তি-পার্থক্যের (energy

difference) উপর এবং আমরা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো অণুর উপর আপতিত করে এই শক্তি পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। যেহেতু, কোন ফোটোনের শক্তি 'হয় সমস্তটাই নয় কিছু না' (all or none) কেবলমাত্র এই ভিত্তিতেই ব্যবহার করা চলে (অর্থাৎ আংশিকভাবে কোয়াণ্টাম ব্যবহার করা যায় না) অতএব কেবল সেই ফোটোনগুলিই শোষিত হবে যারা ইলেকট্রণকে দূরবর্তী কক্ষে উন্নীত করতে সক্ষম (effective); এবং আলোর কোন্ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলি শোষিত হচ্ছে তা অনুসন্ধান করে আমরা পাই শোষণ বর্ণালী (absorption spectrum) (চিত্র ৮-৩)। সাধারণ আলোকে আমরা
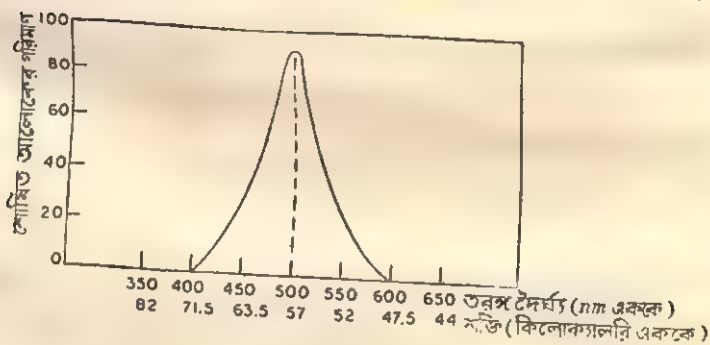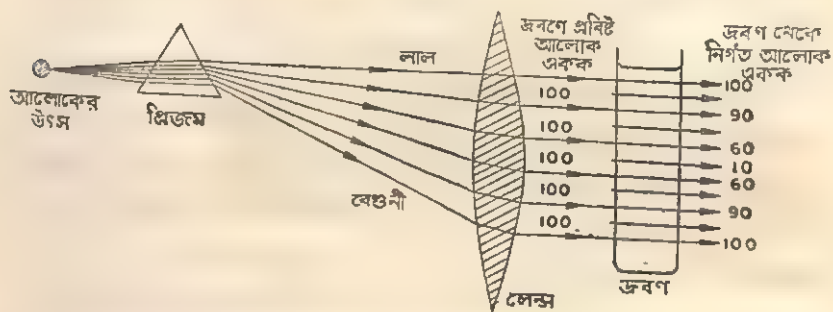
চিত্র ৮-৩ঃ শোষণ বর্ণালী

যদি প্রিজমের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বিশ্লেষিত করি এবং বিভিন্ন বর্ণের সেই বিশ্লেষিত আলোকে কোন রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণে আপতিত করে উল্টো দিক থেকে নির্গত রশ্মি লক্ষ্য করি তাহলে দ্রবণের অণুদ্বারা আলোর কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলি শোষিত হচ্ছে তা আমরা গুণগতভাবে (qualitatively)

নির্ণয় করতে পারবো। চোখের পরিবর্তে আলোক-কোষ (Photo cells) ব্যবহার করলে কতটা আলোকশক্তি শোষিত হচ্ছে তা পরিমাণগতভাবে (quantitatively) নির্ণয় করা যায় এবং তার দ্বারা ৮-৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে লেখচিত্রও অংকন করা যায়। আলোচ্য লেখচিত্রে শোষণের শীর্ষস্থান (absorption peak) ৫০০ মিলিমাইক্রণে (500 mμ) ; এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণ কক্ষ থেকে অপূর্ণ কক্ষে একটি ইলেকট্রণ উন্নীত করতে প্রতি গ্রাম অণুর জন্য গড়ে প্রায় ৫৭ কিলোক্যালোরি শক্তি দরকার।

আগেই বলেছি, কোন অণু বা পরমাণু কর্তৃক যখন আলোর একটি কোয়াণ্টাম শোষিত হয় তখন একটি ইলেকট্রণ উচ্চতর শক্তি স্তরে (higher energy level) উন্নীত হয়। এই উদ্দীপিত ইলেকট্রণটি পূর্বেকার স্থিতি-অবস্থায় (original ground state) ফিরে এলে এক কোয়াণ্টাম আলো উদ্ভূত হয় ; এই প্রক্রিয়া (mechanism)-কে বলে ফোটোলুমিনেসেন্স (Photo

প্রতিপ্রভা এবং অনুপ্রভা
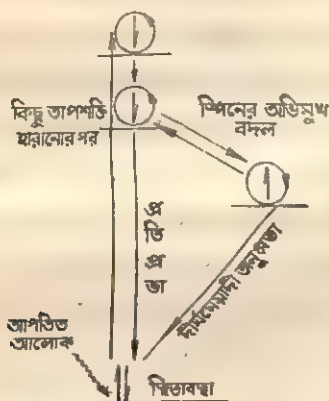
চিত্র ৮-৪ : প্রতিপ্রভা এবং অনুপ্রভা

luminescence)। ফটোলুমিনেসেন্স মূলতঃ দুই প্রকারের : ফ্লুয়োরেসেন্স (fluorescence) বা প্রতিপ্রভা এবং ফসফোরেসেন্স (phosphorescence) বা অনুপ্রভা। পদার্থে আলোক সম্পাত কালে অথবা তার পরবর্তী স্বল্প কিছুক্ষণ ধরে যে উজ্জ্বল প্রভা নিঃসৃত হয় তাকে বলে ফ্লুয়োরেসেন্স (প্রতিপ্রভা) ;

পক্ষান্তরে, উদ্দীপক রশ্মি (exciting radiation) বিচ্ছিন্ন হলে ফসফোরেসেন্স বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফ্লুয়োরেসেন্সের চেয়ে দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (কম শক্তি বিশিষ্ট) ফসফোরেসেন্স হয় ; এই তথ্যটি থেকে ফোটোলুমিনেসেন্সের সঠিক প্রণালী সম্পর্কে আমরা কিছু আভাস পেতে পারি। ৮-৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে ফ্লুয়োরেসেন্স প্রক্রিয়ায় উদ্দীপিত ইলেকট্রণটি তৎক্ষণাৎ ($১০^{-৯}$ সেকেণ্ডের মধ্যে) স্থিতাবস্থায় (ground state) ফিরে আসে ; সাধারণতঃ এই প্রতিপ্রভ আলোর (fluorescent light) তরঙ্গদৈর্ঘ্য উদ্দীপক আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী হয়, কেননা গ্রাউণ্ড স্টেট-এ ফিরে আসার পূর্বে কিছু শক্তি তাপরূপে অপচয়িত হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার উদ্দীপিত ইলেকট্রণটির ঘূর্ণনের দিক বদলে যেতে পারে (reversed spin) এবং ওটি আরো কম শক্তির স্তরে (lower energy state) নেমে আসে ; এরকম যদি ঘটে তাহলে ইলেকট্রণটির স্পিন পুনরায় বিপরীতমুখী হয়ে যতক্ষণ না পূর্বের দিক অনুযায়ী ঘূর্ণন হয় (original spin restored) ততক্ষণ ইলেকট্রণটির পক্ষে আদি স্থিতি অবস্থায় (ground state-এ) ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে ; কেননা একই রকম স্পিনের দুটি ইলেকট্রণ কখনই একই কক্ষে থাকতে পারে না। ফলে অপেক্ষাকৃত কম প্রাখর্যের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভা (long-term emission) ফসফোরেসেন্সের সৃষ্টি হয় এবং যতক্ষণ না কোনকিছু ঘটে ইলেকট্রণটির স্পিন পূর্বাবস্থায় আসে ততক্ষণ ফসফোরেসেন্স চলতে থাকে। কখনও কখনও বেশ কয়েক সেকেণ্ড ধরে চলে এই ফসফোরেসেন্স। প্রতিপ্রভ এবং অনুপ্রভ অবস্থা (fluorescent and phosphorescent states) সম্পর্কে মোটামুটি বিশদভাবেই আলোচনা করা হল, কেননা বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে পদার্থের এই ধর্ম ক্রমে ক্রমে অধিক থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ, রাইবোফ্লেবিন ফসফেটকে অতিবেগুনী রশ্মিদ্বারা উদ্দীপিত (irradiate) করা হলে অতিশয় উজ্জ্বল প্রতিপ্রভা নির্গত হয়, যার শীর্ষবিন্দু (peak) হলুদ-সবুজ অঞ্চলে, ৫৩০ মিলিমাইক্রণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে। ফ্লেবিন বিজারিত হলে অথবা কোন প্রোটিনের সাথে যুক্ত থাকলে এই ফ্লুয়োরেসেন্স অদৃশ্য হয় অথবা ওর ঔজ্জ্বল্য একেবারেই

কমে যায়—এর থেকে এই প্রকারের বিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে।

আলোকপ্রভা (ফোটোলুমিনেসেন্স) ছাড়া অন্যান্য প্রকারের প্রভা (লুমিনেসেন্স)-ও ইদানীংকালে বিজ্ঞানীদের যথেষ্টভাবে আকৃষ্ট করছে। উদাহরণস্বরূপ, তড়িদ্শক্তি দ্বারা অণু বা পরমাণু উদ্দীপিত হলে ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স (electroluminescence) বা তড়িদ্প্রভার সৃষ্টি হয়; আশা করা যাচ্ছে, এই ধরণের শীতল আলো (cold light) ভবিষ্যতে গৃহ আলোকিত করার কাজ অনেকটাই সমাধান করবে। জীববিজ্ঞানীদের আর একটি বিশেষ গবেষণার বিষয় হল কেমিলুমিনেসেন্স (chemiluminescence) বা রসায়নী প্রভা—এই প্রভা উদ্ভূত হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে।

সালোক সংশ্লেষ (Photosynthesis):

উদ্ভিদে ক্লোরোফিল নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ আছে, যার দ্বারা আলোকশক্তি শোষিত হয় এবং কোষ এই আলোক শক্তিকে কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। প্রিস্টলী (Priestley)-ই প্রথম লক্ষ্য করেন যে সবুজ উদ্ভিদ অক্সিজেন উৎপাদনে সক্ষম; অবশ্য তিনি জানতেন না যে এই প্রক্রিয়ার জন্য (অর্থাৎ অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য) আলোকশক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। পরবর্তী কয়েক বছরে এ তথ্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হল যে সবুজ উদ্ভিদ বিপাকক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইডকেও অপসারিত করতে পারে। আরো পরে গৃহীত কার্বন ডাই অক্সাইড এবং উৎপাদিত অক্সিজেনের মধ্যে পরিমাণগত সঠিক সম্পর্কটি (Quantitative relationship) নির্ণীত হল। প্রাণীর মতো উদ্ভিদেরও শ্বাসক্রিয়া আছে, এবং বর্তমানে আমরা জানি উদ্ভিদ কার্বন কাঠামো থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত করে অক্সিজেনে সংযুক্ত করে এবং কার্বন শৃঙ্খল ভেঙ্গে উৎপন্ন করে কার্বন ডাই অক্সাইড। এই প্রক্রিয়াগুলি আলোয় বা আঁধারে, যেকোন পরিবেশেই ঘটতে পারে। অতএব, সালোক সংশ্লেষ শ্বাসক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়া; জল থেকে হাইড্রোজেন পুনরায় কার্বন কাঠামোতে স্থানান্তরিত করবার জন্য অবশ্যই আলোকশক্তি ব্যবহার করতে হবে—এবং এই কার্বন কাঠামো আসে, কার্বন ডাই

অক্সাইড থেকে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে সরলতম রূপে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে :

$$CO_2+2H_2O+\text{আলোকশক্তি}\rightarrow(CH_2O)+O_2+H_2O$$
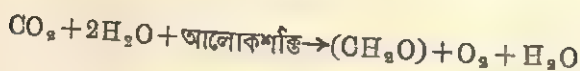
একটি 'সম্পূর্ণ এক-শর্করা অণু' গঠনের জন্য দরকার ছ'টি কার্বন ডাই অক্সাইড অণু। অতএব, আমরা লিখতে পারি :

$$6CO_2+12H_2O+\text{আলোক}\rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O$$
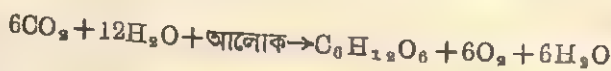
উপরিউক্ত সমীকরণ দুটিতে জল যোগ করে পরে আবার অর্ধেক পরিমাণ জল বের করে নেওয়া হচ্ছে কেন এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, উৎপন্ন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড অণু থেকে আসে না, আসে জলের অণু থেকে। অতএব, মনে করা হয় এই আলোক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল দুটো অংশে বিভক্ত হয়— একটি বিজারক অংশ (H) এবং অপরটি জারক অংশ (OH)। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, হাইড্রোক্সিল এককের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই উৎপন্ন হয় অক্সিজেন এবং কিছু পরিমাণ জল।

অতএব, সালোক সংশ্লেষের প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া হল ক্লোরোফিল অণু কর্তৃক আলোর কোয়ান্টা শোষণ। যেহেতু ক্লোরোফিল আলোক-বর্ণালীর লোহিত অঞ্চলে (656 mμ) শোষণ করে (এই কারণেই গাছের পাতা সবুজ দেখায়) অতএব একথাই প্রতীয়মান হয় যে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় লোহিত আলোক-গুচ্ছই (red quanta) কার্যকরী (effective)। সাধারণভাবে একথা সত্যি বলেই প্রমাণিত হয়েছে। যদিও আমরা সঠিক প্রণালী (exact mechanism) সম্পর্কে নিশ্চিত নই, তবুও একথা পরিষ্কার হয়েছে যে আলোক শক্তির প্রভাবে ক্লোরোফিল অণুর কিছু কিছু ইলেকট্রণ উদ্দীপিত অবস্থায় (excited state) চলে যায়। এই উদ্দীপনা শক্তি (excitation energy) কোন না কোন প্রকারে জলকে ভেঙ্গে শক্তিশালী বিজারক "H" এবং জারক "OH" গঠন করে। এইরূপে, সালোক সংশ্লেষের আলোক দশায় (light phase) জলের আলোক রাসায়নিক বিভঞ্জনের (photo chemical decomposition) ফলে উৎপন্ন হয় প্রভূত পরিমাণ স্থৈতিক শক্তি।

সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জটিল বিক্রিয়াশ্রেণীকে নিম্নোক্ত তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা সুবিধেজনক।

(ক) ফোটোলিসিস বা হিল বিক্রিয়া (Photolysis or the Hill reaction):

এই পর্য্যায়ে সূর্যালোক জলের অণু ভেঙ্গে উপাদান পরমাণুগুলো উৎপন্ন করে এবং কতকটা সৌর শক্তি ATP রূপে বিধৃত হয়:

[illegible]
↓
উদ্দীপিত ক্লোরোফিল $+ 2H_2O \rightarrow$ স্বাভাবিক ক্লোরোফিল $+ 2H_2 + O_2 +$ ব্যবহার যোগ্য শক্তি
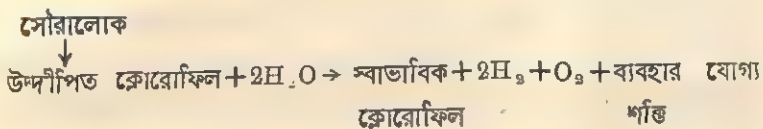
(খ) কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিরণ (CO_2 fixation): এটি হল অন্ধকার দশা। এই পর্য্যায়ে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রথম পর্য্যায়ে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সরল ট্রায়োজ কার্বোহাইড্রেট তৈরী করে।

$CO_2 + 2H_2 +$ শক্তি $\rightarrow (CH_2O) + H_2O$
(কার্বোহাইড্রেট)
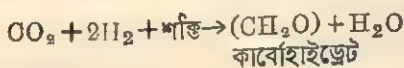
(গ) কার্বোহাইড্রেট রূপান্তর (Carbohydrate conversion):

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উৎপন্ন সরল ট্রায়োজ অণু থেকে হেক্সোজ শর্করা এবং জটিল কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ বা প্রোটিন উৎপন্ন হয় এই পর্য্যায়ে:

$(CH_2O) \rightarrow$ জটিলতর কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ এবং প্রোটিন।

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সবুজ উদ্ভিদে সম্ভবতঃ দুই প্রকারের ক্লোরোফিল আছে এবং সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলবার জন্য উভয় প্রকার ক্লোরোফিলেরই আলোক শক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হওয়া প্রয়োজন। এক প্রকারের ক্লোরোফিল বর্ণালীর লোহিত অঞ্চলে এবং অন্য প্রকারের ক্লোরোফিল বর্ণালীর অবলোহিত অঞ্চলে (far-red region) আলোর কোয়াণ্টা শোষণ করে।

ক্লোরোফিল লাল আলোর কোয়াণ্টা শোষণ কালে একটি ইলেকট্রণ পরিত্যাগ করে এবং বিজারিত করে সাইটোক্রোম ৫৫০-কে (চিত্র ৮-৫)। সাইটোক্রোমের লৌহ (Fe^{3+}) এই ইলেকট্রণটি গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় জারিত ক্লোরোফিল জলের অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং ফলস্বরূপ নিজে বিজারিত হয়ে যায়। প্রতি অণু অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য এই প্রক্রিয়ার চার

কোয়াণ্টা করে আলোক শক্তির প্রয়োজন হয়। লোহিত আলোক প্রক্রিয়ার সামগ্রিক বিক্রিয়াটি নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে ঃ

$$4H_2O \rightarrow 2H_2O + O_2 + 4H$$

এই চারটে হাইড্রোজেন চার অণু ক্লোরোফিল বিজারণে ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক আলোক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিজারিত সাইটোক্রোম অপর এক সাইটোক্রোম দ্বারা নিম্নতর শক্তি স্তরে জারিত হয়। সাইটোক্রোম ৫৫০ থেকে 'সাইটোক্রোম-বি'-তে ইলেকট্রণ স্থানান্তর কালে যে স্থৈতিক শক্তি মুক্ত হয় তা ATP'র ফসফেট যোজকে বিধৃত হয়, অর্থাৎ ATP তৈরী হয়। এই বিজারিত সাইটোক্রোম-বি এক অণু ক্লোরোফিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি জটিল যৌগ (complex) গঠন করে এবং এই ক্লোরোফিল অণুটি যখন এক কোয়াণ্টাম লাল আলো শোষণ করে তখন উক্ত জটিলের বিজারিত সাইটোক্রোম-বি'র ইলেকট্রণ
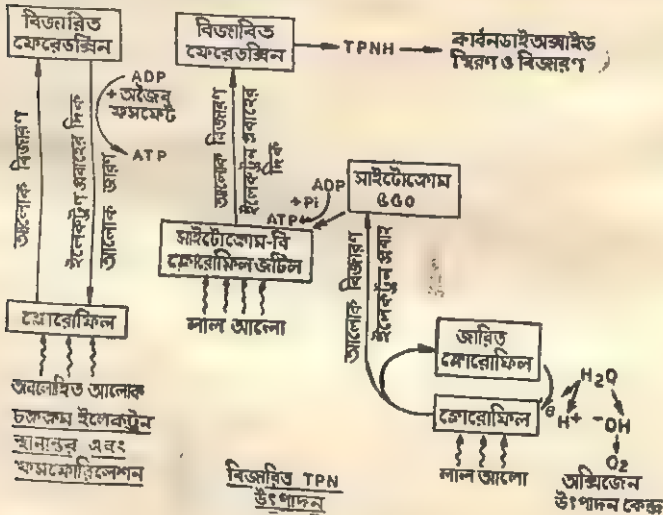
চিত্র ৮-৫

সালোক সংশ্লেষ ঃ ফোটোলিসিস

উচ্চশক্তি স্তরে উন্নীত হয়, অর্থাৎ উচ্চ বিজারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এটি তখন ফেরেডক্সিনকে (ferredoxin) বিজারিত করে দিতে পারে। ফেরেডক্সিন হল একটি লৌহঘটিত কোফ্যাক্‌টর। এইরূপে আলোক-জারিত সাইটোক্রোম-বি

অণুটি এখন আবার বিজারিত সাইটোক্রোম-৫৫০ থেকে ইলেকট্রণ গ্রহণ করতে পারবে (চিত্র ৮-৫)।

বিজারিত ফেরেডক্সিন এইবার TPN-কে বিজারিত করে উৎপন্ন করে TPNH এবং শেষোক্ত যৌগটিই কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণে বিজারক রূপে কাজ করে।

ফেরেডক্সিনে একটি ইলেকট্রণ স্থানান্তরের জন্য দরকার দুই কোয়াণ্টা আলো, অতএব স্পষ্টতই চার কোয়াণ্টা আলোক শক্তি প্রয়োজন এক অণু TPNH (দুটো ইলেকট্রণ স্থানান্তর) তৈরীর জন্য। আবার যেহেতু প্রারম্ভিক প্রক্রিয়ায় এক অণু অক্সিজেন গঠনের জন্য চার কোয়াণ্টা আলো দরকার অতএব TPNH উৎপাদনের সমীকরণটি হবে নিম্নরূপ ঃ

$$2\,TPN + 4H_2O \xrightarrow[\text{আলোকশক্তি}]{\text{আটকোয়াণ্টা}} 2TPNH + 2H_2O + O_2 + 2H^+$$

(২a)
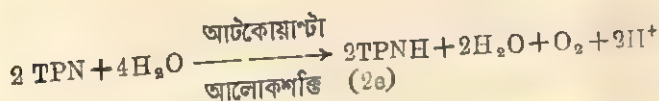
সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে স্বাধীনভাবে আরেকটি আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়াচক্র সংঘটিত হয়—এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অবলোহিত আলোক (চিত্র ৮-৫)। এই প্রক্রিয়ায় বিজারিত ফেরেডক্সিন ক্লোরোফিলের সাহায্যে জারিত হয় এবং উৎপন্ন করে ATP। ইলেকট্রণ স্থানান্তর এই প্রক্রিয়ায় চক্রক্রমে হতে পারে এবং এই জন্য এই প্রক্রিয়ার ফসফেট সংযোগকে চক্রক্রম ফসফেট সংযোজন (cyclic phosphorylation) বলে। এই উভয় প্রণালীর ফসফোরিলেশনই অবশ্য ফোটোফসফোরিলেশন (photophosphorylation)।

সবুজ উদ্ভিদের যে সকল বিক্রিয়া উপরে আলোচিত হ'ল আলোর সাহায্যে সংশ্লেষণ ক্ষম কতিপয় জীবাণুর (photosynthetic bacteria) বেলাতেও ঐ ধরণের বিক্রিয়া ঘটে ; তফাৎ এই যে, এই জীবাণুদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় না এবং এরা জলের পরিবর্তে জৈব বা অজৈব অন্য কোন বিজারক দ্রব্য ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে TPNH উৎপাদনের সামগ্রিক বিক্রিয়াটি নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে ঃ

$$2TPN + 2H_2A \rightarrow 2TPNH + 2A + 2H^+$$

(২a)
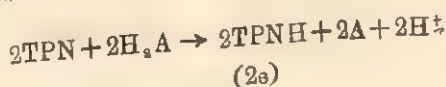
কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিরণ ঃ ক্যালভিন চক্র (CO_2 fixation : The Calvin cycle)

ফোটোলিসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন-বাহক (hydrogen-carrier) TPNH এবং ATP-র সঞ্চিত শক্তি সালোক সংশ্লেষের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ব্যবহৃত হয়। এই পর্য্যায়ে একটি চক্রক্রম বিক্রিয়া শ্রেণীতে কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন-বাহকের হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত হয়ে সরল কার্বোহাইড্রেট অণু গঠন করে। CO_2 অণু চক্রে এমন জায়গায় প্রবেশ করে যেখানে এটি একটি গ্রহীতা অণু কর্তৃক গৃহীত হতে পারবে। সাম্প্রতিক আইসোটোপীয় (isotopic) গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহীতা (CO_2-acceptor) রূপে এই চক্রে কাজ করে রাইবুলোজ ডাই ফসফেট, RDP
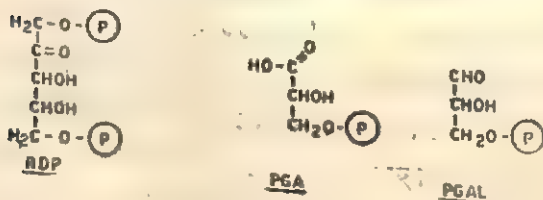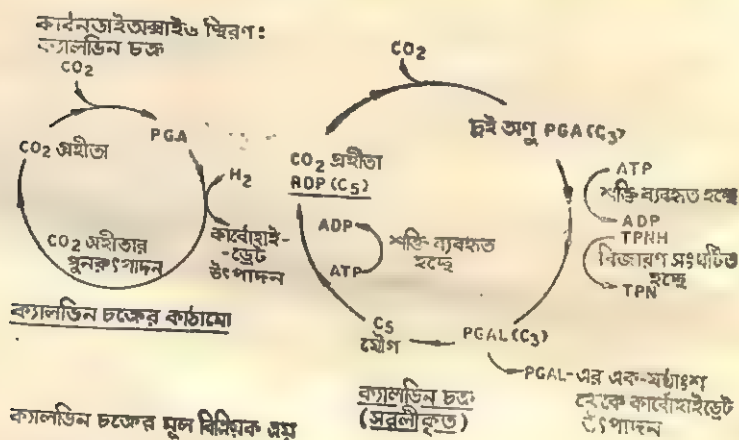
চিত্র ৮-৬

(Ribulose diphosphate)। RDP, কিটোপেন্টোজ রাইবুলোজের ফসফেট সঞ্জাত যৌগ। CO_2 RDP-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে যুত যৌগটি উৎপন্ন করে

ওটি ভেঙ্গে গিয়ে তৈরী হয় দুই অণু ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বা PGA। PGA এটিপির শক্তি ব্যবহার করে TPNH দ্বারা বিজারিত হয়ে তৈরী করে একটি ট্রায়োজ ফসফেট, PGAL (৩-ফসফো গ্লিসের‍্যালডিহাইড)। উৎপন্ন PGAL-এর এক-ষষ্ঠাংশ কেবল কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, বাকি পাঁচের-ছয় অংশ (5/6 th) যায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহীতা অণুটি (RDP) পুনরুৎপন্ন করতে, যাতে চক্রে পুনরায় CO_2 গৃহীত হতে পারে। এই ক্যালভিন চক্রটি সরলীকৃত রূপে ৪-৬ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

কার্বোহাইড্রেট রূপান্তর (Carbohydrate conversion) :

ক্যালভিন চক্রে উৎপন্ন ৩-ফসফোগ্লিসেরঅ্যালডিহাইড (PGAL) কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টে সঞ্চিত হয় না। এটি কোষ কর্তৃক দ্রুত ব্যবহৃত হয়ে যায়। PGAL শ্বাসক্রিয়ায় বিক্রিয়ক (Respiratory substrate) রূপে কাজ করে কোষকে শক্তি যোগাতে পারে, বা অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ'র মাধ্যমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় যৌগে রূপান্তরিত হতে পারে (চিত্র ৪-৭)। অথবা PGAL কোষের

চিত্র ৪-৭
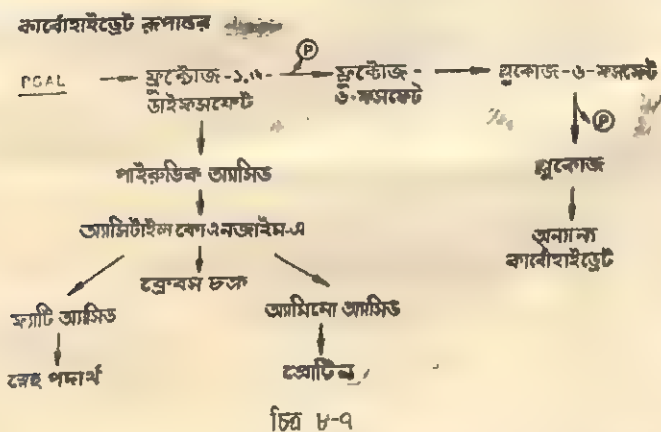
কার্বোহাইড্রেট রূপান্তর

বাইরে জীবদেহের অন্যান্য অংশে পরিবাহিত হয়ে অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় (less reactive) যৌগ গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ, ইত্যাদি গঠন করতে পারে। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে হলে এরা আবার পলিস্যাকারাইড স্টার্চ বা ইনুলিনে (inulin) রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ক্লোরোপ্লাস্ট এবং সালোকসংশ্লেষ
(Chloroplasts & Photosynthesis)

সালোক সংশ্লেষ সংঘটিত হয় সবুজ উদ্ভিদকোষের ক্লোরোপ্লাস্টে (চিত্র ৮-৮)। সালোক সংশ্লেষের আলোক দশায় যে বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় অণুগুলি গ্র্যাণার (grana) মেমব্রেণে (membrane) দৃঢ় ও সুসমঞ্জস ভাবে সজ্জিত থাকে। এই অণুগুলি হ'ল ক্লোরোফিল এবং ATP সংশ্লেষণ, TPN বিজারণ ও আনুষঙ্গিক বিক্রিয়াগুলির সঙ্গে যুক্ত এনজাইম ও কোফ্যাক্টর সমূহ। অন্ধকার দশায় কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিরণ ও কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম এবং কোফ্যাক্টরগুলি থাকে ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে (Stroma)।

চিত্র ৮-৮
ক্লোরোপ্লাস্ট

দৃষ্টি (Vision) :

পদার্থের উদ্দীপিত অবস্থার (excited state) সাথে যুক্ত জৈবিক প্রক্রিয়া সমূহের আরেকটি মনোগ্রাহী দৃষ্টান্ত হল দর্শন ক্রিয়া (visual process)। রেটিনার (Retina) গঠন এবং দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রঞ্জক দ্রব্যের (visual pigments) জীবরসায়ন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে ; তা সত্ত্বেও দর্শনক্রিয়ার মৌলিক প্রণালীগুলি সম্পর্কে জানা গেছে খুবই সামান্য। মস্তিষ্কের সাথে

চোখের সংযোগ রক্ষা করে যে দর্শন স্নায়ু (optic nerve) তাতে আলোক সম্পাত করে গবেষকরা দেখিয়েছেন রেটিনাতে আলো পড়লে স্নায়ু-তাড়না (nerve impulse)-র সৃষ্টি হয়—এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে চোখে প্রাথমিক আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়া অবশ্যই ঘটে। মানুষের চোখে থাকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ কোন (cones) এবং আরেক প্রকারের বারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একক যাদের বলা হয় রড (rods), রডদের সাথে যুক্ত আছে প্রায় দশ লক্ষ অপটিক স্নায়ুতন্তু (optic nerve fibres) এবং এরাই অন্ধকারে ক্ষীণ দর্শনের (low-intensity vision) জন্য দায়ী—এই দর্শন হয় মূলতঃ সাদা কালোয় (black & white vision)। আর, কোন (cones) তীব্র আলোয় এবং বিভিন্ন রঙের দর্শন নিয়ন্ত্রণ করে।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে স্নায়ু-তাড়নার সূত্রপাত ঘটে রড্‌স্ এবং কোন্‌স্-এ, কারণ দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রঞ্জক দ্রব্যের অধিকাংশেরই অবস্থান এই সকল এককের (rods & cones) বহিরাংশে। দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রঞ্জক দ্রব্য গুলির একটি (রোডোপসিন, Rhodopsin) পৃথক

চিত্র ৮-৯ :

ভিটামিন-A এবং রেটিনিন আইসোমার দ্বয়

করা গেছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে এটি একটি প্রোটিন অপসিন (opsin) এবং একটি 'ভিটামিন-এ' সঞ্জাত যৌগ রেটিনিনের (Retinene) সমন্বয়ে গঠিত। ডিপিএনএইচ কর্তৃক অ্যালডিহাইড মূলকটির অ্যালকোহোলিক মূলকে

ক্লোরোপ্লাস্ট এবং সালোকসংশ্লেষ
(Chloroplasts & Photosynthesis)

সালোক সংশ্লেষ সংঘটিত হয় সবুজ উদ্ভিদকোষের ক্লোরোপ্লাস্টে (চিত্র ৮-৮)। সালোক সংশ্লেষের আলোক দশায় যে বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় অণুগুলি গ্র্যাণার (grana) মেমব্রেণে (membrane) দৃঢ় ও সুসমঞ্জস ভাবে সজ্জিত থাকে। এই অণুগুলি হ'ল ক্লোরোফিল এবং ATP সংশ্লেষণ, TPN বিজারণ ও আনুষঙ্গিক বিক্রিয়াগুলির সঙ্গে যুক্ত এনজাইম ও কোফ্যাক্টর সমূহ। অন্ধকার দশায় কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিরণ ও কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম এবং কোফ্যাক্টরগুলি থাকে ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে (Stroma)।

চিত্র ৮-৮
ক্লোরোপ্লাস্ট

দৃষ্টি (Vision) :

পদার্থের উদ্দীপিত অবস্থার (excited state) সাথে যুক্ত জৈবিক প্রক্রিয়া সমূহের আরেকটি মনোগ্রাহী দৃষ্টান্ত হল দর্শন ক্রিয়া (visual process)। রেটিনার (Retina) গঠন এবং দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রঞ্জক দ্রব্যের (visual pigments) জীবরসায়ন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে ; তা সত্ত্বেও দর্শনক্রিয়ার মৌলিক প্রণালীগুলি সম্পর্কে জানা গেছে খুবই সামান্য। মস্তিষ্কের সাথে

চোখের সংযোগ রক্ষা করে যে দর্শন স্নায়ু (optic nerve) তাতে আলোক সম্পাত করে গবেষকরা দেখিয়েছেন রেটিনাতে আলো পড়লে স্নায়ু-তাড়না (nerve impulse)-র সৃষ্টি হয়—এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে চোখে প্রাথমিক আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়া অবশ্যই ঘটে। মানুষের চোখে থাকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ কোন (cones) এবং আরেক প্রকারের বারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একক যাদের বলা হয় রড (rods), রডদের সাথে যুক্ত আছে প্রায় দশ লক্ষ অপটিক স্নায়ুতন্তু (optic nerve fibres) এবং এরাই অন্ধকারে ক্ষীণ দর্শনের (low-intensity vision) জন্য দায়ী—এই দর্শন হয় মূলতঃ সাদা কালোয় (black & white vision)। আর, কোন (cones) তীব্র আলোয় এবং বিভিন্ন রঙের দর্শন নিয়ন্ত্রণ করে।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে স্নায়ু-তাড়নার সূত্রপাত ঘটে রড্স্ এবং কোন্স্-এ, কারণ দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রঞ্জক দ্রব্যের অধিকাংশেরই অবস্থান এই সকল এককের (rods & cones) বহিরাংশে। দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রঞ্জক দ্রব্য গুলির একটি (রোডোপসিন, Rhodopsin) পৃথক

চিত্র ৮-৯ঃ

ভিটামিন-A এবং রেটিনিন আইসোমার দ্বয়

করা গেছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে এটি একটি প্রোটিন অপসিন (opsin) এবং একটি 'ভিটামিন-এ' সঞ্জাত যৌগ রেটিনিনের (Retinene) সমন্বয়ে গঠিত। ডিপিএনএইচ কর্তৃক অ্যালডিহাইড মূলকটির অ্যালকোহোলিক মূলকে

(—CHO→—CH_2OH) বিজারণের ফলে 'ভিটামিন-এ' রেটিনিনে রূপান্তরিত হয়। এনজাইম অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ (alcohol dehydrogenase) বিক্রিয়াটি অনুঘটিত করে। আলোক সম্পাতিত হওয়া মাত্রই রোডোপসিন অপসিন এবং রেটিনিনে বিয়োজিত হয়ে যায় এবং এই সময়েই স্নায়ু-তাড়নার সূত্রপাত ঘটে। ব্যাপারটি খুবই অদ্ভুত। কারণ রোডোপসিন ভেঙ্গে যে রেটিনিন বেরিয়ে আসে এবং যে রেটিনিন রোডোপসিন গঠনের জন্য অপসিনে গিয়ে যুক্ত হয় তারা এক নয়, বিভিন্ন ; একে অন্যের আইসোমার (চিত্র ৮-৯)। দৃষ্টিশক্তির সাথে ভিটামিন-এ'র সম্পর্কের কথা তখনই নজরে আসে যখন দেখা গেল যে অন্ধকারে চোখের মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য ভিটামিন-এ'র অপ্রাচুর্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণ 'ভিটামিন-এ' না থাকলে দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রঞ্জক পদার্থের পুনর্গঠন মন্দীভূত হয়, এবং ফলস্বরূপ, রাতকানা রোগ (night blindness) দেখা দেয়। বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকের প্রতি চোখের সংবেদনশীলতা রোডোপসিনের শোষণ বর্ণালীর (absorption spectrum) সাথে অভিন্ন। সর্বোচ্চ শোষণ এবং সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতা (peak absorption & sensitivity) ৫০০ মিলিমাইক্রণের কাছাকাছি। অর্থাৎ সবুজ আলোর প্রতিই চোখ সর্বাধিক সংবেদনশীল। রঞ্জক অণুর আলোক-উদ্দীপন (photo excitation) কীভাবে স্নায়ু-তন্তুতে তাড়নার সৃষ্টি করে তা কিন্তু এখনও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় নি। তবে প্রথম দিককার গবেষণা থেকে অন্ততঃ প্রারম্ভিক পর্যায়টি পরিষ্কার হয়েছে। জানা গেছে, দৃশ্য আলোর সম্পাতে রোডোপসিন বিযোজিত হয়, আর এটি পুনর্গঠিত (reformed) হয় অন্ধকারে। এই সকল তথ্য থেকে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করা যায় যে রেটিনিনের পরিবর্তনের সাথেই আলোক-তড়িৎ (photocurrent) সম্পর্ক যুক্ত। যাহোক, সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই সকল পরিবর্তন সম্ভবতঃ মূল ঘটনা নয় ; কেননা স্নায়ু-তাড়নার সূচনা ও পরিবহনের (initiation & conduction) হারের তুলনায় রোডোপসিনের আলোক-রাসায়নিক পরিবর্তন অনেক বেশী মন্থর। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিশ্বাস করেন যে দর্শন ক্রিয়ার সময় যে সকল রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার কারণ কোন কিছুর প্রতিক্রিয়া, যা রেটিনিনের রূপান্তরের আগেই সংঘটিত হয়। এমন হতে পারে, ফোটোকারেন্ট কোন তড়িৎ বিশ্লেষণ মূলক (electrolytic) প্রক্রিয়ার দরুণ উৎপন্ন হয়—

রোডোপসিন বিয়োজিত হওয়ার সময় অপসিনের সালফহাইড্রাইল (SH) মূলকের উপর আলোক সম্পাতের ফলে এই প্রক্রিয়াটির উদ্ভব হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

জৈব প্রভা (Bioluminescence) ঃ

জীব কর্তৃক উদ্ভূত প্রভাকে বলে জৈব প্রভা বা বায়োলুমিনেসেন্স ; বায়োলুমিনেসেন্স কেমিলুমিনেসেন্সেরই এক বিশেষ রূপ। জৈবিক জারণ-প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তি কোন অণুর একটি ইলেকট্রণকে উচ্চতর শক্তি স্তরে উন্নীত করলে এই ধরণের প্রভা দেখা যায়। ফোটোলুমিনেসেন্সের বেলায় আপতিত ফোটোনটি যে কাজ করে এক্ষেত্রে জারণ শক্তিরও সেই একই কাজ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম লক্ষিত হয় যে কোনো কোনো জৈব পদার্থ আলো দিতে পারে, আর ১৮৮৭ খৃীষ্টাব্দে ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ ডুবোয়া (Dubois) বলেন যে স্বপ্রভ ক্ল্যাম (luminous clam) ফোলাস ডাকটাইলাস (pholas dactylus) থেকে আলো উৎপন্ন হয় একটি জারণক্ষম (oxidisable) পদার্থের দরুণ ; এই পদার্থটিকে তিনি বললেন লুসিফেরিন (luciferin)। উত্তাপ দিলে লুসিফেরিন সুস্থির থাকে, কিন্তু অক্সিজেন এবং এনজাইম লুসিফেরেজের (luciferase) উপস্থিতিতে একটি জারণমূলক বিক্রিয়ায় এটি বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এবং এই বিক্রিয়াটিতেই আলো উদ্ভূত হয়। এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে সকল স্বপ্রভ জীবের (luminous organisms) সাধারণ উপাদান লুসিফেরিন কিন্তু একটি মাত্র যৌগ নয়। বস্তুতঃ বিভিন্ন প্রকারের লুসিফেরিন আছে, যেমন আছে নানা প্রকারের ভিটামিন।

স্বপ্রভ জীব সম্পর্কে এখনও অনেক তথ্যই আমাদের অজানা। স্বপ্রভ জীব নানা প্রকারের হতে পারে ঃ নীল আভা (৪৯৫ মিলিমাইক্রণ) উৎপাদনকারী ব্যাকটিরিয়া থেকে শুরু করে লাল আভা (৬৪০ মিলিমাইক্রণ) উৎপাদনকারী দক্ষিণ আমেরিকার রেলপথ কীট (railroad worm, গুবরে পোকার শূককীট) পর্যন্ত। ক্ষয়িষ্ণু কাঠের প্রভা (৫৩০ মিলিমাইক্রণ) উৎপন্ন হয় একপ্রকার ছত্রাক দ্বারা। সমুদ্রে লুমিনেসেন্স হয় নানা প্রকার জীবের দরুণ ; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ প্রোটোজোয়া, রেডিওলারিয়া, স্পঞ্জ, জেলীফিস, কম্বজেলী (combjellies), ব্রিটল স্টারস্ (brittle stars), শামুক, ক্ল্যাম্ (clams), স্কুইড (squid), চিংড়ীমাছ, কোপ পোডস্ (cope pods), নানা প্রকারের মাছ,

ইত্যাদি। স্থলভাগের সর্বাধিক পরিচিত স্বপ্রভ জীব সম্ভবতঃ জোনাকী পোকা (firefly বা glow worm); এছাড়াও রয়েছে স্বপ্রভ স্প্রিং টেইল্‌স্‌ (luminous spring tails), মাছি, বিছা প্রভৃতি শতপদ প্রাণী (centipedes), সহস্রপদ বা মিলিপেডস্‌ (millipedes), কেঁচো এবং শামুক। স্বচ্ছ জলের একমাত্র পরিচিত স্বপ্রভ জীব হল নিউজীল্যাণ্ডের লিম্‌পিট।

জৈবপ্রভার মেকানিজম (mechanism) সম্পর্কে অতি সামান্যই জানা গেছে। এ ব্যাপারে আমরা এখন মুখ্যতঃ দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি: প্রথমতঃ, উদ্দীপিত অণুটির (excited molecule) প্রকৃতি (nature) কি, এবং দ্বিতীয়তঃ উদ্দীপিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় এত বেশী শক্তি আসে কোত্থেকে (কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে)? এর উত্তর এখনো আমরা সঠিক জানি না। দেখা গেছে, প্রাণরসায়নগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ জারণ বিক্রিয়াগুলিতে অল্পই শক্তি উৎপন্ন হয়, সাধারণতঃ একটি পাইরোফসফেট বণ্ড গঠনের পক্ষেই তা যথেষ্ট (৮ কিলোক্যালোরি প্রতি গ্রাম অণুতে)। যেহেতু জীবদের দ্বারা দৃশ্য আলোই (visible radiation) উদ্ভূত হয় অতএব, স্পষ্টতঃই, এই জারণ প্রক্রিয়াতে আরো অনেক বেশী শক্তি উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন। যদিও সাম্প্রতিক কালে প্রভা (আলোক) উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থের প্রকৃতি নিরূপণের কাজ অনেকটা এগিয়েছে, তবুও কিন্তু এ বিষয়ের মূল প্রক্রিয়াটিই (basic mechanism) রয়ে গেছে অজ্ঞাত। দেখা গেছে কোন কোন বিষয়ে সালোকসংশ্লেষ আর দর্শনক্রিয়ার (vision) সাথে বায়োলুমি-নেসেন্সের সাদৃশ্য আছে। এই দুটি ক্ষেত্রে (সালোকসংশ্লেষ এবং দর্শন-ক্রিয়া) উদ্দীপিত অবস্থার সৃষ্টি হয় আলোকসম্পাতে এবং ফলস্বরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে; কিন্তু লুমিনেসেন্স প্রক্রিয়ায় উদ্দীপিত অবস্থা সৃষ্ট হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে এবং শক্তি নির্গত হয় আলোক প্রভারূপে।

যে সকল জীবের প্রভা বিকিরণ করবার এই উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা আছে তাদের কাছে এর (এই প্রভাদানের) গুরুত্ব কী অর্থাৎ বায়োলুমিনেসেন্স প্রক্রিয়া এই সকল স্বপ্রভ জীবের কী কাজে লাগে তা নির্ণয়ের জন্য বহু গবেষক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, এর কোন পরিষ্কার জবাব এখনও মেলেনি। এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে এই বায়োলুমিনেসেণ্ট (Bioluminescent) বিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য জৈবিক ব্যবহার আছে। বেশীকিছু

সামুদ্রিক জীবের প্রজনন চক্র (reproduction cycle) আলো নির্গত হওয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জোনাকীর কোন কোন প্রজাতি আলোর ঝলক (flash)-কে যৌন সংকেত (sex signal) রূপে ব্যবহার করে। গভীর সমুদ্রের জীবদের দ্বারা উৎপন্ন আলোক প্রভাই হল সমুদ্রের অতলে চক্ষুষ্মান জীবদের আলোর একমাত্র উৎস। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার স্বপ্রভ ব্যাকটিরিয়া (luminous bacteria) মাছের বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থিতে (gland) জন্মগ্রহণ করে নিয়মিত আলোর উৎস রূপে কাজ করে। বায়োলুমিনেসেন্স প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন এই আলোকপ্রভা মহাসমুদ্রের অতলে আরো কোন আলোক-জৈবিক প্রক্রিয়া (photobiological process) চলতে সাহায্য করে কিনা জানা নেই, তবে আমাদের পক্ষে এই অনুমানই যথেষ্ট যে, বায়োলুমিনেসেন্সই ওসব করে।

বায়োলুমিনেসেণ্ট প্রক্রিয়ার নানা রাসায়নিক প্রকারভেদ আছে ; এ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে এই সকল প্রক্রিয়া বিবর্তনের সময় স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয়েছিল। এবং এরা সালোকসংশ্লেষের বিপরীত প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উদ্ভূত হয়, আর বিভিন্ন বিজারণ বিক্রিয়ায় গঠিত হয় বিভিন্ন জৈবপদার্থের অণুসকল। কিন্তু বায়োলুমিনেসেন্সের ক্ষেত্রে অক্সিজেন জৈব অণুর বিভঞ্জন ঘটায় একটি জারণমূলক (oxidative) প্রক্রিয়ায়—এই প্রক্রিয়ায় পদার্থ উদ্দীপিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ফলস্বরূপ আলোকপ্রভা বিকীর্ণ করে। এখন বিজ্ঞানীদের ধারণা এ ধরণের উদ্দীপিত অবস্থা সাধারণতঃ জারণমূলক বিক্রিয়াতেই সৃষ্ট হয়,—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শক্তি আলোকপ্রভা উৎপন্ন করতে ব্যয়িত না হয়ে এটিপি উৎপাদনেই ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা একটি যুক্তি খাড়া করতে পারি যে, বস্তুতঃপক্ষে উদ্দীপিত অবস্থা কাজে লাগিয়েই জীবন উদ্ভূত হয়েছিল এবং তার বিবর্তন ঘটেছে এই একই উদ্দীপিত অবস্থার ব্যবহারে—এখন যেমন উদ্ভিদরা সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্দীপিত অবস্থা কাজে লাগাচ্ছে। অতএব, আমাদের মনে করতে বাধা নেই জৈব-বিবর্তনের প্রথমদিকে এখন আমরা যা দেখি তার চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক আলোকপ্রভা উৎপাদনকারী জীবের অস্তিত্ব ছিল। বায়োলুমিনেসেন্স, সম্ভবতঃ ক্রমশ অবলুপ্তির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ; কেননা জীবেরা উদ্দীপিত অবস্থার শক্তি কাজে লাগানোর কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করছে। এইরূপে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপন্ন আলোকপ্রভা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় হয়ত ক্রমশঃ গৌণ (secondary) হয়ে পড়েছে। স্পষ্টতই, এ ব্যাপারে অর্থাৎ জৈবিক শক্তি রূপান্তরের (biological energy transformations) ক্ষেত্রে অনেক কাজ এখনও বাকী আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নিউক্লিক অ্যাসিড
ও
প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ

বংশবীজ ও কোষীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ—বংশাণুর পরিবর্তন ও তার প্রভাব—জেনেটিক গঠন ভঙ্গিমার বিভিন্নতা—বংশগতি বাহকপদার্থ : নিউক্লিক অ্যাসিড—ডিএনএ-র বিভিন্নতা : পিউরিন ও পাইরিমিডিন ক্ষারকদের বিন্যাস—পলিনিউক্লিওটাইড—ক্ষারক যুগল গঠন ও হাইড্রোজেন বন্ধনী—DNA-র ঘোরানো সিঁড়ির মত গড়ন—ডিএনএ (DNA)-র ক্রিয়াকলাপ : বংশগতির নিয়ামক—জীন রূপান্তর পদ্ধতি ও ভাইরাসের ব্যবহার—'বহিরাগত' ডিএনএ-র প্রভাব—ডিএনএ এবং আরএনএ (RNA)-র পারস্পরিক সম্পর্ক—প্রোটিন সংশ্লেষণ : জেনেটিক সংকেত পদ্ধতি—বিভিন্ন প্রকার RNA-র ভূমিকা—DNA-র প্রতিরূপ গঠন এবং বংশাণুর রূপান্তর।

কোষীয় বিপাকক্রিয়ার প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ, বস্তুতঃ, এনজাইম সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হতে পারে এমন এনজাইমগুলোই (constitutive enzymes) হল কোষের ধরণ এবং ক্রিয়াকলাপের মুখ্য নির্দ্ধারক। যদিও কোষ বিস্তৃত পরিসরে পরিবেশের প্রতি প্রতিবেদনশীল হতে পারে (অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হতে পারে কোষের) তবুও একই ধরণের কোষ একই প্রকারের গুণাবলী ও প্রতিক্রিয়া দেখায়। অতএব, একথা পরিষ্কার যে কোষীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে কোষের বংশগতিক প্রক্রিয়ার (hereditary mechanisms) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রজনন বিদ্যানুসারে জীবের সুনিয়ন্ত্রিত বিপাকক্রিয়া পদ্ধতি, বৃদ্ধি (development) এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত প্রাথমিক নির্দেশ আসে কোষীয় নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমে নিহিত **'বংশবীজ'** (genetic material) থেকে। এই বংশবীজের প্রকৃতি, উৎপাদন প্রণালী, কার্যের ধারা, এক পুরুষ (generation) থেকে অন্য পুরুষে এর বাহিত হওয়ার প্রণালী (mechanism of transmission), জৈব-বিবর্তন (organic evolution) প্রক্রিয়ায় এর ভূমিকা ইত্যাদি হল জেনেটিক্স বা সুপ্রজনন বিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এখানে

এর কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। কেননা, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সমূহের অন্তর্নিহিত দিকটি বুঝতে হলে তার জেনেটিক নিয়ন্ত্রণও জানা দরকার।

সকল জীবেরই বংশগতি বাহক পদার্থ (hereditary material) মূলতঃ একই, এবং সযত্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই পদার্থ ক্রোমোজোমে অন্তর্নিহিত রয়েছে। কোন একটি বিশেষ ক্রোমোজোমে প্রতিটি বংশাণুই (gene) একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে বলে প্রতীয়মান হয় ; এই অবস্থানকে বলে লোকাস (locus)। একক ক্রোমোজোমে জীনের ক্রম এবং বিন্যাস (order and spacing) 'পুনর্যোজন ও সংযোগ পরীক্ষা' (recombination and linkage test)-য় নির্ণীত হয়। জীনের এই অবস্থানই যে ঠিক এবং তা ক্রোমোজোমেই অবস্থিত তার যাথার্থ্য প্রতিপাদন আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে করতে পারি। এজন্য কোন ক্রোমোজোমীয় পরিবর্তনের সাথে নির্দিষ্ট কোন প্রাণরাসায়নিক অসম্পূর্ণতার (biochemical deficiencies) যোগসূত্র স্থাপন করে দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ক্রোমোজোমের কোন একটি বিশেষ ক্ষুদ্র অংশের অনুপস্থিতি কখনও কখনও একটি বিশেষ জীনের অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে ধরা যেতে পারে—যে জীনটি কোন জ্ঞাত প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

বংশাণু (জীন) সম্পর্কে জানবার একটি বিশেষ উপায় হল তাদের পরিবর্তনমূলক গুণাবলী (mutational properties) সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। এই ধরণের গবেষণা থেকে বীড্‌ল্ ও ট্যাটাম (Beadle and Tatum) সিদ্ধান্ত করেন যে জীনের পরিবর্তন (gene mutation) প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রভাবিত করে কোষীয় ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন ঘটায়। পরবর্তীকালে আবার যখন দেখা গেল যে জীন মিউটেশন জীবের পুষ্টিগত আবশ্যকতা (nutritional requirement) পরিবর্তিত করে দেয় তখন, স্বভাবতঃই, একথা পরিষ্কার হল যে জীন জৈবিক সংশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য সুনির্দিষ্ট 'এনজাইম-অনুঘটক সমূহে'র সংশ্লেষণ প্রভাবিত করে কোষের মূল রাসায়নিক এককগুলির (basic chemical units) জৈবিক সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

উদাহরণ স্বরূপ, ৯-১ নং চিত্রে একটি কাল্পনিক বিক্রিয়া শ্রেণী দেখানো হয়েছে,—এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল অ্যামিনো অ্যাসিড আর্জিনিন সংশ্লেষণ। এই

সংশ্লেষণের প্রতিটি প্রাণরাসায়নিক ধাপই এক একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইমের (Ex, Ey ইত্যাদি) দ্বারা অনুঘটিত হয়। আবার এনজাইমগুলির সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রোমোজোমের বিশেষ জীন গুলির (Gx, Gy ইত্যাদি) দ্বারা। জীন মিউটেশন সম্পর্কিত গবেষণা থেকে দেখা গেছে 'জীন-এক্স' (Gx)-কে যদি পরিবর্তিত করা হয় তাহলে সাথে সাথে এনজাইম-এক্স (Ex)-র সংশ্লেষণও প্রভাবিত হয়। এবং ফলস্বরূপ (B)-র সংশ্লেষণ নিবারিত হয় ; এই 'B' হচ্ছে আর্জিনিনের অগ্রবর্তী একটি অত্যাবশ্যক অন্তর্বর্তী যৌগ (precursor), অতএব, আর্জিনিন সংশ্লেষণও এইরূপে নিবারিত হয়। সুতরাং যদি কোন জীবের অভ্যন্তরে এই ধরণের পরিবর্তন (mutation) ঘটে তবে তাকে বেঁচে থাকবার ও পুষ্টি লাভ করবার জন্য অবশ্যই খাদ্যের সাথে আর্জিনিন গ্রহণ করতে হবে।
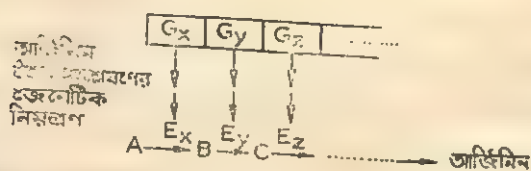
চিত্র ৯-১ :
আর্জিনিন জৈব-সংশ্লেষণের জেনেটিক নিয়ন্ত্রণ

জীন এনজাইম সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে এই প্রকল্প (hypothesis)-টি পরীক্ষামূলক তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তাই এখন আমরা নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করি যে জীনরা তাদের প্রভাব কাজে লাগায় প্রধানতঃ নিজেদের (জীন) তৈরী এনজাইমের মাধ্যমে। বর্তমানে একথা পরিষ্কার যে জীবের পুষ্টিগত আবশ্যকতায় (nutritional requirements) যে ব্যাপক বিভিন্নতা লক্ষিত হয় তার কারণ হল জীবের জেনেটিক গঠন ভঙ্গিমার (genetic constitution) বিভিন্নতা। অতএব কোন জীবের বিশেষ কোন পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার তথা উক্ত পরিবেশে নিজেকে মানিয়া নেওয়ার সামর্থ্য এবং একটি সুনির্দিষ্ট বিপাকীয় ক্ষমতা লাভ নির্ভর করে ওর জেনেটিক গঠন ভঙ্গিমার উপর।

এই সত্যোপলব্ধি নিউক্লিয়াসে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বার্তার (inherited message) সংকেত উদ্ধারের (decoding) পথে একটি বিরাট পদক্ষেপ। এবং এখন আমরা যথার্থই নিশ্চিত যে এই বার্তা প্রকৃতিতে রাসায়নিক এবং জীন তার রাসায়নিক সংযুতি ও আভ্যন্তরীণ বিন্যাস (internal arrangement)-এর দ্বারা প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। নিজের অবিকল প্রতিরূপ গঠনের সামর্থ্য জীনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ধর্ম এবং জীনের এই সামর্থ্য ওর এনজাইম গঠনের ক্ষমতা দ্বারা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এইরূপে উৎপন্ন এনজাইমটি জীনের বৈশিষ্ট্য (character) লাভ করে, ঠিক যেমনি ভাবে ছাঁচে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ছাঁচের আকৃতি পায়। অতএব, বিপাকক্রিয়ার জেনেটিক নিয়ন্ত্রণ প্রাথমিকভাবে জীনের কোন না কোনপ্রকারে প্রোটিন (সুনির্দিষ্ট প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা বিশিষ্ট) সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতার মাধ্যমে প্রযুক্ত হয়।

বংশগতি বাহক পদার্থ : নিউক্লিক অ্যাসিড

ক্রোমোসোম প্রধানতঃ দুই প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত— প্রোটিন এবং ডিঅক্সি রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড (deoxyribose nucleic acid বা DNA)। রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড বা আরএনএ (Ribose nucleic acid or RNA) নামক দ্বিতীয় আরেক প্রকারের নিউক্লিক অ্যাসিডও সামান্য পরিমাণে নিউক্লিয়াসে থাকে; তবে এটি (RNA) অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে থাকে সাইটোপ্লাজমে। ডি এন এ-সংশ্লেষণ এবং ক্রোমো-জোমের অবিকল প্রতিরূপ গঠন (chromosome replication) উপকোষীয় স্তরে (subcellular level) সাধারণ জনন প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং এখন আমরা নিশ্চিত রূপে জানি যে ক্রোমোজোমের ডি এন এ-ই হল মূল রাসায়নিক পদার্থ, এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বংশধারা রক্ষায় যার মুখ্য ভূমিকা। এই তত্ত্বের সমর্থনে পরে কয়েকটি পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো।

সকল জীবকোষের নিউক্লিয়াস থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ-ই একপ্রকার সূত্রাকার পদার্থ (thread-like) এবং এর আণবিক ওজন (particle

weight) প্রায় কয়েক কোটি। এর (ডি এন এ-র) রাসায়নিক সংযুতিতেও' যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যায় : কিন্তু এই বিভিন্নতা মূলতঃ কতিপয় সরল

পিউরিন ক্ষারক দ্বয়
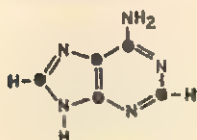
এডিনিন (A)
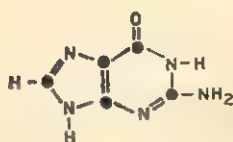
গুয়ানিন (G)

পাইরিমিডিন ক্ষারকত্রয়
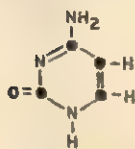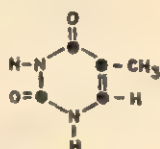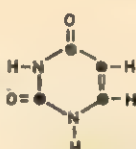
সাইটোসিন (C) থাইমিন (T) ইউরাসিল (U)

পেন্টোজ শর্করা দ্বয়
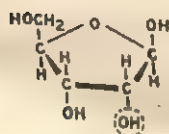
রাইবোজ
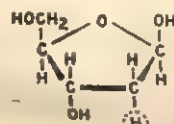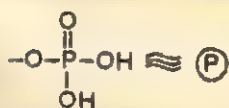
ডিঅক্সি রাইবোজ

ফসফেট মূলক

চিত্র ঃ ৯-২

ডি এন এ এবং আর এন এ-র উপাদান সমূহ। এডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন এই চারটি ক্ষারক দ্বারা গঠিত হয় ডি এন এ। আর এন এ-তে থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল। আর এন এ-তে থাকে রাইবোজ শর্করা, আর ডি এন এ-তে ডিঅক্সি রাইবোজ। ফসফেট মূলক উভয়েরই উপাদান।

রাসায়নিক যৌগ, যথা—পিউরিন এবং পাইরিমিডিন ক্ষারকদের (Purine & Pyrimidine bases) বিন্যাসের দরুণ হয়ে থাকে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ৯-২ নং চিত্রে দুটি পিউরিন ক্ষারক অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন এবং তিনটি পাইরিমিডিন ক্ষারক থাইমিন, সাইটোসিন এবং ইউরাসিলের রাসায়নিক গঠন (structure) দেখানো হয়েছে। একটি অখণ্ড নিউক্লিক অ্যাসিড অণুতে এই ক্ষারকগুলি একটি পাঁচ-কার্বন শর্করা, ২-ডিঅক্সি রাইবোজের সাথে যুক্ত থেকে গঠন করে একটি ডিঅক্সি নিউক্লিওসাইড (deoxynucleoside)। এই ডিঅক্সি নিউক্লিওসাইডগুলি ফসফেট মূলক দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে— এই সংযোগ গঠিত হয় একটি নিউক্লিওসাইডের তৃতীয় কার্বন (3-position) এবং অপরটির পঞ্চম কার্বনের (5-position) সাথে। ডি এন এ-কে আর্দ্র বিশ্লেষিত করা হলে প্রথম পর্য্যায়ে উৎপন্ন হয় ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিওটাইড (deoxyribo nucleotide)। অতএব, আমরা বলতে পারি ডিএনএ হল পলিনিউক্লিওটাইড, যার রাসায়নিক মেরুদণ্ড (chemical backbone) শর্করা অণুর মধ্যবর্তী ফসফেট এস্টার যোজক দ্বারা গঠিত। তাহলে, বিভিন্ন ডি এন এ অণুর রাসায়নিক সংযুতির বিভিন্নতা অবশ্যই নির্ভর করবে পিউরিন এবং পাইরিমিডিন ক্ষারকদের উপর। সাম্প্রতিক তথ্যাদি থেকে একথা বিশেষ জোরের সাথেই বলা চলে যে এই সকল ক্ষারকের পর্যায়ক্রমই (sequence) বিভিন্ন ডি এন এ-অণুর বংশগতি মূলক কার্যকারিতার মুখ্য নির্দ্ধারক। ডি এন এ-র বেশ কিছু সংখ্যক নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে ক্ষারকগুলো মোটেই বিশৃঙ্খল ভাবে থাকে না ; পিউরিন বেসের মোট সংখ্যা পাইরিমিডিন বেসের মোট সংখ্যার সমান হয় ; এ ছাড়াও এডিনিন ও থাইমিন থাকে সমপরিমাণে, তেমনি সম-পরিমাণে থাকে গুয়ানিন ও সাইটোসিন। কোন কোন ডি এন এ অণুতে এডিনিন ও থাইমিনের সামগ্রিক পরিমাণ গুয়ানিন ও সাইটোসিনের সামগ্রিক পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী হয় ; অন্যান্য ক্ষেত্রে আবার এর ঠিক বিপরীত সংযুতি দেখা যায়। যেহেতু ডি এন এ অণুতে নিউক্লিওটাইডদের প্রায় $১০^{২০০}$ রকম সমবায় (combinations) হতে পারে, অতএব পরবর্তী জেনারেশন গুলোতে আণবিক সংকেতরূপে ডি এন এ-র বার্তা প্রেরণের ক্ষমতা (potentiality) যার পর নাই অধিক। ডি এন এ-র পার্থক্যের দরুণ এই

'ক্ষমতা'র বিভিন্নতাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যখন আমরা দেখি যে জীবের প্রতিটি প্রজাতিরই স্বতন্ত্র ক্ষারক পর্যায়ক্রম আছে। যাহোক, এই ক্রম (order) অবশ্যই প্রজাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হবে। এখন যেহেতু জীব জগতে বিশ লক্ষেরও অধিক প্রজাতি আছে, অতএব অন্ততঃ তত সংখ্যক ডি এন এ অণু থাকা চাই, যাদের স্বকীয়তা নির্ভর করে কেবল ক্ষারক পর্যায়ক্রমের উপর।

ডি এন এ অণুতে ক্ষারকের জুটিবাঁধা (base pairing) সম্পর্কে এই বিধিনিষেধ এবং আরো অন্যান্য ভৌত তথ্যাদি (physical data) থেকে ওয়াটসন এবং ক্রিক ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ডি এন এ-র একটি ত্রি আয়তন মডেল

A-T জোড়: দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত

নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলে যুক্ত (A) (T) নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলে যুক্ত

G-C জোড়: তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত

নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলে যুক্ত (G) (C) নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলে যুক্ত
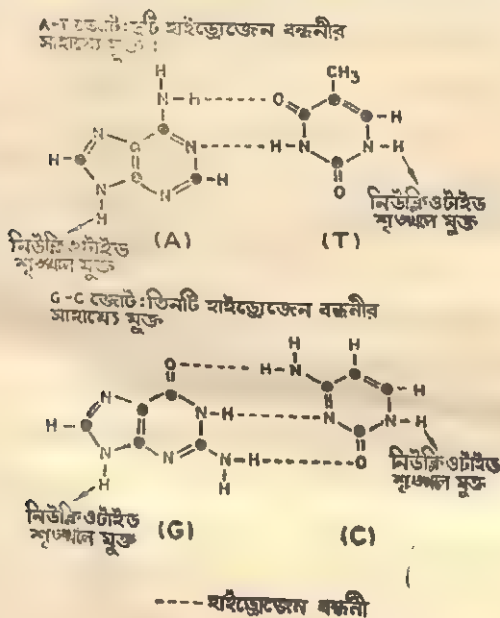
---- হাইড্রোজেন বন্ধনী

চিত্র ৯-৩

হাইড্রোজেন বণ্ডিং-এর সাহায্যে পিউরিন এবং পাইরিমিডিন ক্ষারকদের জোড়া গঠন (pairing)।

(Three-dimensional model) রচনা করেন। এর সম-আণবিক গঠন (uniform molecular pattern) দুটি ঘোরানো সিঁড়ির মতো কাঠামোয় (helical

structure) বিন্যস্ত দুটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত এবং এই শৃঙ্খল দুটি আবার ক্ষারকগুলির মধ্যেকার হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা বিধৃত। রাসায়নিক তথ্যাদি এবং ডি এন এ-হেলিক্সটির প্রতিসাম্য (symmetry of the helix) থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে এডিনিন-থাইমিন এবং গুয়ানিন-সাইটোসিন সমবায়ই হল আলোচ্য দুটো ক্ষারক যুগল, এবং একটি স্ট্র্যান্ডের ক্ষারক-কুল অপর স্ট্রান্ডের (partner strand) ক্ষারক পর্যায়ক্রম নির্দ্ধারণ করে। এই সকল ক্ষারক যুগলের হাইড্রোজেন বন্ধনী ৯-৩, ৯-৪ এবং ৯-৪ (a) নং চিত্রত্রয়ে দেখানো হয়েছে। ক্ষারকের এই জুটি বাঁধা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে একটি স্ট্র্যান্ডে যদি ক্ষারকগুলি AGAACT ক্রমে সাজানো থাকে তাহলে প্রতিপূরক স্ট্রান্ডে (Complementary strand)-র বিন্যাস হবে TCTTGA।

জীববিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ডিএনএ-র এই প্রস্তাবিত গঠন যথেষ্ট সন্তোষজনক ; কেননা এ পর্যন্ত যৎসামান্য যে কয়েকটি মডেল প্রস্তাবিত হয়েছে তার মধ্যে এটি একটি যার দ্বারা যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কীভাবে উপাদান সমূহ থেকে একটি জটিল এবং অতি সুনির্দিষ্ট অণুর প্রতিরূপ গঠন করা যেতে পারে (duplicating)। এই মডেলটির ভিত্তিতে আমরা ধরে নিই যে প্রতিরূপ গঠনের সময় প্রতিপূরক পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলগুলি আলাদা হয়ে যায় এবং ক্ষারকপুঞ্জ (base pool) থেকে প্রত্যেকেই নতুন সঙ্গী সংগ্রহ করে। নাইট্রোজেনের ভারী আইসোটোপ (N^{15}) নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে নতুন ডিএনএ-স্ট্র্যান্ড গঠিত হলে পুরনো স্ট্র্যান্ডের আর কোন বিভঞ্জন (degradation) হয় না—পরীক্ষার এই ফল 'পুরনো স্ট্র্যান্ড ছাঁচ (template) রূপে কাজ করে এবং পুরনো স্ট্র্যান্ডের উপর তখন গঠিত হয় নতুন স্ট্র্যান্ড' এই মতবাদের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

কর্ণবার্গ (Kornberg) ও তার সহকর্মীদের 'ডিএনএ-র মতো অণু'র এনজাইমীয় সংশ্লেষণের উপর গবেষণা বিশেষ উৎসাহ ব্যঞ্জক। এই গবেষণা থেকে জানা গেছে, যে এনজাইমটি ব্যবহার করা হচ্ছে বিক্রিয়ার প্রারম্ভে তাতে যে সামান্য পরিমাণ ডি এন এ থাকে তার দ্বারাই নবগঠিত পদার্থটির ক্ষারক যুগল গঠন নির্দ্ধারিত হয়। এই কোষ-মুক্ত সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় পিউরিন এবং পাইরিমিডিন ক্ষারকের অনুরূপ ট্রাইফসফেট

সমূহ (অর্থাৎ ডিঅক্সি এটিপি, টিটিপি, জিটিপি এবং সিটিপি), যথোপযুক্ত এনজাইম 'ডিএনএ-পলিমারেজ' এবং একটি ডিএনএ-প্রারম্ভক (DNA primer or starter)। এনজাইমটি ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেট সমূহের সংযুক্তি বিক্রিয়া (condensation reaction) অনুঘটিত করে এবং এই সঙ্গে উৎপন্ন করে পাইরোফসফেট (PP)। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নতুন ডিএনএ-টির ক্ষারকের আনুপাতিক হার (base ratio)
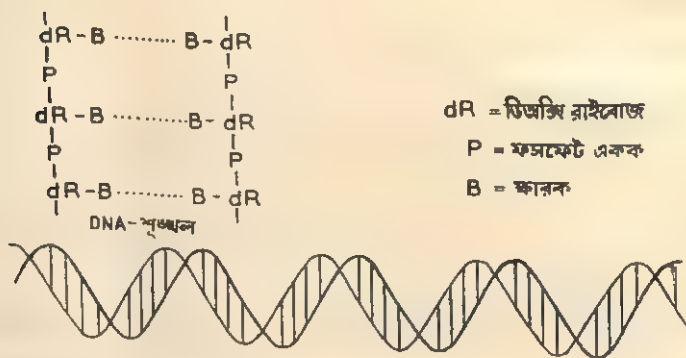
চিত্র ৯-৪ :

ডি এন এ অণুর এই নকশা চিত্রে ক্ষারকের জোড়া গঠন (base pairing) এবং ডি এন এর ঘোরানো সিঁড়ির মতো গড়ন (helical structure) দেখানো হয়েছে।

প্রারম্ভকটির ক্ষারকের আনুপাতিক হারের সমান হয়—এ থেকে স্পষ্টতঃই বলা যায় ডি এন এ প্রাইমারটি কোন না কোন উপায়ে নবগঠিত ডি এন এ-র রাসায়নিক পর্য্যায়ক্রম নির্দ্ধারণের ব্যাপারে কাজ করেছে। যদিও এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা জ্ঞাত জৈবিক গুণাবলী বিশিষ্ট কোন ডি এন এ তৈরী করতে সক্ষম হন নি, তবুও সাম্প্রতিক পরীক্ষা নিরীক্ষা একথা বিশেষ জোরের সাথেই সমর্থন করে যে ডি এন এ নিজের প্রতিরূপ গঠনের জন্য টেমপ্লেটরূপে কাজ করে।
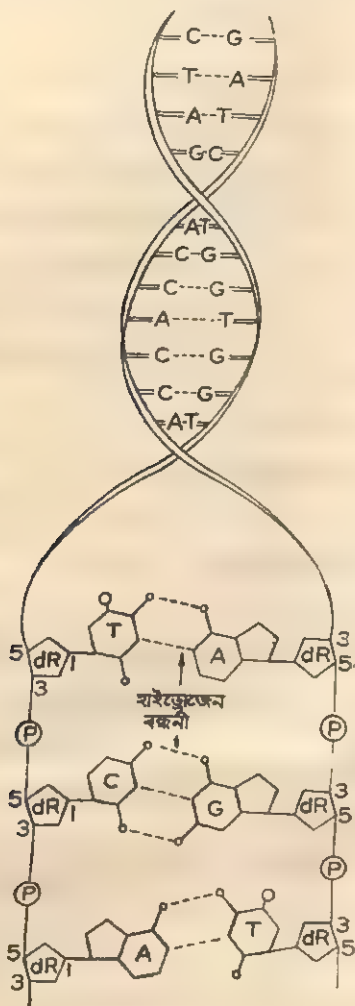
চিত্র ৯-৪ (a)

ডিএনএ-র প্রতিচিত্র ঃ

DNA-র ক্রিয়াকলাপ : বংশগতির নিয়ামক

কোষীয় বিপাক ক্রিয়ায় বংশগতি মূলক নির্ধারক (hereditary determinant) রূপে ডি এন এ-র ভূমিকার সম্ভবতঃ সর্বোৎকৃষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকটিরিয়ার রূপান্তর (transformation) সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষায়। এই সকল পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে এক জাতের ব্যাকটিরিয়ার ডি এন এ দ্বিতীয় কোন জাতের ব্যাকটিরিয়ার উত্তরাধিকার সূত্রে (বংশধারায়) প্রাপ্ত বিপাকীয় ক্ষমতা বদলে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, জীন রূপান্তর পদ্ধতিতে (mutational techniques) ম্যানিটোল (mannitol) ব্যবহার করতে অক্ষম এরকম এক জাতের নিউমোকক্কাস্ (pneumococcus) পৃথক করা সম্ভব হয়েছে এবং দেখা গেছে এই সকল ব্যাকটিরীয় কোষে ম্যানিটোল ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমটি থাকে না (এদের বলা হবে M^- কোষ)। ম্যানিটোল ব্যবহার করতে পারে এমন কোষ (M^+ কোষ) থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ M^- কোষের কোন কালচারে (culture) মেশানো হলে M^- কোষের অনেকগুলোই M^+ কোষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সকল কোষ থেকে উৎপন্ন সন্ততি কোষগুলি (the progeny) কিন্তু পূর্বোক্ত এনজাইমটি গঠনে সক্ষম হয়; এইরূপে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হল যে অন্য জাতের ডিএনএ-র প্রভাবে কোষের বংশধারাগত ক্ষমতা (hereditary capacity) স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। পরীক্ষার এই ফলাফল থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে ডি এন এ-স্থিত বংশবীজের (জেনেটিক পদার্থের) কিয়দংশ অন্ততঃ আশ্রয়দাতা কোষের (host) ক্রোমোসোমীয় গঠন কাঠামোর (chromosomal structure) অঙ্গীভূত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদার্থটি পরবর্তী জেনারেশনগুলিতে প্রতিরূপ গঠন করে (replicate)। কিন্তু এই ডিএনএ ঠিক কীভাবে একটি স্থায়ী কার্যকরী গঠন কাঠামোর (permanent functional structure) অঙ্গীভূত হয় তা আমাদের জানা নেই।

বংশধারাগত বৈশিষ্ট্যের (genetic character) রূপান্তর নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এখন আমরা সুনিশ্চিত যে ডিএনএ-ই হচ্ছে রূপান্তরকারী বস্তু (transforming agent)। এই সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা এই তত্ত্বটিও বিশেষ জোরের সাথেই সমর্থন করে যে এক পুরুষ (generation) থেকে অন্য পুরুষে

এনজাইম তন্ত্রের (enzymic machinery) সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী মুখ্য রাসায়নিক পদার্থটিও হচ্ছে এই ডিএনএ-ই।

সম্প্রতি ভাইরাস* ব্যবহার করে বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখানো সম্ভব হয়েছে যে ডিএনএ বংশগতির বার্তাবহ (genetic messenger) রূপে কাজ করে। ব্যাকটিরিওফাজ বা ব্যাকটিরীয় ভাইরাস সম্পর্কিত সাম্প্রতিককালের গবেষণা থেকে আমরা জানি এই সকল পরজীবী ভাইরাস তাদের প্রোটিন-আবরণীর (protein-coat) সাহায্যে প্রথমে নিজেদের ব্যাকটিরীয় কোষের সাথে যুক্ত (attached) করে এবং এর অব্যবহিত- পরেই ব্যাকটিরীওফাজের ডিএনএ আশ্রয়দাতা কোষটির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট (injected) হয়। ব্যাকটিরীয় কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফাজ ডিএনএ (phage DNA) বিপাকীয় যন্ত্রটির (metabolic machine) নিয়ন্ত্রণ নিজের আয়ত্তে আনে এবং নতুন ফাজ ডিএনএ ও ফাজ প্রোটিন তৈরী করা শুরু করে দেয়। অবশেষে ফাজ প্রোটিন ফাজ ডি এন এ-কে আবৃত করে গঠন করে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটিরিওফাজ (completed phage) এবং এ সমস্তই ঘটে আশ্রয়দাতা কোষটির নিজস্ব বিপাকীয় উপাদান সমূহের ব্যয়ে (metabolic expense)। ব্যাকটিরীওফাজের জীবন চক্রের একটি নকশা মূলক চিত্র নিম্নে দেখানো হয়েছে (চিত্র ৯-৫)। একথা এখন সুস্পষ্ট হ'ল যে একটি 'বহিরাগত' ডি এন এ (foreign DNA) কোষের সংশ্লেষণ ক্ষমতা (synthetic capacities) প্রভাবিত করতে পারে। এবং এইরূপ কোন পরিবর্তিত ডি এন এ (altered DNA) বা ভাইরাস ডি এন এ বহু রোগের উৎপত্তির কারণ হতে পারে।

---

*ভাইরাস: জড় ও নয়, জীব ও নয়—এদের গঠন খুবই সরল: একটি প্রোটিন আবরণীর (protein coat) অভ্যন্তরে থাকে একটি DNA বা RNA; ব্যস্। সাধারণ কোষের মত কোনো কোষ যন্ত্র এদের নেই। ফলে, স্বাভাবিক কোষীয় ক্রিয়াকলাপ কিছুই নেই এদের। একা একা বৃদ্ধি বা বংশ বিস্তার কিছুই করতে পারে না। তবে উদ্ভিদ বা প্রাণিকোষে সংক্রমণ করতে পারে এবং তখনই এদের বংশবিস্তার সম্ভব হয়—এজন্য এদের বলা হয় অন্তঃকোষীয় পরজীবী (intracellular parasite)
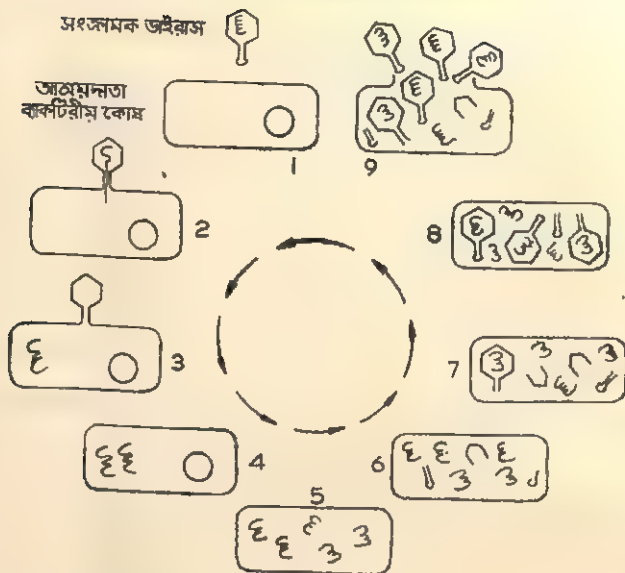
চিত্র ৯-৫ ঃ ব্যাকটিরীওফাজের জীবন চক্র ঃ

1. সংক্রামক ভাইরাসটি জীবাণুর (bacterium) দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

2. নিজের পুচ্ছের সাহায্যে ভাইরাস ব্যাকটিরীয় কোষ প্রাচীরের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে।

3. এইবার পুচ্ছের সংকোচনের মাধ্যমে ভাইরাস জীন (DNA বা RNA) জীবাণুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়।

4. ভাইরাস জীন জীবাণুর বিপাক যন্ত্রের উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং ব্যাকটিরীয় ক্রোমোজোম ভেঙ্গে যায়।

5. ভাইরাস জীন নিজের প্রতিরূপ গঠন করে।

6. ভাইরাস জীন এইবার ব্যাকটিরীয় কোষকে ভাইরাস-প্রোটিন তৈরী করতে প্রবৃত্ত করে।

7. ভাইরাস জীন প্রোটিন-আবরণী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করা শুরু করেছে।

8. অনেক পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস তৈরী হয়েছে ব্যাকটিরীয় কোষাভ্যন্তরে।

9. অবশেষে ব্যাকটিরীয় কোষপ্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং ভাইরাসগুলি নির্গত হয়ে আরো অনেক ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করতে থাকে।

ডি এন এ এবং আর এন এ-র পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation between DNA and RNA) :

ডি এনএ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি তা থেকে বলা যায় ডি এন এ সুনির্দিষ্ট প্রোটিন সমূহ সংশ্লেষণে কোষকে প্রবৃত্ত করতে পারে, যদিও এমন অনেক উদাহরণ আছে যেক্ষেত্রে ডিএনএর কোন রকম উপস্থিতি ছাড়াই প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটতে পারে। সাম্প্রতিক তথ্যাদি থেকে জানা যায় ডিএনএ আরএনএ'র সংশ্লেষণেও টেমপ্লেট (template) রূপে কাজ করে ; উৎপন্ন হওয়ার পর আর এন এ নিউক্লিয়াস ত্যাগ করে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং সেখানে (সাইটোপ্লাজমে) প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ নেয়।

ডিএনএ এবং আরএনএ-র মধ্যে উল্লেখযোগ্য রসায়নগত পার্থক্যও রয়েছে। যথা, আর এন এ-তে ক্ষারক কূলের (bases) সাথে যুক্ত পাঁচ-কার্বন শর্করাটি রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ নয়। পাইরিমিডিন ক্ষারক থাইমিনও আরএনএ-তে থাকে না, তার পরিবর্তে থাকে ক্ষারক ইউরাসিল (base Uracil)। তাহলে, যে ক্ষারক চতুষ্টয় দ্বারা আরএনএ গঠিত তারা হল : অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং ইউরাসিল। আরএনএ-র গঠন কাঠামোও ঘোরানো সিঁড়ির মতো (helical in structure) এবং এর নিউক্লিও-টাইড গুলিও মোটামুটি ডিএনএ-র মতো করেই সাজানো। সম্প্রতি দেখানো সম্ভব হয়েছে যে আরএনএ'র সংশ্লেষণে ডিএনএ টেমপ্লেট (template) রূপে কাজ করতে পারে। এই সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় চারটি ট্রাইফসফেট (এটিপি, ইউটিপি, জিটিপি এবং সিটিপি), ডিএনএ এবং এনজাইম আর এন এ-পলিমারেজ (RNA polymerase)। আরএনএ-র ক্ষারকগুলি ডি এন এর ক্ষারকদের সাথে জোড়া গঠন করতে পারে। এইরূপে, ডিএনএ-র ডাব্‌ল্‌ হেলিক্সের (double helix) দুটো স্ট্র্যান্ডে গুয়ানিন এবং সাইটোসিন জুটি বাঁধতে পারে. কিন্তু যখন ডি এন এ'কে টেমপ্লেট রূপে ব্যবহার করে আরএনএ সংশ্লেষিত হল তখন আরএনএর সাইটোসিন ডিএনএর গুয়ানিনের সাথে জুটি বাঁধে (এবং একথা বিপরীত ক্রমেও সত্য, অর্থাৎ এই জোট বাঁধা বিপরীতক্রমেও ঘটতে পারে)। এইরূপে, ডিএনএ আরএনএ-প্রতিরূপ (RNA-copy) গঠনের জন্য টেমপ্লেট রূপে কাজ করতে

পারে ; এই প্রতিরূপে থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত (inherited) একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষারক পর্যায়ক্রম। পরে আমরা দেখবো, এই সুনির্দিষ্ট আরএনএটি একটি সুনির্দিষ্ট পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠনের জন্য টেমপ্লেট রূপে কাজ করতে পারে।

প্রোটিন সংশ্লেষণ ঃ জেনেটিক সংকেত পদ্ধতি

প্রোটিনের গঠন ভঙ্গিমা ও তার সাথে এনজাইমীয় ক্রিয়াকলাপের (enzymatic activities) পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়ছে কোষ কর্তৃক প্রোটিন সংশ্লেষণের বিষয়টিও ততই পরিষ্কার হচ্ছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার থেকে এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ডিএনএ-র ক্ষারক চতুষ্টয় দ্বারাই জেনেটিক সংকেত পদ্ধতির (genetic code) বর্ণমালা (letters) গঠিত। এই ক্ষারকগুলির তথা সাংকেতিক অক্ষর গুলির (code letters) বিভিন্ন রকম সমবায়ই প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য কোষকে সুনির্দিষ্ট প্রাণরাসায়নিক নির্দেশনা (specific biochemical information) জ্ঞাপন করে। স্পষ্টতঃই প্রোটিন শৃঙ্খলে কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রত্যেকটিরই যথোপযুক্ত স্থান এই সাংকেতিক অক্ষরগুলির (code letters) এক একটি পর্য্যায়ক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট হয় ; এক একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের নির্দিষ্টকরণের জন্য কোন পর্য্যায়ক্রমের (sequence) অন্ততঃ তিনটি ক্ষারক অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়। কুড়িটি শব্দ (অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিড) বিশিষ্ট একটি শব্দকোষ গঠনের নিমিত্ত আমাদের যদি বর্ণমালায় কেবল চারটি বর্ণ (ক্ষারক এ, টি, জি এবং সি) থাকে তাহলে প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিড চিহ্নিত করতে অবশ্যই আমরা অন্ততঃ তিনটি করে বর্ণ (তিনটি ক্ষারক) ব্যবহার করবো। দুটি করে ক্ষারক ব্যবহার করলে আমরা কেবল ষোলটি (৪×৪=১৬) সাংকেতিক শব্দ (code words) পাবো ; কিন্তু তিনটি করে ক্ষারক ব্যবহার করলে পাবো মোট চৌষট্টিটি (৪×৪×৪) সাংকেতিক শব্দ। অতএব যদি কোন প্রোটিনে ১০০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড একক (subunits) একটি সুনির্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রমে যুক্ত থাকে তবে ঐ বিশেষ প্রোটিনটির সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণকারী জীনে অবশ্যই ১০০টি সাংকেতিক শব্দ অর্থাৎ ১০০ × ৩ বা ৩০০টি ক্ষারক একটি সুনির্দিষ্ট রৈখিক বিন্যাসে (specific linear arrangement)

থাকবে। পলিপেপটাইড শৃঙ্খলে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির যথাযথ অবস্থান প্রাপ্তির জন্য প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রণালীতে নিউক্লিক অ্যাসিডের এই সাংকেতিক শব্দগুলি অবশ্যই অধীত এবং অনূদিত (read & translated) হওয়া চাই।

বিভিন্ন কোষের প্রোটিন বিভিন্ন রকমের। অতএব প্রত্যেক কোষকেই নিজ নিজ সুনির্দিষ্ট প্রোটিনগুলি যথোপযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড একক থেকে তৈরী করে নিতে হয়। এই সুনির্দিষ্ট প্রোটিন সমূহ তৈরীর জন্য নির্দেশ সঞ্চিত রয়েছে ক্রোমোজোমের জেনেটিক সংকেতে (DNA-তে)। DNA কিন্তু রয়েছে নিউক্লিয় আবরণী দ্বারা বেষ্টিত নিউক্লিয়াসের সুরক্ষিত অভ্যন্তরে, যাতে সাইটোপ্লাজমের এনজাইম সমূহ DNA-র কোন ক্ষতি না করতে পারে। এদিকে প্রোটিন তৈরীর কারখানা হ'ল সাইটোপ্লাজমের রাইবোজোম। সুতরাং DNA-র নির্দেশ এক বিশেষ বার্তাবহ (m-RNA) নিউক্লিয়াস থেকে রাই-বোজোমে নিয়ে যায়, যে নির্দেশ অনুযায়ী অ্যামিনো অ্যাসিড সাজিয়ে প্রোটিন তৈরী হয় রাইবোজোমে।

অ্যামাইনো অ্যাসিড সক্রিয়করণ (Amino acid activation):

প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রথম ধাপটি হ'ল কোষের সাইটোপ্লাজমে 'বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ সমূহের' অসমসত্ত্ব মিশ্রণ থেকে সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির নির্বাচন। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় অ্যামিনো অ্যাসিড সক্রিয়ক এনজাইমদের দ্বারা—এর ফলস্বরূপ উৎপন্ন হয় অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাডিনাইলেট যৌগসমূহ (Amino acid adenylates) [চিত্র ৯-৬ দ্রষ্টব্য]। অ্যামিনো অ্যাসিডের এই সক্রিয়করণের জন্য এটিপি (শক্তি)-র প্রয়োজন হয়। প্রোটিনের অঙ্গীভূত বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রতিটির জন্যই অন্ততঃ একটি করে অনন্য সাধারণ সক্রিয়ক এনজাইম আছে এবং এই এনজাইমের ক্রিয়াপথ এতই সুনির্দিষ্ট যে প্রোটিন সংশ্লেষণে ভুলচুক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

অভিযোজক আর এন এ বা ট্রান্সফার আর এন এ (t-RNA—The Adaptor) :

সক্রিয়করণের ধাপটি শেষ হওয়ার পর উদ্দীপিত (activated) অ্যামিনো অ্যাসিডটি এনজাইমের উপরই সুদৃঢ় রূপে সংবদ্ধ থাকে। এর
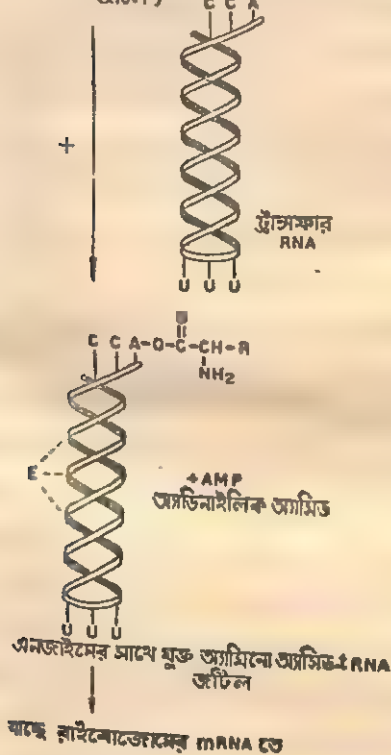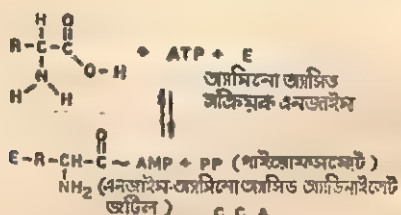
চিত্র ৯-৬

প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য অ্যামিনো অ্যাসিডের সক্রিয়করণ।

পরবর্তী ধাপে একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোজক (adaptor) আর এন এ অণুর সাথে অ্যামিনো অ্যাসিডটির সংযুক্তি (attachment) ঘটে। এই ক্ষুদ্র, দ্রবণীয় আর এন এ অণুটিকে নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা—দ্রবণীয় (s অর্থাৎ soluble), স্থানান্তরকারী (t অর্থাৎ transfer) বা অভিযোজক (adaptor) আর এন এ। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য সুনির্দিষ্ট এস-আর এন এ'র (sRNA) কেবলমাত্র একটিই প্রকারভেদ (species) পাওয়া গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর t-RNA-র (যার সাথে একক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত) অস্তিত্ব জেনেটিক সংকেতোদ্ধার (coding) প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একথা আমরা একটু বাদেই আলোচনা করবো।

t-RNA বা এস-আর এন এ (sRNA) প্রায় সত্তর-আশিটি নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত একটি একক শৃংখল (a single chain)—এই শৃংখলের একটি অংশ অপর অংশটির উপর যেন ভাঁজ করা অবস্থায় (folded) থাকে এবং সিঁড়ির আকৃতিতে (helical configuration) হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা বিধৃত। এস-আর এন এর আণবিক ওজন প্রায় পঁচিশ হাজার ডাল্টন। সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যন্তভাগের (অর্থাৎ t-RNA-র যে প্রান্তে অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়) নিউক্লিওটাইড পর্যায়ক্রম হ'ল 'অ্যাডিনাইলিক-সাইটিডাইলিক-সাইটিডাইলিক' (A-C-C)। সক্রিয়করণ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন 'অ্যামিনো অ্যাসিড-অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড জটিলের' সাথে t-আর এনএ-র মিথষ্ক্রিয়ায় (interaction) t-আর এনএ-র প্রান্তীয় অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিডস্থ রাইবোজ অণুর দ্বিতীয় বা তৃতীয় কার্বনে অ্যামিনো অ্যাসিডটি স্থানান্তরিত হয় (চিত্র ৯-৬ দ্রষ্টব্য)।

গঠন ভঙ্গিমার দিক থেকে সকল এস-আর এন এ-কেই (s-RNA) মোটের উপর একই রকম মনে হলেও বহু পরোক্ষ প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রতি শ্রেণীরই কিছু না কিছু অদ্বিতীয় গঠনমূলক বৈশিষ্ট্য (unique structural characteristics) আছে এবং কোন বিশেষ একটি সক্রিয়ক এনজাইমের জন্য তা সুনির্দিষ্ট। গবেষণা থেকে জানা গেছে যে এস-আর এনএ অণুগুলিতে অবশ্যই এক বিশেষ প্রকারের ক্ষুদ্র পর্যায়ক্রম (special short sequence) আছে (যাকে বলা হবে 'anticodon') যার সাহায্যে এস-আর এনএ প্রোটিন সংশ্লেষণ কেন্দ্রে বার্তাবহ-আরএনএর উপর যথোপযুক্ত অনুপূরক

ক্ষারক ক্রম বেছে নিয়ে সঠিক অ্যামিনো অ্যাসিডটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের নির্দিষ্টস্থানে জুড়ে দিতে পারে।

•

রাইবোজোম (Ribosomes) ঃ r-RNA

প্রোটিন সংশ্লেষণ ক্ষেত্রে 'অ্যামিনো অ্যাসিড-এস-আরএনএ' জটিল সমূহ (complexes) পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠনের জন্য কাঁচামাল (raw material) রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিন সংশ্লেষণের জীবরাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত একপ্রকার ছোট ছোট দানার বা রাইবোজোমের (Ribosomes) উপর সংঘটিত হয়। এই রাইবোজোমে শতকরা প্রায় ষাট ভাগ আরএনএ এবং চল্লিশ ভাগ প্রোটিন থাকে। ব্যাকটিরিয়ায় সাইটোপ্লাজমের সর্বত্রই রাইবোজোম থাকে, কিন্তু উন্নততর জীবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাইটোপ্লাজমের নলাকৃতি লিপোপ্রোটিন পর্দার (tubular lipoprotein membranes) পৃষ্ঠদেশে যুক্ত অবস্থায় রাইবোজোম পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে এই পর্দাতন্ত্র (membrane system)-কে বলা হয় এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (endoplasmic reticulum)। অনেক পরোক্ষ উপায়ে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে রাইবোজোমই হ'ল প্রোটিন সংশ্লেষণের ক্ষেত্র (site for protein synthesis) ; সম্প্রতি অন্যান্য কোষীয় উপাদান মুক্ত রাইবোজোমীয় কণার পৃথকীকরণ থেকে এর আরো জোরালো সমর্থন পাওয়া গেছে। এইসকল পৃথকীকৃত (isolated) রাইবোজোম উপযুক্ত পরিবেশে 't-আরএনএ-অ্যামিনো অ্যাসিড জটিল' (t-RNA-AA Complex) থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড সংগ্রহ করে পলিপেপটাইড শৃঙ্খলে সংযুক্ত করতে পারে। রাইবোজোমের গঠন ভঙ্গিমা বেশ জটিল প্রকৃতির এবং এরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নিষ্ক্রিয় উপএককে (smaller inactive subunits) বিয়োজিত হতে পারে। রাইবোজোমীয় আরএনএ (r-RNA) বা রাইবোজোমের গঠনমূলক আরএনএ (structural RNA)-র ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের প্রায় কিছুই জানা নেই ; তবুও একথা সঙ্গত কারণেই মনে হয় যে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড পর্যায়ক্রম নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে এই আরএনএ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। তবে r-RNA নিউক্লিয়াস থেকে DNA-র বার্তা নিয়ে আগত m-RNA যাতে

রাইবোজোমের উপর যথাযথভাবে অবস্থিত (correctly aligned) হতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা করে।

একটি বার্তাবহ-RNA (m-RNA) এক বা একাধিক রাইবোজোম দানার পৃষ্ঠদেশে (surface-এ) অবস্থিত হতে পারে। এইভাবে একাধিক রাইবোজোম একসঙ্গে একটি m-RNA থেকে একটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠন করতে পারে। সেক্ষেত্রে এই রাইবোজোম গুচ্ছকে বলা হয় পলি রাইবোজোম বা পলিজোম (Polyribosome or polysome)।

বার্তাবহ আর এন এ বা এম-আরএনএ (m-RNA)

গবেষণা থেকে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে এক বিশেষ শ্রেণীর আরএনএ অণু ছাঁচ (template) হিসাবে কাজ করে যার উপর প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। এদের বলা হয় বার্তাবহ আর এন এ বা মেসেঞ্জার আর এনএ (messenger RNA or m-RNA); কেননা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এই মেসেঞ্জার আরএনএ-রা হল রাইবোপলিনিউক্লিওটাইড যৌগ এবং ডিএনএ নিহিত বংশধারাগত বার্তার (genetic messages) প্রত্যক্ষ প্রতিবাহক। কোষের বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডের (DNA এবং RNA) একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সারণী ৯-১-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৯-১ঃ নিউক্লিক অ্যাসিড সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নিউক্লিক অ্যাসিড	অণুর গঠন ভঙ্গিমা	অবস্থিতি	ক্রিয়াকলাপ
DNA ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড	ঘোরানো সিঁড়ির মতো ডাবল হেলিক্স (double helix), বেশ কয়েক হাজার নিউক্লিওটাইড একক দ্বারা গঠিত অতিকায় অণু।	মুখ্যতঃ নিউক্লিয়াসে, মাইটোকনড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টে কখনও সখনও পাওয়া যায়।	মাস্টার মলিকুল (master molecule)—কোষের যাবতীয় প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য নির্দেশ আসে DNA-স্থিত codon থেকে।

নিউক্লিক অ্যাসিড	অণুর গঠন ভঙ্গিমা	অবস্থিতি	ক্রিয়াকলাপ
m-RNA বার্তাবহ-RNA	একটি মাত্র স্ট্র্যান্ড বিশিষ্ট পলি-নিউক্লিওটাইড। বেশ কয়েক শত নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত।	নিউক্লিয়াস এবং সাইটো-প্লাজমে, বিশেষতঃ রাইবোজোমে।	DNA-কে টেমপ্লেট (ছাঁচ) হিসেবে ব্যবহার করে গঠিত হয়, DNA-র নির্দেশ নিয়ে এক বা একাধিক প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য নিউ-ক্লিয়াস থেকে রাইবো-জোমে আসে।
t-RNA ট্রান্সফার RNA	সত্তর-আশিটি নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত একক স্ট্র্যান্ড বিশিষ্ট পলি নিউক্লিও-টাইড।	সাইটোপ্লাজমে	বিভিন্ন প্রকারের t-RNA অ্যামিনো অ্যাসিড বাহক (a a carriers) রূপে কাজ করে। সাইটো-প্লাজম থেকে সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডটি রাইবোজোমস্থ m-RNA টেমপ্লেটে নিয়ে যায়।
r-RNA রাইবোজোমীয় রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড।	রাইবোজোমের প্রোটিন-অংশের সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত।	কেবলমাত্র রাইবোজোমে	রাইবোজোমের গঠন-মূলক অঙ্গ বিশেষ। mRNA-কে রাইবো-জোমে যথাযথভাবে অবস্থিত হতে সাহায্য করে।

গবেষকরা দেখিয়েছেন মেসেঞ্জার আর এন এ-র সংশ্লেষণ অনুঘটিত করে আর এন এ-পলিমারেজ নামক একটি এনজাইম এবং এই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রারম্ভিক পদার্থ (primer) রূপে ডি এন এ-র দরকার হয় (চিত্র ৯-৭ দ্রষ্টব্য)। এ সম্পর্কিত গবেষণা থেকে আরো জানা গেছে এনজাইমটি খেয়ালখুশি মতো

নিউক্লিওটাইডদের সংযুক্ত করে না বরং ডি এন এ-র ক্ষারক পর্য্যায় ক্রমের কোন পছন্দসই প্রতিরূপ (preferential copy)-এর গঠন সাধিত করে। সকল মেসেঞ্জার আর এনএ-ই কিন্তু ডি এন এ-কে ছাঁচ (টেমপ্লেট) রূপে ব্যবহার করে গঠিত হয় না। নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ভাইরাসে জেনেটিক পদার্থরূপে ডি এন এ-র পরিবর্তে থাকে আর এন এ এবং সম্ভবতঃ এই আর এন এ-ই ভাইরাস প্রোটিন সংশ্লেষণে প্রত্যক্ষভাবে বার্তাবহ (messenger) রূপে কাজ করে।

সংশ্লেষিত হবার পর মেসেঞ্জার আর এন এ তার ছাঁচ (টেমপ্লেট) পরিত্যাগ করে এবং রাইবোজোমের উপরিভাগে অবস্থিত (absorbed) হয়। প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য এই 'মেসেঞ্জার আর এন এ-রাইবোজোম' জটিলই সক্রিয় একক (active unit) রূপে কাজ করে। এখন যদি এই জটিল যৌগে সেই কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড, বিভিন ট্রান্সফার আর এন এ (t-RNA's), এটিপি এবং সক্রিয়ক এনজাইম সমূহ (activating enzymes) যোগ করা হয় তবে একটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের সংশ্লেষণ সংঘটিত হবে। এই পলিপেপটাইড গঠনে আরো কিছু এনজাইম এবং গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট (GTP)-ও প্রয়োজন হয়—যদিও এদের (অতিরিক্ত এনজাইমদের এবং GTP-র) কার্যপ্রণালী এখনও আমাদের অজ্ঞাত।

পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে সুনির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য মেসেঞ্জার আর এনএ-ই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট টেমপ্লেট এবং বিভিন্ন প্রকারের বহু সংখ্যক প্রোটিনের গঠনে সক্রিয়ক এনজাইম সমূহ এবং ট্রান্সফার আর এন এ বারংবার ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ এব্যাপারে সর্বাধিক আলোকপাত করেছেন বিজ্ঞানী নীরেন বার্গ (Nirenberg); তিনি তার পরীক্ষা সমূহে ব্যবহার করেছেন কৃত্রিম মেসেঞ্জার (synthetic messengers)। এনজাইম পলিনিউ-ক্লিওটাইড ফসফোরাইলেজ এবং যথোপযুক্ত নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট সমূহ ব্যবহার করে কৃত্রিম রাইবোপলিনিউক্লিওটাইড তৈরী করা যেতে পারে। পলিনি-উক্লিওটাইড ফসফোরাইলেজ সম্ভবতঃ সচরাচর আর এন এ-কে ডিগ্রেড করবার কাজটিই সমাধা করে। বিক্রিয়াজাত পদার্থটির সংযুতি (composition) প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই নির্ভর করে নিউক্লিওটাইডদের ঘনত্বের উপর। যাহোক, কেবলমাত্র ইউরাসিল দ্বারা গঠিত একটি পলিমার (পলি ইউরিডাইলিক অ্যাসিড
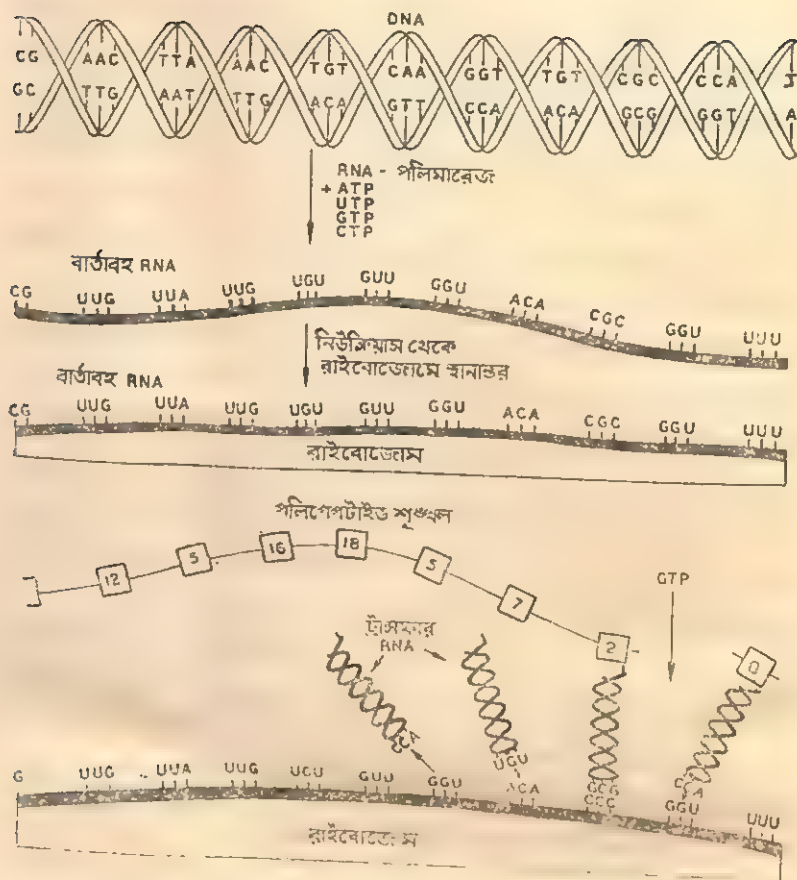
চিত্র ৯-৭

প্রোটিন সংশ্লেষণে ডি এন এ এবং আর এন এ-র ভূমিকার একটি নকশা চিত্র।

প্রোটিন সংশ্লেষণে DNA এবং RNA-র ভূমিকা :

(ক) প্রথমে ডি এন এ ডাবল্ হেলিক্সের প্যাঁচ খুলে যায় (unwinding) এবং দুটো স্ট্র্যাণ্ডের মধ্যেকার হাইড্রোজেন বন্ধনী খুলে গিয়ে (unzipping) একটি স্ট্র্যাণ্ড (sense strand) mRNA তৈরীর জন্য টেমপ্লেট রূপে কাজ করতে উন্মুক্ত হয়।

(খ) mRNA সংশ্লেষণ সম্পূর্ণ হলে ওটি নিউক্লিয়াস ত্যাগ করে রাইবোজোম (বা পলিজোম)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

(গ) r-RNA-র সহায়তায় m-RNA নিজেকে রাইবোজোমে (বা পলিজোমে) যথাযথভাবে স্থাপিত করে।

(ঘ) এইবার t-RNA-রা m-RNA-তে মুদ্রিত জেনেটিক সংকেত অনুযায়ী ঠিক ঠিক অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো এনে দেয়।

(ঙ) অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো তখন পেপটাইড যোজকের সাহায্যে জুড়ে গিয়ে একটি পলিপেপটাইড শৃংখল রচনা করে।

(চ) পলিপেপটাইড শৃংখল (অর্থাৎ প্রোটিন) সংশ্লেষণ সমাপ্ত হলে ওটি এবার রাইবোজোম পরিত্যাগ করে এবং m-RNA স্ট্র্যাণ্ডটি আরেকটি ঐরকম প্রোটিন অণু তৈরীর জন্য প্রস্তুত হয়।

বা পলি ইউ) সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রোটিন সংশ্লেষণে অপরিহার্য অন্যান্য উপাদানসহ পলি ইউ (Poly U) রাইবোজোমীয় তন্ত্রে যোগ করা হলে দেখা গেছে কেবলমাত্র ফিনাইলঅ্যালানিনই পলিপেপটাইড শৃংখলের অংগীভূত (incorporated) হচ্ছে। অতএব, একথা পরিষ্কার রূপেই প্রতীয়মান হয় যে এই অ্যামিনো অ্যাসিডটির ত্রিপদী সংকেত (Triplet code) টি হল 'ইউ ইউ ইউ' (U U U)। অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিডের জেনেটিক কোড অনুবাদের ব্যাপারেও এই পদ্ধতি (system) টি বিশেষ উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। পলি সি (C C C) অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোলিনের কোড বলে প্রতীয়মান হয়: তেমনি সিসিজি (C C G) অ্যালানিনের কোড, গুয়া (GUA) অ্যাসপারটিক অ্যাসিডের, এসিসি (ACC) হিস্টিডিনের, ইত্যাদি।

এইরূপে, কোন প্রোটিনের পলিপেপটাইড শৃংখলে অ্যামিনো অ্যাসিডের সুনির্দিষ্ট অবস্থান এবং বিন্যাস (specific organisation & alignment) মেসেঞ্জার আর এন এ-র ক্ষারক পর্যায়ক্রম দ্বারা সুনির্দিষ্ট হয়; আবার এই মেসেঞ্জার আর এন এ-র ক্ষারক পর্যায় ক্রম হল গিয়ে জীন (ডি এন এ)-এর ক্ষারক পর্যায় ক্রমেরই প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ (direct reflection)।

t-আর এন এ হল একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোজক অণু (adaptor molecule) এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ কেন্দ্রে একটি সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এই *t*-আরএন এ-র ই। পলিপেপটাইড শৃংখলের বৃদ্ধির (growth) জন্য (অর্থাৎ পেপটাইড
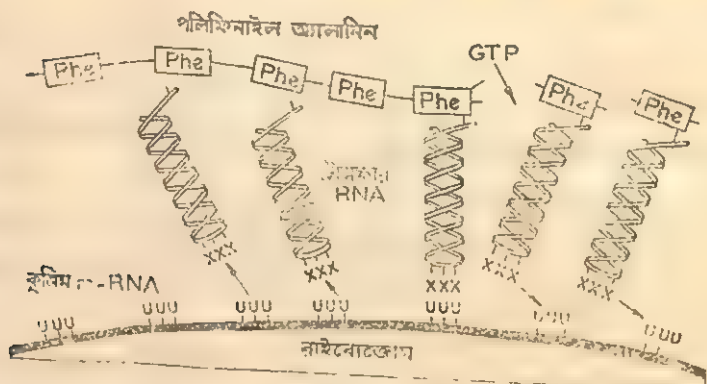
চিত্র ৯-৮

একমাত্র ক্ষারক ইউরাসিল দ্বারা গঠিত (পলি-ইউ) কৃত্রিম আর এন এ যে কৃত্রিম প্রোটিনটির গঠন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে তাতে থাকে কেবলমাত্র একটিই অ্যামিনো অ্যাসিড, ফিনাইল অ্যালানিন (Phe)—এই আবিষ্কারই হল জেনেটিক কোডের প্রথম সূত্রোদ্ধার। এখানে ট্রান্সফার আর এন এ-র 'X' গুলো নির্দেশ করে যে মেসেঞ্জার আর এন এ বাহিত সাংকেতিক শব্দগুলি সঠিকভাবে চিনে নেয় যে ক্ষারকগুলো তা আমাদের অজ্ঞাত। (নীরেন বার্গের মতানুসারে)।

বন্ড গঠনের জন্য) জিটিপি এবং আরো অন্যান্য এনজাইম দরকার হয়। পলিপেপটাইড শৃংখলের গঠন সম্পূর্ণ হলে ওটি রাইবোজোম ত্যাগ করে এবং

সক্রিয় কুণ্ডলাকার গঠন (folded active configuration) প্রাপ্ত হয়। এই কুণ্ডল গঠন (folding) পদ্ধতিটি সম্পর্কে এখনো অনেক কিছু অনাবিষ্কৃত আছে ; প্রকৃতপক্ষে কোষ-বহির্ভূত প্রোটিন সংশ্লেষণের (cell-free protein synthesis) সাধারণ প্রণালীটির বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এখনো অজ্ঞাত। তবুও এই আদর্শ নকশা প্রণালীটি (model) জেনেটিক বা 'বংশধারায় বাহিত হওয়ার যোগ্য' বহু পরিবর্তন (বা মিউটেশন) প্রক্রিয়ার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে। ডি এন এ-র কোন ক্ষারকের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের (specific change) দরুণ মিউটেশন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় বলে মনে করা হয় ; এই পরিবর্তন, অবধারিতরূপেই, মেসেঞ্জার আরএন এ-তে প্রতিফলিত হয় এবং অবশেষে প্রোটিনে। সিক্‌ল্-সেল অ্যানীমিয়া (sickle-cell anemia) গ্রস্ত লোকের হিমোগ্লোবিনে এই রকম ঘটতে দেখা যায়। সিক্‌ল-সেল রক্তশূন্যতা বংশানুক্রমে 'একক জীন বিভেদ' (single gene difference) রূপে বাহিত হয় এবং এই রোগে ভুগলে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির হিমোগ্লোবিন সাধারণ হিমোগ্লোবিনের থেকে তড়িৎ বিভাজনে (electrophoretically) ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। এই পরিবর্তিত হিমোগ্লোবিনের অ্যামিনো অ্যাসিড পর্য্যায়ক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে একটি বিশেষ 'গ্লুটামিক অ্যাসিড অবশেষ' ভ্যালিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, এবং এইটুকু পরিবর্তন (alteration) মিউটেশন জনিত রোগটি ব্যাখ্যা করবার পক্ষে যথেষ্ট। অ্যামিনো অ্যাসিড পর্যায়ক্রমে কোন রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে জীন মিউটেশন 'প্রোটিন-প্রভেদ' (Protein difference) সৃষ্টি করতে পারে কিনা আরো গবেষণা না হলে তা জানা সম্ভব নয়।

প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা এবং সমাপ্তি

পলিপেপটাইড শৃংখল সংশ্লেষণের শুরুতেই একটি বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়, কেননা অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো মূলক বা কার্বোক্সিল মূলক উভয় দিক দিয়েই পেপটাইড বন্ধনী গঠন করতে পারে। ই. কলি. (E. Coli) ব্যাকটিরিয়াতে দেখা গেছে অধিকাংশ প্রোটিনেই নাইট্রোজেন-প্রান্তিক (N-terminal) অ্যামিনো অ্যাসিডটি হল মেথায়োনিন (methionine)।

স্বতন্ত্র কোনো তন্ত্রে (isolated system) দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে, N-ফরম্যাইল মেথায়োনিন-ই হল পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের প্রারম্ভিক অ্যামিনো অ্যাসিড। এবং জৈবতন্ত্রে (in vivo) সংশ্লেষণ হলে পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি রাইবোজোম থেকে ছাড়া পাবার পরই ঐ ফরম্যাইল মূলকটি (formyl group) অপসারিত হয়ে যায়। আমরা জানি, মেথায়োনিনের জেনেটিক সংকেত (codon) হ'ল AUG। মেথায়োনিন তার সুনির্দিষ্ট t-RNA অণুতে সংযুক্ত হলে ওর (মেথায়োনিনের) অ্যামিনো মূলকটিতে দ্রুত ফর্ম্যাইল সংযোগ (formylation) ঘটতে পারে। এর ফলে মেথায়োনিনের অ্যামিনো মূলকটির পেপটাইড বন্ধনী গঠনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ ওটি তখন কেবল কার্বোক্সিল প্রান্ত দিয়ে পেপটাইড বন্ধনী গঠন করতে পারবে। এইভাবে N-ফরম্যাইল মেথায়োনিন পলি পেপটাইড শৃঙ্খল সংশ্লেষণের সূচনা করতে পারে।

N-ফরম্যাইল মেথায়োনিন সর্বত্রই যে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল সূচনার কাজ করে তা নয়। কোনো কোনো জীবে অ্যাসিটাইল সেরীন (acetyl serine)-কে এই কর্তব্যটি পালন করতে দেখা যায়।

দেখা গেছে তিনটি জেনেটিক সংকেত UAA (ochre), UAG (amber) এবং UGA (umber) কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড নির্দেশ করেনা। এরা হ'ল পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের সমাপ্তি-সংকেত (chain terminating codons)। ঠিক কীভাবে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল সমাপ্ত হয় জানা যায়নি। তবে এমন হতে পারে যে উপরিউক্ত সংকেত তিনটির জন্য কোনো t-RNA নেই। ফলে, কোনো বর্দ্ধনশীল (growing) পলিপেপটাইড শৃঙ্খল যখন এই তিনটির কোনো একটি সংকেতে এসে পৌঁছোয় তখন পেপটাইড বন্ধনী গঠন বন্ধ হয়, কেননা t-RNA আর কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের যোগান দেয় না এবং পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি ব্যবহৃত শেষ t-RNA থেকে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে আলাদা হয়ে যায়।

ডি এনএ-র প্রতিরূপ গঠন এবং বংশাণুর রূপান্তর (DNA replication and gene mutation) ঃ

কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় (mitosis) একটি কোষ (mother cell) অবিকল তারই মতো দুটি অপত্য কোষের (daughter cell) সৃষ্টি করতে পারে। অপত্য কোষে জনক কোষের সমস্ত গুণাবলী ঠিক ঠিক থাকতে গেলে অপত্য কোষের বংশবীজটিকে (genetic material) অবশ্যই জনক কোষের বংশবীজের অবিকল প্রতিরূপ হতে হবে। অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে কোষ বিভাজনের সময় জনক কোষের DNA তার অবিকল দুটি প্রতিরূপ গঠন করে।

এই প্রতিরূপ গঠনের সময় DNA স্বয়ং টেমপ্লেট রূপে কাজ করে। প্রথমে ঘোরানো সিঁড়ির মতো DNA ডাবল হেলিক্সটির প্যাঁচ খুলতে থাকে (untwisting) এবং দুটি স্ট্র্যান্ড বরাবর হাইড্রোজেন বন্ধনীগুলো আলগা হয়ে ক্রমে ক্রমে স্ট্র্যান্ড দুটো আলাদা হয়ে যায় (unzipping)। এইবার একক স্ট্যান্ড দুটির প্রত্যেকেই ক্ষারক জুটি বন্ধনের (base-pairing) মাধ্যমে মুক্ত নিউক্লিওটাইডগুলিকে নিজেদের সঙ্গে সংলগ্ন করতে পারে এবং উপযুক্ত এনজাইমের সাহায্যে এই নিউক্লিওটাইডগুলোকে পরস্পর জুড়ে দিলেই গঠিত হয় নতুন একটি পরিপূরক স্ট্র্যান্ড (চিত্র ৯-৯)।

ডি এন এর প্রতিরূপ গঠন সাধারণতঃ নির্ভুল ভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো সখনো ডিএনএর গঠনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একে বলে বংশাণুর রূপান্তর বা জীন মিউটেশন (gene mutation)। টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড থেকে নতুন ডি এন এ স্ট্র্যান্ড গঠনের সময় নিউক্লিওটাইড সাজানোয় কোথায়ও কোন ভুল হয়ে গেলে সাধারণতঃ এই মিউটেশন হতে দেখা যায়।

নানা প্রকারের জীন মিউটেশন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন কোন একটি নিউক্লিওটাইড রাসায়নিকভাবে এমন ভাবে পরিবর্তিত হল যে প্রতিরূপ গঠনের সময় ওটি একটি অস্বাভাবিক (abnormal) ক্ষারক জোট গঠন করলো, ফলস্বরূপ ত্রিপদী সংকেতটি (triplet codon) যাবে বদলে। উদাহরণ স্বরূপ, অ্যাডিনিন টটোমারিজম (tautomerism)-এর ফলে আণবিক স্থাপত্য

চিত্র ৯-৯ :

ডি এন এ-র প্রতিরূপ গঠন

বদলে একটি অ-স্বাভাবিকরূপ (unusual form)-এ থাকতে পারে—এক্ষেত্রে আর স্বাভাবিক A-T জোট গঠিত হবে না, হবে A-C জোট ; অর্থাৎ নতুন
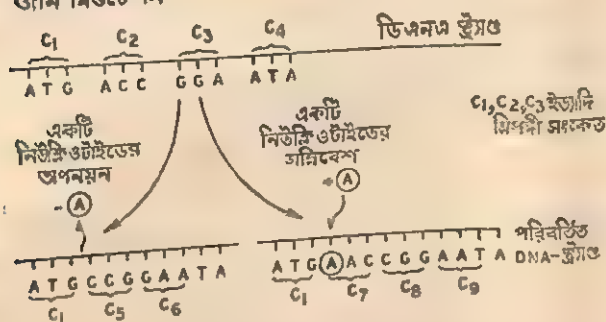
চিত্র ৯-১০

নিউক্লিওটাইড বাদ যাবার দরুণ বা নতুন নিউক্লিওটাইড সন্নিবেশ জনিত জীন মিউটেশন।

স্ট্র্যান্ডের ত্রিপদী সংকেতটি বদলে যাবে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিএনএ স্ট্র্যান্ডে এক বা একাধিক নতুন নিউক্লিওটাইড ভুলক্রমে সন্নিবিষ্ট হতে পারে বা বাদ যেতে পারে—এরকম হলে পুরো স্ট্র্যান্ডেরই ক্ষারক পর্যায়ক্রম বদলে যাবে (চিত্র ৯-১০)।

মিউটেশন স্বতস্ফূর্তভাবেই হয়ে থাকে, বিশেষতঃ পরিবেশের প্রভাবে, যেমন মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে। উচ্চ তাপমাত্রায়, তীক্ষ্ন রশ্মির আপতনের ফলে এবং কোনো কোনো রূপান্তরকারী রাসায়নিক পদার্থের (chemical mutagens) প্রভাবে মিউটেশন ত্বরান্বিত হয়।

অনেক অ্যামিনো অ্যাসিডের বেলাতেই দেখা গেছে যে একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য একাধিক কোডোন (codon) রয়েছে। যেমন, লিউসিনের জন্য আছে তিনটি কোডোন AUU, CUU, এবং GUU। এক্ষেত্রে মিউটেশনের ফলে একটি নিউক্লিওটাইড বদলে গেলে (A, C দ্বারা বা C, G দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে) প্রোটিন সংশ্লেষণের উপর কোন প্রভাবই পড়বে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মিউটেশনের ফলে প্রোটিন সংশ্লেষণে

মারাত্মক গোলমাল দেখা দেয় এবং কোষ সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রতিক্রিয়া যদি প্রাণঘাতী (lethal) না হয়, তাহলে এই মিউটেশন পরবর্তী জেনারেশন গুলোতেও বাহিত হয়। আর যদি জনন কোষে (reproductive cells) মিউটেশন হয়ে থাকে তাহলে সন্তানদের প্রত্যেক কোষেই এই পরিবর্তন বাহিত হবে। বংশধারায় প্রাপ্ত এই সকল পরিবর্তন থেকেই বিবর্তন প্রণালীতে (evolutionary mechanism) জীবজগতের অদ্ভুত সব বৈচিত্র্য আর জটিলতা উদ্ভূত হয়েছে।

সংশোধন : ১৮৬ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে 'জাক' স্থলে 'কাজ' হবে।

দশম পরিচ্ছেদ

কোষীয় বিপাক ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ

কোষের সক্রিয় গঠন কাঠামো—কোষীয় ক্রিয়াকলাপের এনজাইমীয় নিয়ন্ত্রণ—এনজাইম, কোএনজাইম, ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট অবস্থান—এনজাইমীয় ক্রিয়ার ফীডব্যাক নিবারণ—অ্যালোস্টেরিজম্—এনজাইম সংশ্লেষণ ঃ প্রবৃত্তকরণ এবং অবদমন—উপজাত ও উপাদানমূলক এনজাইম—জেকব-মোনোর অপেরণ-তত্ত্ব ঃ তিন ধরণের বংশবীজ—ল্যাক্‌টোজ অপেরণ—প্রোটিনের উপএকক, আইসোজাইম ও এনজাইমীয় সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ ঃ হরমোনের প্রভাব—পর্দা সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ—পারমিয়েজ তন্ত্র।

জীবনী শক্তির জন্য সকল কোষকে অবশ্যই কতগুলি জটিল বিক্রিয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। গ্লাইকোলাইটিক চক্র ও জারণ চক্র (glycolytic and oxidative cycles) এবং ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাক এইরূপে পরস্পর নির্ভরশীল কোষীয় ক্রিয়াকলাপের উদাহরণ। এছাড়াও রয়েছে কিছু বিশেষ ধরণের কোষ যারা সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করে থাকে। এই সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি (specific functions) সম্পন্ন করবার জন্য এদের শক্তির বড় একটা অংশ আসেও বিশেষ পথে, বিশেষ প্রণালীতে। কোষের অগণিত এনজাইম সমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন (regulation and co-ordination)-এর জন্য দরকার একটি সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (control mechanism) যার ফলে এই প্রক্রিয়া সমূহ একটি সুনির্দিষ্ট চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে। আজকের দিনের জীবকোষ-বিদ্‌গণ বর্তমানে কোষের সক্রিয় গঠনকাঠামো (active framework) সম্পর্কিত আমাদের বিচ্ছিন্ন জ্ঞানবত্তাকে একীভূত করার এক বিরাট প্রতি-

বন্ধকের সম্মুখীন হয়েছেন ; কেননা এই গঠন কাঠামোকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনীশক্তির প্রক্রিয়া সকল।

কোষীয় বিপাকক্রিয়া সম্পর্কিত আমাদের পূর্ব আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে বিক্রিয়ার হার (rate) এবং অভিমুখ (direction) উভয়ই বিক্রিয়ক (সাবস্ট্রেট) এবং এনজাইম অণুর আপেক্ষিক ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। এখানে কোষকে আমরা অবশ্যই সুবৃহৎ এক স্থিতিপ্রাপ্ত তন্ত্র (vast steady state system) বলে ধরে নেবো—যে তন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব কেবলমাত্র বিক্রিয়ক সমূহের ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে। ঈস্ট কোষের অশোধিত নির্যাস (crude extract) শর্করা ও শ্বেতসারের সন্ধান ক্রিয়া (fermentation) বিশেষ সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করে ; এক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদনের এবং অ্যালকোহল গঠনের হার কার্বোহাইড্রেট, ফসফেট, এটিপি, ডিপিএন প্রভৃতি বিক্রিয়কের ঘনত্ব পাল্টিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। স্পষ্টতঃই অখন্ড কোষেও (intact cell) এই একই প্রভাবক সমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব প্রয়োগ করবে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কোন পেশীকোষ (muscle cell) সহসা সংকুচিত হয়, এটিপি (ATP) ভেঙ্গে গিয়ে গঠন করে অজৈব ফসফেট এবং এডিপি (ADP)—কার্বোহাইড্রেট বিভঞ্জনে উদ্দীপনা (stimulation) যোগানোর জন্য এদের উভয়েই অপরিহার্য। অজৈব ফসফেট গ্লাইকোজেনের ফসফোরোলাইসিস (phospho-rolysis) প্রক্রিয়া উদ্দীপিত করে গঠন করে গ্লুকোজ-১-ফসফেট, আর এডিপি 'ট্রায়োজ ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ বিক্রিয়ায়' ফসফোরাইলেটেড (phosphorylated) যৌগ অপসারিত করবার কাজটি সম্পন্ন করে। এই রূপে পেশীকোষ বুঝতে পারে কখন তার সংকোচন ও প্রসারণের জন্য শক্তি দরকার আর প্রয়োজনে সে কাজটি করতেও পারে।

এই সকল সাবস্ট্রেট-প্রভাব (substrate effects) ছাড়াও গবেষণায় দেখা গেছে পরীক্ষানলে বিক্রিয়কসমূহ (সাবস্ট্রেট, এনজাইম ইত্যাদি) যত সহজে এবং তাড়াতাড়ি মিশ্রিত হতে পার, কোষে তত সহজে পারে না। এর কারণ কোষে এনজাইম সমূহ বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ আবেষ্টনীর (internal struc-tures) মধ্যে আবদ্ধ থাকে, এবং সম্ভবতঃ এর ফলেই সাবস্ট্রেট থেকে এনজাইম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, কার্বোহাইড্রেটের জারণমূলক

বিপাক এবং ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাকক্রিয়ার সাথে যুক্ত এনজাইম সমূহ থাকে কোষীয় একক মাইটোকনড্রিয়ায়। বিশেষ ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে কার্যের দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত (functionally related) এনজাইম সমূহ স্পষ্টতঃই মাইটোকনড্রিয়ার আভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যে একত্রে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ থাকে। এইরূপে, ক্রেবস্ সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের এনজাইম সমূহ এবং যে সকল এনজাইম জারণমূলক ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত তাদের যথাযথভাবে কাজ করবার জন্য পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্য প্রয়োজন বলে মনে হয়। আবার, মাইটোকনড্রিয় পর্দা (mitochondrial membrane) দিয়ে সকল সাবস্ট্রেট ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না, অতএব কার্বোহাইড্রেটের জারণমূলক এবং অ-জারণমূলক (non oxidative) বিপাক ক্রিয়ার মধ্যে নিশ্চিত রূপে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।

অপেক্ষাকৃত কম আণবিক ওজন বিশিষ্ট বহু যৌগ যেমন এটিপি (ATP), অজৈব ফসফেট, কোএনজাইম-এ এবং অ্যাসিটাইল কোলিন (acetyl choline) প্রভৃতিও কোষাভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ থাকে এবং কোষে এদের অবস্থানও সুনির্দিষ্ট। যেহেতু এনজাইম এবং তাদের সহপ্রভাবক সমূহ (cofactors) কোষের অদ্রাব্য অংশে আবদ্ধ থাকে, এবং কোষীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে এদের এই ভূমিকাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অতএব পরীক্ষানলে আমরা এনজাইমের যে ক্রিয়াকলাপ (enzyme activity) প্রত্যক্ষ করি তা দিয়ে কোষীয় বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের আলোচনা সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নয়। এনজাইম তন্ত্রের গঠন কাঠামো (structural organisations) তথা কোষীয় স্থাপত্যও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। যাহোক, এখন আমরা জানি বিক্রিয়ক সমূহের আপেক্ষিক ঘনত্ব কেবলমাত্র তাদের স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান এবং পারস্পরিক ব্যবধান (separation) দ্বারাই প্রভাবিত হয়, অতএব একথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে গঠন কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে (changes in structural organisation) বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপের বিভিন্নতা উদ্ভূত হয় মূলতঃ এনজাইমের ঘনত্ব বা সক্রিয়তার (enzyme activity) বিভিন্নতা হতে।

উপরের এই আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যে সকল যৌগের ঘনত্ব সবচাইতে কম অথচ চাহিদা সর্বাধিক তারাই সুসূক্ষ্মভাবে (with greatest sensitivity) কোষের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এটিপি এবং ডিপিএন-এর মত সহপ্রভাবকদের ঘনত্ব কম রেখে সমগ্র বিপাকক্রিয়ার (entire metabolism) হার ও অভিমুখ (rate and direction) উভয়ই নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা যায়; যদিও এইসকল প্রভাবকের নিঃশেষিত হতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। অবশ্য এর চাইতে কম সময়েও কোষ কোন কোন পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনায় (environmental stimuli) ক্রিয়াতৎপর হতে পারে। অতএব, আমরা এই জাতীয় প্রক্রিয়াকে 'গয়ংগচ্ছ প্রতিবোধের নিয়ন্ত্রণাধীন' (slow responding control) বলতে পারি।

সাবস্ট্রেট এবং সহপ্রভাবকদের পাওয়ার তারতম্য ঘটিয়ে বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও সক্রিয় এনজাইমটিরই সামগ্রিক পরিমাণ (total amount) পরিবর্তিত করে বিক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যা হোক, বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় (physiological state) কোষের এন-জাইমীয় ক্রিয়া তুলনা করবার সময় অবশ্যই দেখে নেব এনজাইম সক্রিয়তার পরিলক্ষিত হ্রাস বা বৃদ্ধি আগে থেকে বিদ্যমান (preexisting) কোন এনজাইম অণুর সক্রিয়তার পরিবর্তনের জন্য, না নতুন কোন অণুর সংশ্লেষণের জন্য হচ্ছে। এই সকল পরীক্ষার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সময় তথা 'সময়ের ব্যবধান'। স্বল্প অবকাশে যে পরিবর্তন (বিক্রিয়া) ঘটে 'নির্দ্ধারক' হিসেবে তার গুরুত্ব অনেক, কেননা এই পরিবর্তন খুব সম্ভবতঃ এনজাইম সক্রিয়করণ বা নিবারণ নির্দেশ করে। উদ্দীপনার মাধ্যমে কোষে সংঘটিত অতি দ্রুত 'অফ-অন' (off-on) প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবার জন্য 'এনজাইম এবং সাবস্ট্রেট পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে' এই সহজ সরল সত্যটি ছাড়িয়ে আমাদের আরো অনেকদূর এগোতে হবে। গঠন কাঠামোর সামান্য পরিবর্তন, যা এনজাইম-নিবারক (enzyme inhibitor)-কে সক্রিয়-রূপে (active form) বা সক্রিয়রূপ-কে নিবারকে রূপান্তরিত করতে পারে সেই সকল পরিবর্তনই সম্ভবতঃ এই দ্রুততর প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী।

এনজাইমীয় ক্রিয়ার ফীড-ব্যাক নিবারণ (Feedback Inhibition of Enzyme activity) ঃ

আমাদের এমন অনেক দৃষ্টান্ত জানা আছে যে ক্ষেত্রে কোষ-মুক্ত নির্যাসে (cell-free extract) এনজাইমীয় ক্রিয়া দেখানো সম্ভব কেবলমাত্র নিবারক (inhibitor) অপসারণের পর। এই সকল নিবারকের কিছু সংখ্যক হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে প্রোটিন এবং উত্তাপের সাহায্যে এদের নিষ্ক্রিয় (inactivated) করা সম্ভব। এনজাইম-অনুঘটিত কোন বিক্রিয়ায় বিক্রিয়াজাত পদার্থসমূহও নিবারক রূপে কাজ করতে পারে যদি তারা এনজাইমের সাথে দৃঢ় রূপে সংবদ্ধ থাকে ; এইসকল ক্ষেত্রে যতক্ষণ না উক্ত বিক্রিয়াজাত পদার্থ (product)-টি অপসারিত হচ্ছে ততক্ষণ এনজাইমটি নিজের এনজাইমীয় দিক থেকে নিষ্ক্রিয় (enzymatically inactive) থাকে। এতদ্ব্যতীত ঐ পদার্থটি (প্রোডাক্ট) পূর্ববর্তী কোন ধাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত এনজাইমকে নিবারিত করে বিপাকীয় ক্রিয়াপথ (metabolic pathway) নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিকে বলে **'ফীড ব্যাক নিবারণ'** (feedback inhibition)। জৈব সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কোন একটি বিশেষ পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে এই ফীড-ব্যাক নিবারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, দেখা গেছে ই. কলি ব্যাকটিরিয়াম (E. Coli) কর্তৃক হিস্টিডিনের জৈব সংশ্লেষণ অন্ততঃ দশটি ধাপে সম্পন্ন হয় এবং এর জন্য দরকার অন্ততঃ আটটি বিভিন্ন এনজাইম। ব্যাকটিরীয় কোষ গজাচ্ছে (growing) এমন কোন কালচারে (culture-এ) যদি হিস্টিডিন যোগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডটির (হিস্টিডিনের) জৈব সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং কোষ প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য বাইরের উৎস থেকে প্রাপ্ত হিস্টিডিন ব্যবহার করছে। কোষের এই হিস্টিডিন সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি অনুঘটিত করে যে এনজাইম হিস্টিডিন কর্তৃক তার নিবারণ সাধিত হয়। এইরূপে, ফীড ব্যাক নিবারণের মাধ্যমে কোষীয় যন্ত্র (cell's machinery) এবং শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থা একটি অতিরিক্ত কার্য থেকে অব্যাহতি পেল। যেহেতু, এক্ষেত্রে জৈবসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটিই নিবারিত হল অতএব, অবাঞ্ছিত অন্তর্বর্তী যৌগসমূহও আর সঞ্চিত হতে পারে না।

এই ফীড ব্যাক নিবারণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে তখন যখন একই অন্তর্বর্তী যৌগ থেকে গঠিত হয় দুটি অত্যাবশ্যক (essential) যৌগ। এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে লাইসিন এবং থ্রিওনিন সংশ্লেষণ। ১০-১নং চিত্রে এর বিক্রিয়াপথটি (pathway) সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডদ্বয়ের জৈবিকসংশ্লেষণের প্রথম ধাপটি হচ্ছে অ্যাস্পারটিক অ্যাসিডের ফসফোরাইলেশন দ্বারা অ্যাসপারটাইল ফসফেট (aspartyl phosphate) গঠন। দেখা গেছে লাইসিন এবং থ্রিওনিন উভয়েই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই পর্যায়ের প্রথম বিক্রিয়াটি আংশিকভাবে নিবারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে আংশিক নিবারণ ঘটে, তার কারণ হচ্ছে বিক্রিয়াটি অনুঘটিত হয় দুইটি
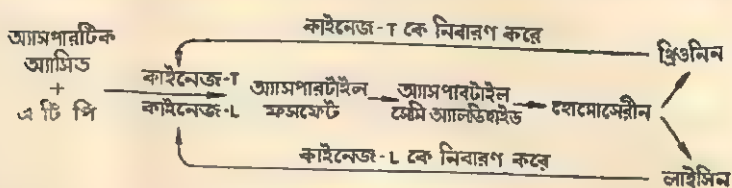
চিত্র ১০-১

ফীড ব্যাক নিবারণের সাহায্যে লাইসিন (lysire) ও থ্রিওনিন (threonine)-এর জৈবিক সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ।

স্বতন্ত্র কাইনেজ (kinase) এনজাইম দ্বারা; তার একটি লাইসিন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়, কিন্তু থ্রিওনিন দ্বারা নয়। তেমনি আবার দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় থ্রিওনিন দ্বারা, কিন্তু লাইসিনের কোন প্রভাব নেই ওর উপর। গবেষণা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে এনজাইমে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট স্থান (specific sites) আছে যেখানে অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয় এবং এর ফলস্বরূপ এনজাইমের গঠন ভঙ্গিমা (structure) এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে এনজাইমটির আর অনুঘটন-ক্ষমতা থাকে না। ফীড ব্যাক নিবারণে এটি হচ্ছে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর; কেননা একথা পরিষ্কার যে এখানে যদি একটিমাত্র অ্যাসপারটিক অ্যাসিড কাইনেজ থাকতো তাহলে অতিরিক্ত লাইসিনের উপস্থিতিতে কোষকে পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ থ্রিওনিন যোগাতে হতো এবং বিপরীত ক্রমেও একথা

সত্য। যাহোক, ভিন্ন গুণাবলী বিশিষ্ট দুইটি কাইনেজের সাহায্যে কোষ এই অ্যামিনো অ্যাসিডদ্বয়ের সংশ্লেষণ বিশেষ তৎপরতার সাথেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ফীডব্যাক নিবারণের মাধ্যমে এনজাইমীয় ক্রিয়ার এই নিয়ন্ত্রণকে জেকব এবং মোনো (Jacob and Monod) অ্যালোস্টেরিজম্ (allosterism) আখ্যা দিয়েছেন। কেননা এনজাইম অণুর যে স্থানে (site) সাবস্ট্রেট যুক্ত হয় উদ্দীপক বা নিবারক অণুর যুক্ত হওয়ার স্থান তা থেকে ভিন্ন। এনজাইমের এই অ্যালোস্টেরিক স্থান (allosteric site) প্রকৃতপক্ষে এনজাইমীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

এনজাইম সংশ্লেষণ ঃ প্রবৃত্তকরণ ও অবদমন ঃ

(Enzyme Synthesis : Induction & Repression :

অন্য আরেকটি উপায়েও সাবস্ট্রেট বা বিক্রিয়াজাত পদার্থ কোষের এনজাইমীয় ক্রিয়াকলাপ প্রভাবিত করতে পারে। এই প্রভাবন উক্ত পদার্থগুলির প্রোটিন সংশ্লেষণের উপর প্রভাব বিস্তারের দরুণ হয়ে থাকে। দেখা গেছে, যে পুষ্টিকারক রাসায়নিক পরিবেশে (nutritional chemical environment) জীব বেঁচে থাকে এবং বংশবিস্তার করে তার হেরফের ঘটিয়ে কোষে এনজাইমের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিভিন্ন অবস্থায় গজানো (grown) জীব কুলের সম্পর্কে গবেষণা করে জানা গেছে কোষের এনজাইমীয় গঠন সংযুতি (enzymatic composition) নির্ভর করে পরিবেশের পুষ্টিকারক দ্রব্যের উপর। জীবের বিশেষ কোন পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার সামর্থ্য এবং একটি সুনির্দিষ্ট বিপাকীয় ক্ষমতা (specific metabolic activity) অর্জন বংশবীজের গঠনের (genetic constitution) উপরও নির্ভর করে। যাহোক, যেহেতু জীবের সুনির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট জেনেটিক গঠন আছে তার মানেই এই নয় যে ঐ বিশেষ প্রোটিন বা এনজাইমটি কোষে স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট কয়েক জাতের ই কলি ব্যাকটিরিয়া (E Coli cells) গ্লুকোজ ও অ্যামোনিয়ার লবণ (যথাক্রমে কার্বন ও

নাইট্রোজেনের প্রাথমিক উৎসরূপে কাজ করে) ব্যবহার করে গজানোর সময় এই সকল কোষে অনুপস্থিত এমন অনেক এনজাইম সংশ্লেষণে সমর্থ হয়। এরকম একটি এনজাইম হচ্ছে বিটা-গ্যালাকটোসাইডেজ (beta-galactosidase), এটি বিটা-গ্যালাকটোসাইড বন্ধনীর (beta-galactoside bond) আদ্র'বিশ্লেষণ অনুঘটিত করে। দ্বি-শর্করা (disaccharide) ল্যাকটোজ বা দুগ্ধশর্করা হ'ল একটি আদর্শ (typical) সাবস্ট্রেট যা কার্বনের প্রাথমিক উৎসরূপে কাজ করতে পারে। ল্যাকটোজে দুটো হেক্সোজ শর্করা (hexose sugar) গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দ্বারা বিধৃত থাকে; ই কলি (E. Coli) কোষ অতি সহজেই গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজের বিপাকক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে, গ্লুকোজে গজানো কোন কোষে দুগ্ধশর্করা (ল্যাকটোজ) যোগ করা হলে কোষ কর্তৃক ওটির বিপাকক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ এক 'ল্যাগ-পিরিয়ড' (lag period) অতিবাহিত হয়। বেশ কিছু সময় বাদে অবশ্য কোষগুলি ল্যাকটোজ ব্যবহারের অর্থাৎ ল্যাকটোজের বিপাকক্রিয়া ঘটানোর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে এই আপাত অক্রিয় অবকাশে (ল্যাগ পিরিয়ড-এ) কোষ 'বিটা-গ্যালাকটোসাইডেজ' এনজাইমটি সংশ্লেষিত করে। পরীক্ষার ফলাফল থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে বিশেষ কিছু সাবস্ট্রেট (specific substrates) তাদের বিপাক ক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য নতুন ও সুনির্দিষ্ট এনজাইমসমূহের সংশ্লেষণে কোষকে প্রবৃত্ত (induce) করতে পারে। এই সকল এনজাইমদের বলা হয় উপজাত বা অভিযোজনক্ষম (inducible or adaptive) এনজাইম; অপরপক্ষে গ্লুকোজে গজানো কোষে সাধারণতঃ যে সকল এনজাইম স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান থাকে তাদের বলা হয় উপাদানমূলক (constitutive) এনজাইম। বর্দ্ধনশীল (growing) ই. কলি (E. coli) কোষে এনজাইম সংশ্লেষণের হার সীমিত পরিসরে যতটা প্রবৃত্তকারী পদার্থ বা ইনডিউসার যোগ করা হয়েছে তার পরিমাণের সাথে সমানুপাতিক হয়। এই উদ্বোধনা (induction) সম্পূর্ণ রূপে সুনির্দিষ্ট, কেননা কেবলমাত্র কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিটা-গ্যালাকটোসাইডই পারে কোষকে এনজাইম গঠনে প্রবৃত্ত করতে। আবার কিছু ইনডিউসার আছে যারা এনজাইম সংশ্লেষণ ক্রিয়া সম্পাদন করতে

পারে কিন্তু নিজেরা বিপাকিত হয় না। ইণ্ডাকশান প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত প্রণালী নিরীক্ষণ করবার জন্য এই সকল ইনডিউসারই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি ইণ্ডাকশান প্রক্রিয়া চলাকালীন সুনির্দিষ্ট মেসেঞ্জার আর এন এ (specific m-RNA)-র সংশ্লেষণ দেখানো সম্ভবপর হয়েছে। এ থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠেঃ ইনডিউসার কীভাবে সুনির্দিষ্ট মেসেঞ্জার আর এন এ-র সংশ্লেষণে কোষকে প্রবৃত্ত করে। একথা ব্যাখ্যা করতে জেকব এবং মোনো (Jacob and Monod) অপেরন তত্ত্বের ('Operon' theory) অবতারণা করেন।

জেকব এবং মোনো বলেন, সুস্পষ্টরূপে তিন ধরণের বংশবীজ (genetic element) আছে যারা একত্রে কাজ ক'রে সাবস্ট্রেট বা প্রবৃত্তকারী অণুর (inducer) উপস্থিতিতে এনজাইম সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়াপথে সুনির্দিষ্ট ক্রমে অংশগ্রহণ করে এমন একদল এনজাইমের জন্য (এনজাইম সংশ্লেষণের জন্য) প্রয়োজনীয় জেনেটিক নির্দেশ একটিই DNA-স্ট্র্যাণ্ডে সেই সুনির্দিষ্ট ক্রমেই সজ্জিত থাকে। এই 'গঠনমূলক বংশাণু ক্রম'ই (structural gene sequence) হল প্রথম ধরণের বংশবীজ। এই জীন-ক্রম একটি 'চালক-জীন' (operator gene) দ্বারা পরিচালিত হয়—দ্বিতীয় ধরণের এই বংশবীজ (genetic element)-টি প্রথমোক্ত জীন-ক্রমের একপ্রান্তে অবস্থিত থাকে এবং ঐ জীন-ক্রমের অন্ সুইচ্ (on-switch) রূপে কাজ করে। এই সমগ্র জীন-শ্রেণীকে একত্রে বলে অপেরন (operon)। তৃতীয় প্রকারের বংশবীজটি হ'ল একটি 'নিয়ামক জীন' (regulator gene); এই নিয়ামক জীনটি ওর অপেরনের থেকে ভিন্ন স্থানে (site) অবস্থিত হতে পারে (চিত্র ১০-২)। এবং এই জীনটি একটি অবদমনকারী অণুর (repressor molecule) সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ অবস্থায় অবদমনকারী অণুটি সর্বদাই তৈরী হয় এবং এর উপস্থিতিতে চালক জীনটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফল-স্বরূপ, ঐ 'গঠনমূলক জীন ক্রম'ও প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলি উৎপাদনের জন্য বার্তাবহ-RNA তৈরী করতে পারে না। একে বলে চালক-জীনের সুইচ্-অফ্ (switch off) প্রক্রিয়া : অর্থাৎ অবদমনকারী অণুটি চালক জীনকে অকেজো করে দিলে পুরো অপেরনটিই আর কাজ করতে পারে না—ফলে

m-RNA ও তৈরী হয় না, প্রোটিনও তৈরী হয় না। কিন্তু, সুনির্দিষ্ট ইন্‌ডিউসার (inducer) অণুর উপস্থিতিতে অবদমনকারী অণুটি নিজেই
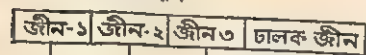
চিত্র ১০-২

জেকব-মোনোর অপেরন-তত্ত্ব

অকেজো হয়ে পড়ে এবং চালক-জীনের উপর অবদমনকারী প্রভাবও আর থাকে না। ফলে এই দুই ঋণাত্মক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে অপেরনটি আবার চালু হয়। কখনো কখনো সাবস্ট্রেট নিজেই ইন্‌ডিউসার রূপে কাজ করে। যেমন ই. কলি. (E. coli) ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট ল্যাকটোজ নিজেই ইন্‌ডিউসার রূপে কাজ করে এবং অবদমনকারী অণুকে অকেজো করে দিয়ে ল্যাকটোজ-বিভঞ্জনকারী (lactose-splitting) এনজাইম সমূহের সংশ্লেষণ শুরু করে দেয়। ফলস্বরূপ, ই. কলি. ব্যাকটিরিয়াকে ল্যাকটোজের উপস্থিতিতে গজানো

হলে খানিকটা ল্যাগ-পিরিয়ডের পর ব্যাকটিরিয়া ল্যাকটোজকে কার্বনের উৎস (carbon-source) রূপে ব্যবহার করতে পারবে, অর্থাৎ ল্যাকটোজের বিপাকক্রি সম্পন্ন করতে পারবে। কিন্তু, ল্যাকটোজের অনুপস্থিতিতে এই ব্যাকটিরিয় ল্যাকটোজ বিভঞ্জনকারী এনজাইম তৈরী করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে পূর্বে বর্ণিত বিক্রিয়াজাত পদার্থের নিবারণ প্রক্রিয়ার (produc inhibition phenomena) কথা আবার এসে পড়ে। আগেই আমরা দেখেছি যে এনজাইমের ক্রিয়ায় জাত পদার্থ দ্বারা এনজাইম সংশ্লেষণ নিবারণ কর যেতে পারে। অ্যামিনো অ্যাসিড আর্জিনিনের জৈব সংশ্লেষণের বিক্রিয়াপথ এবং আর্জিনিন কর্তৃক এনজাইম অর্ণিথিন ট্র্যান্সকার্ব্যামাইলেজ (ornithin transcarbamylase)-এর অবদমন এই বিষয়টি বিজ্ঞানীরা বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন—এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ১০-৩ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। 'আর্জিনিন ঘনত্ব' অধিক এমন কোন মাধ্যমে যখন ব্যাকটিরিয়
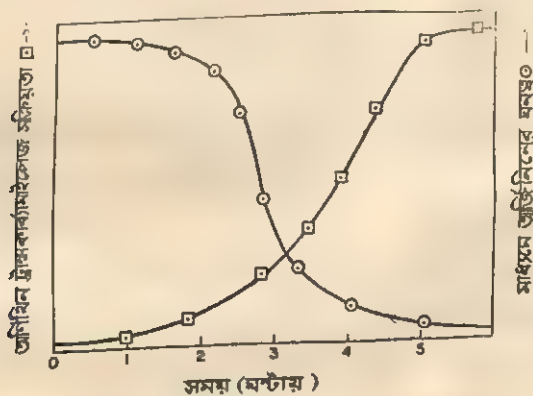
চিত্র ১০-৩

সাবস্ট্রেট কর্তৃক এনজাইম সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ (অবদমন)।

গজানো (cell growth) শুরু করা হয় তখন দেখা যায় যে মাধ্যমে এনজাই অর্ণিথিন ট্র্যান্সকার্ব্যামাইলেজের সক্রিয়তা (activity) খুবই কম থাকে যাহোক এই গজানোর সময় জীব প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য আর্জিনিন ব্যবহা করে এবং ফলস্বরূপ মাধ্যমে আর্জিনিনের ঘনত্ব কমে যায়। আর আর্জিনিনে ঘনত্ব যতই কমে, দেখা গেছে, অর্ণিথিন ট্র্যান্সকার্ব্যামাইলেজের সক্রিয়

(activity) ততই বাড়ে। এই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে আর্জিনিনের ঘনত্ব যখন কমের দিকে অর্থাৎ মাধ্যমে আর্জিনিনের ঘনত্ব যখন কমছে তখন অর্নিথিন ট্রান্সকার্বামাইলেজের সক্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ হল কোষ কর্তৃক এনজাইমটির বর্দ্ধিত হারে সংশ্লেষণ। অতএব, আমরা বলতে পারি যে আর্জিনিন অর্নিথিন ট্র্যান্সকার্ব্যামাইলেজের গঠনক্রিয়া দমন করে (represses)। এই প্রক্রিয়াটি ফীডব্যাক নিবারণ থেকে ভিন্ন ধরণের ;— এক্ষেত্রে কেবলমাত্র জৈব সংশ্লেষণের বিক্রিয়াপথটিই (biosynthetic pathway) বন্ধ হয়ে যায় না, উপরন্তু কোষ আর্জিনিন জৈব সংশ্লেষণের একটি ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমটিও তৈরী করতে পারে না।

এনজাইম সংশ্লেষণ সম্পর্কিত আমাদের আলোচনা এবং এই দৃষ্টান্তটি থেকে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে প্রবৃত্তকরণ এবং অবদমন (ইণ্ডাকশান এবং রিপ্রেসন) উভয়ে সমজাতীয় প্রক্রিয়া। এবং এখন একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এনজাইম-ইণ্ডাকশানকে জীবের এনজাইম গঠনকারী প্রক্রিয়ার অ-অবদমন (derepression) রূপেও বর্ণনা করা যেতে পারে। জেনেটিক পরিবর্তন অবদমন মুক্ত (release) করতে পারে অর্থাৎ জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অবদমনের প্রভাব এড়ানো যেতে পারে, আর অবদমন এড়ানো গেলে, দেখা গেছে, প্রবৃত্তকরণের (ইণ্ডাকশান) তখন আর কোন দরকার হয় না। পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে বলা যায় যে সুনির্দিষ্ট প্রোটিন বা এনজাইম সংশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য 'জেনেটিক-স্থানে' (genetic site) এক বা একাধিক পদার্থের যুক্ত হওয়ার দরুণ অবদমন সংঘটিত হয় ; কেননা 'সক্রিয় অঞ্চল' (active site) অন্য কোন পদার্থ দ্বারা অধিকৃত হয়ে থাকলে উক্ত প্রোটিন বা এনজাইম সংশ্লেষিত হতে পারে না। প্রবৃত্তকারী পদার্থ (inducer) সক্রিয় অবদমনকারী অণুর (repressor) সংশ্লেষণ ব্যাহত করে অথবা সরাসরি অবদমনকারীর সাথে যুক্ত হয়ে ওটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং এর ফলে জীন বিশেষ প্রোটিনটির সংশ্লেষণের জন্য সক্রিয় হতে পারে। সম্প্রতি দেখানো সম্ভব হয়েছে যে প্রবৃত্তকারী পদার্থ (inducer) একবার মেসেঞ্জার আরএনএ-র সংশ্লেষণ উদ্দীপিত করে দিলে এনজাইম সংশ্লেষণের জন্য ওর (প্রবৃত্তকারী পদার্থটির) আর প্রয়োজন হয় না ; এথেকে প্রমাণিত হয় রিপ্রেসর এবং ইনডিউসার উভয়েই নিউক্লিয়াসে ডি এন এ-র উপর কাজ করে। কোষীয় বিপাকক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ামনে (control

and regulation) ফীডব্যাক নিবারণ, অবদমন এবং প্রবৃত্তকরণ এই প্রক্রিয়াত্রয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জীবকুলের বিবর্তনে (evolution of organisms) এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অবশ্যই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন একটি বিশেষ সাবস্ট্রেটের বিপাকক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম জীব কর্তৃক কেবলমাত্র তখনই তৈরী হবে যখন সেই সাবস্ট্রেটটি জীবকোষে বর্তমান। বিশেষ পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট এনজাইম তৈরী করতে পারার এই যে সামর্থ্য (ability), অর্থাৎ এই সুবিধেটা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনমূলক (selective); কেননা এর ফলে কোষের বিভিন্ন উপাদান (parts of cell) সংশ্লেষণে শক্তি এবং বিপাক ক্রিয়াজাত পদার্থ সমূহের (metabolites) আরো সদ্ব্যবহার হতে পারে। অতএব, প্রবৃদ্ধ হতে পারার ক্ষমতা (Inducibility) কোষকে বিশেষ সুবিধে দেয়; যে সকল কোষ বিশেষ কোনো এনজাইম সংশ্লেষণ করতে পারে না তারা এই নির্বাচন-জাত সুবিধে থেকে বঞ্চিত হয়। এই বিশেষ সুবিধে ছাড়াও এনজাইম সংশ্লেষণের এই নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির ফলে কোষের প্রতি বিষক্রিয়া আছে যে সকল এনজাইমের তাদের অতিরিক্ত পরিমাণ (excess concentrations) উৎপাদন ব্যাহত হয়।

প্রোটিনের উপএকক ও এনজাইমের সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ—হরমোনের প্রভাব (Protein Subunits and Control of Enzyme Activity—The Effect of Hormones):

এনজাইম বা প্রোটিনের ক্রিয়া আরও একটি পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই পদ্ধতিটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই নির্ভর করে প্রোটিনের নিজস্ব আণবিক গঠন প্রকৃতির (molecular configuration) পরিবর্তনের উপর। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। দেখা গেছে, এনজাইম ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ একটি মাত্র পলিপেপটাইড শৃংখল (যা পেঁচানো অবস্থায় দ্বিতীয় পর্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা প্রাপ্ত হয়) নয়। বরং ওটি চারটি পরস্পর সংযুক্ত পলিপেপটাইড শৃংখল দ্বারা গঠিত। অতএব, বলা যেতে পারে ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ একটি টেট্রামার (tetramer) এবং একে পরিষ্কার দুই প্রকারের মোনোমার (monomers)-এ বিভক্ত করা যায়। এদের যথাক্রমে মোনোমার-এ এবং মোনোমার-বি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। যেহেতু একটি এনজাইম

অণুতে সর্বমোট চারটি মোনোমার থাকে, অতএব বিজ্ঞানীদের ধারণা উপযুক্ত পরিস্থিতিতে মোট পাঁচ প্রকারের ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ থাকা সম্ভব। এরা নিম্নরূপ ঃ LDH_5—এতে আছে চারটি 'এ-মোনোমার', কিন্তু কোন বি-মোনোমার নেই (A^4B^0)। তেমনি ভাবে LDH_4-এ আছে তিনটি এ-মোনোমার এবং একটি বি-মোনোমার (A^3B^1) ; LDH_3-তে দুটি 'এ' এবং দুটি 'বি' মোনোমার (A^2B^2) ; LDH_2-তে একটি 'এ' ও তিনটি 'বি' মোনোমার (A^1B^3) এবং LDH_1-এ আছে চারটি বি-মোনোমার কিন্তু কোন এ-মোনোমার নেই (A^0B^4)। সম্প্রতি LDH_5 (কেবল এ-মোনোমার দ্বারা গঠিত) এবং LDH_1 (কেবল বি-মোনোমার)-কে পরিশোধিত করে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং এদের একত্রে পরীক্ষানলে মিশিয়ে লবণের (salt) সাহায্যে মোনোমারে বিয়োজিত করে এবং তারপর এই মোনোমার গুলিকে পুনর্যোজিত (reassociate) হতে দিয়ে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে মূল (basic) পাঁচ প্রকারের
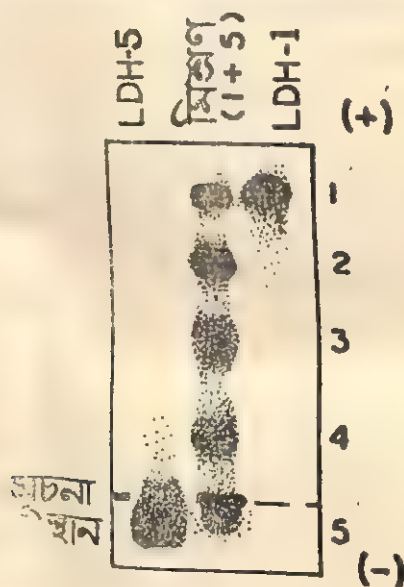
চিত্র ১০ ৪ ঃ
ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজের আইসোজাইম সমূহ

ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ এই মোনোমারগুলি থেকে গঠিত হতে

পারে। ১০-৪ নং চিত্রে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি স্টার্চ চিলতের সাহায্যে ইলেকট্রোফোরেসিস প্রক্রিয়ায় ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমগুলি পৃথক করা দেখানো হয়েছে। চিত্রের কালো মোটা দাগগুলি (dark bands) এনজাইমীয় সক্রিয়তা (enzymatic activity) নির্দেশ করছে। মোনোমার-বি দ্বারা LDH$_1$ গঠিত) অধিকতর ঋণাত্মকধর্মী হওয়ায় এটি ইলেকট্রোফোরেসিসের সময় ধনাত্মক তড়িদ্দ্বারের দিকে ধাবিত হয় এবং LDH$_5$-এর ধনাত্মক তড়িদ্ধর্মী এ-মোনোমার গুলি যায় ঋণাত্মক তড়িদ্দ্বারে। অন্যান্য LDH-গুলোর তড়িদ্ধর্ম মাঝামাঝি প্রকারের। দুই প্রকারের বিভিন্ন সংখ্যক উপএকক (subunits) দ্বারা গঠিত এই সকল LDH-কে বলা হয় আইসোজাইম (Isozymes)। এই সকল বিভিন্ন আইসোজাইমের ক্রিয়ামূলক তাৎপর্য্য (functional significance) নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং দেখা গেছে LDH$_1$ থাকে প্রধানতঃ হৃৎপিণ্ডে এবং আর কিছু পেশীকলায় (muscle tissue), পক্ষান্তরে LDH$_5$ থাকে মুখ্যতঃ কঙ্কাল পেশীতে (skeletal muscles)। অর্থাৎ LDH$_5$-এর ব্যাপক অবস্থিতি সেই সকল কলায় (tissues) যারা অক্সিজেনের অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বে কাজ করে (function) এবং ফলস্বরূপ ল্যাকটিক অ্যাসিড সঞ্চিত করে।

কলার আইসোজাইম সংযুতি (Isozyme composition) ভ্রূণবৃদ্ধির (embryonic development) সময় পরিবর্তিত হয়। এছাড়া, কতিপয় রোগ এবং হরমোনের সাহায্যে তার চিকিৎসার ফলে আইসোজাইম-সজ্জা (Isozyme-pattern) বদলে যেতে পারে। এল ডি এইচ (LDH)-সংযুতির এই প্রবৃদ্ধ পরিবর্তন (induced changes) বিভিন্ন আইসোজাইমের আপাত প্রতীয়মান কার্যকারিতার (apparent functional significance) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা আরো দেখিয়েছেন যে সুনির্দিষ্ট কলায় সুনির্দিষ্ট বিকারকের (specific agents) সাহায্যে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত পলিপেপটাইড সমূহের (related polypeptides) বিভেদক সংশ্লেষণ (differential synthesis) ঘটানো যেতে পারে। এই সকল বিকারক ঠিক কোথায় ক্রিয়া করে সরাসরি জীন পর্য্যায়ে (gene level) না জীন থেকে প্রোটিন এই পর্য্যায়ক্রমের অন্য কোন ধাপে তা এখনো সুস্পষ্ট রূপে জানা যায় নি।

সম্প্রতি বর্ণিত এর সাথে কতক পরিমাণে সদৃশ একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে

দেখানো হয়েছে যে প্রোটিনের সংস্থানগত ভঙ্গিমার পরিবর্তন (conformational changes) দ্বারা এনজাইমীয় ক্রিয়া (enzymatic activity) কেবলমাত্র গুণগত ভাবে (qualitatively) নয় পরিমাণগত ভাবে (quantitatively) ও পরিবর্তিত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, স্তন্যপায়ী জীবের যকৃতে প্রাপ্ত গ্লুটামিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমটি সাধারণতঃ চারটি উপএকক (subunits) দ্বারা গঠিত। এই এনজাইমটি যখন অনুরূপ মোনোমার গুলিতে বিয়োজিত হয় তখন তাদের আর গ্লুটামিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজের ক্রিয়া থাকে না, বরং তারা অ্যালানিন ডিহাইড্রোজেনেজের ক্রিয়া (alanine dehydrogenase activity) দেখায়। উপরন্তু, মোনোমারদের সমষ্টিগত অবস্থাও (state of aggregation) স্টেরয়ড হরমোনদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়। এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে কতিপয় হরমোন পলিপেপটাইডের পলিমার গঠন (polymerisation) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্রিয়া করতে পারে এবং এই উপায়ে কোষের বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। নতুন করে (de novo) প্রোটিন সংশ্লেষণ ছাড়াই এইরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতিশয় দ্রুততার সহিত বিক্রিয়ার উভমুখী পালাক্রম (very rapid reversible shift in function) সম্পন্ন করা যেতে পারে। স্টেরয়ড হরমোন (steroid hormones) ছাড়াও দেখা গেছে ডি পি এন এইচ (DPNH) এবং গুয়ানোসিন ট্রাই ফসফেটও এনজাইমের ব্যষ্টিকরণ (disaggregation) ত্বরান্বিত করতে পারে, পক্ষান্তরে এডিপি (ADP) সমষ্টিকরণ (aggregation) ত্বরান্বিত করে। এই সকল ক্ষুদ্রকায় অণুর প্রাপ্যতার (availability) সাথে কোষীয় বিপাকক্রিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত এবং প্রোটিনের পলিমার গঠনের (Protein Polymerisation) উপর তাদের মিথস্ক্রিয়া (interaction) ক্ষুদ্রকায় অণুদলের বিপাক এবং সুনির্দিষ্ট অতিকায় অণু সমূহের সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণের মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করে। এখন একথা ক্রমশই পরিষ্কার হচ্ছে যে সুনির্দিষ্ট প্রোটিনসমূহের 'সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ প্রণালী' এবং তাদের (প্রোটিনের) সংযুক্তি (association) বা ভিন্নক্রিয়াধর্মী একক সমূহে বিযুক্তি (dissociation) কোষের ক্রমবিকাশে (differentiation) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আর এমনও হতে পারে এই সকল প্রক্রিয়াই হয়ত প্রকৃতপক্ষে ক্রমবিকাশের জন্য মূলতঃ দায়ী।

যাহোক, এনজাইমীয় ক্রিয়ার হরমোনীয় নিয়ন্ত্রণ কিন্তু সর্বদা প্রোটিন

উপএকক সমূহের সংযুক্তি বা বিযুক্তির জন্য ঘটে না। যেমন, হরমোন অ্যাড্রিনালিন (adrenalin) দৃশ্যতঃ একটি এনজাইমের ক্রিয়া উদ্দীপিত করে যার ফলে গঠিত হয় একটি কোফ্যাকটর। এই কোফ্যাকটরটি আবার এনজাইম ফসফোরাইলেজের সক্রিয়করণের (activation) জন্য অপরিহার্য—এনজাইম ফসফোরাইলেজ আবশ্যক হয় গ্লাইকোজেন বিভজনের জন্য। যার ফলে, অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি (adrenalin glands) অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণের জন্য উদ্দীপিত হলে গ্রন্থি-নিঃসৃত অ্যাড্রিনালিন এনজাইম ফসফোরাইলেজের সক্রিয়তা (Phosphorylase activity) বাড়িয়ে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের বিভজন ত্বরান্বিত করে।

পর্দা-সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ (Control of membrane activity) ঃ

কোষীয় ভেদ্যতার (cellular permeability) সাধারণ বিষয়গুলি এবং কোষীয় পর্দার মধ্যে দিয়ে পুষ্টিকারক পদার্থসমূহের সক্রিয় পরিবহন (active transport) সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে সাবস্ট্রেট সমূহের সক্রিয় সঞ্চয়ের (active accumulation) জন্য কোষীয় শক্তি কাজে লাগাতে সক্ষম কোষীয় পর্দার অনুঘটকীয় একক গুলি (catalytic units) জেনেটিক নিয়ন্ত্রণাধীন। একটি উদাহরণ নেয়া যাক—আমরা জানি কিছু কিছু ব্যাকটিরীয় কোষে সুনির্দিষ্ট কিছু যৌগের বিপাকক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম থাকা সত্ত্বেও কোষগুলি ঐ পদার্থ সমূহ ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, কেননা ঐ পদার্থগুলি কোষীয় পর্দা অতিক্রম করে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট মিউটেন্ট সমূহ (specific mutants) পাওয়া সম্ভব হয়েছে যাদের পর্দা-সক্রিয়তা (membrane activity) কোন না কোন প্রকারে এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যার ফলে কোষগুলি সাবস্ট্রেট সংগ্রহ (accumulate) করতে সক্ষম হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে কোষ সাবস্ট্রেট সমূহের বিপাকক্রিয়া বেশ দ্রুত সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। কোষ পর্দার এই সক্রিয় পরিবহন তন্ত্রকে বলা হয় পারমিয়েজ এনজাইম তন্ত্র (permeases)। এনজাইম সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে অনেকটা সেই ভাবেই পারমিয়েজ তন্ত্র পারিপার্শ্বিক ও জেনেটিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়। তবে বর্তমানে একথা সুনিশ্চিত বলেই মনে হয় যে বিশেষ ক্রিয়াধর্মী এই পারমিয়েজ তন্ত্র কোষের বিপাকীয় এনজাইমদের থেকে সম্পূর্ণ

দেখানো হয়েছে যে প্রোটিনের সংস্থানগত ভঙ্গিমার পরিবর্তন (conformational changes) দ্বারা এনজাইমীয় ক্রিয়া (enzymatic activity) কেবলমাত্র গুণগত ভাবে (qualitatively) নয় পরিমাণগত ভাবে (quantitatively) ও পরিবর্তিত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, স্তন্যপায়ী জীবের যকৃতে প্রাপ্ত গ্লুটামিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমটি সাধারণতঃ চারটি উপএকক (subunits) দ্বারা গঠিত। এই এনজাইমটি যখন অনুরূপ মোনোমার গুলিতে বিয়োজিত হয় তখন তাদের আর গ্লুটামিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজেনেজের ক্রিয়া থাকে না, বরং তারা অ্যালানিন ডিহাইড্রোজেনেজের ক্রিয়া (alanine dehydrogenase activity) দেখায়। উপরন্তু, মোনোমারদের সমষ্টিগত অবস্থাও (state of aggregation) স্টেরয়ড হরমোনদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়। এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে কতিপয় হরমোন পলিপেপটাইডের পলিমার গঠন (polymerisation) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্রিয়া করতে পারে এবং এই উপায়ে কোষের বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। নতুন করে (de novo) প্রোটিন সংশ্লেষণ ছাড়াই এইরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতিশয় দ্রুততার সহিত বিক্রিয়ার উভমুখী পালাক্রম (very rapid reversible shift in function) সম্পন্ন করা যেতে পারে। স্টেরয়ড হরমোন (steroid hormones) ছাড়াও দেখা গেছে ডি পি এন এইচ (DPNH) এবং গুয়ানোসিন ট্রাই ফসফেটও এনজাইমের ব্যষ্টিকরণ (disaggregation) ত্বরান্বিত করতে পারে, পক্ষান্তরে এডিপি (ADP) সমষ্টিকরণ (aggregation) ত্বরান্বিত করে। এই সকল ক্ষুদ্রকায় অণুর প্রাপ্যতার (availability) সাথে কোষীয় বিপাকক্রিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত এবং প্রোটিনের পলিমার গঠনের (Protein Polymerisation) উপর তাদের মিথষ্ক্রিয়া (interaction) ক্ষুদ্রকায় অণুদলের বিপাক এবং সুনির্দিষ্ট অতিকায় অণু সমূহের সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণের মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করে। এখন একথা ক্রমশই পরিষ্কার হচ্ছে যে সুনির্দিষ্ট প্রোটিনসমূহের 'সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ প্রণালী' এবং তাদের (প্রোটিনের) সংযুক্তি (association) বা ভিন্নক্রিয়াধর্মী একক সমূহে বিযুক্তি (dissociation) কোষের ক্রমবিকাশে (differentiation) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আর এমনও হতে পারে এই সকল প্রক্রিয়াই হয়ত প্রকৃতপক্ষে ক্রমবিকাশের জন্য মূলতঃ দায়ী।

যাহোক, এনজাইমীয় ক্রিয়ার হরমোনীয় নিয়ন্ত্রণ কিন্তু সর্বদা প্রোটিন

উপএকক সমূহের সংযুক্তি বা বিযুক্তির জন্য ঘটে না। যেমন, হরমোন অ্যাড্রিনালিন (adrenalin) দৃশ্যতঃ একটি এনজাইমের ক্রিয়া উদ্দীপিত করে যার ফলে গঠিত হয় একটি কোফ্যাকটর। এই কোফ্যাকটরটি আবার এনজাইম ফসফোরাইলেজের সক্রিয়করণের (activation) জন্য অপরিহার্য—এনজাইম ফসফোরাইলেজ আবশ্যক হয় গ্লাইকোজেন বিভঞ্জনের জন্য। যার ফলে, অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি (adrenalin glands) অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণের জন্য উদ্দীপিত হলে গ্রন্থি-নিঃসৃত অ্যাড্রিনালিন এনজাইম ফসফোরাইলেজের সক্রিয়তা (Phosphorylase activity) বাড়িয়ে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের বিভঞ্জন ত্বরান্বিত করে।

পর্দা-সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ (Control of membrane activity) :

কোষীয় ভেদ্যতার (cellular permeability) সাধারণ বিষয়গুলি এবং কোষীয় পর্দার মধ্যে দিয়ে পুষ্টিকারক পদার্থসমূহের সক্রিয় পরিবহন (active transport) সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে সাবস্ট্রেট সমূহের সক্রিয় সঞ্চয়ের (active accumulation) জন্য কোষীয় শক্তি কাজে লাগাতে সক্ষম কোষীয় পর্দার অনুঘটকীয় একক গুলি (catalytic units) জেনেটিক নিয়ন্ত্রণাধীন। একটি উদাহরণ নেয়া যাক—আমরা জানি কিছু কিছু ব্যাকটিরীয় কোষে সুনির্দিষ্ট কিছু যৌগের বিপাকক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম থাকা সত্ত্বেও কোষগুলি ঐ পদার্থ সমূহ ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, কেননা ঐ পদার্থগুলি কোষীয় পর্দা অতিক্রম করে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট মিউটেন্ট সমূহ (specific mutants) পাওয়া সম্ভব হয়েছে যাদের পর্দা-সক্রিয়তা (membrane activity) কোন না কোন প্রকারে এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যার ফলে কোষগুলি সাবস্ট্রেট সংগ্রহ (accumulate) করতে সক্ষম হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে কোষ সাবস্ট্রেট সমূহের বিপাকক্রিয়া বেশ দ্রুত সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। কোষ পর্দার এই সক্রিয় পরিবহন তন্ত্রকে বলা হয় পারমিয়েজ এনজাইম তন্ত্র (permeases)। এনজাইম সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে অনেকটা সেই ভাবেই পারমিয়েজ তন্ত্র পারিপার্শ্বিক ও জেনেটিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়। তবে বর্তমানে একথা সুনিশ্চিত বলেই মনে হয় যে বিশেষ ক্রিয়াধর্মী এই পারমিয়েজ তন্ত্র কোষের বিপাকীয় এনজাইমদের থেকে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র ধরণের। অন্ততঃ ব্যাকটিরীয়ার ক্ষেত্রে একথা সত্য বলেই প্রতীয়মান হয় যে কোষ যে সকল জৈব পুষ্টিকারক দ্রব্য (organic nutrients) বিপাকিত করে তার অধিকাংশই অতি সুনির্দিষ্ট পারমিয়েশন তন্ত্রের মধ্যস্থতায় কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এমনকি উন্নততর জীবের ক্ষেত্রে যেমন মেরুদণ্ডী প্রাণীর (vertebrates) বেলাতেও যে কোষীয় পর্দায় একপ্রকার বাহকের (carriers) অস্তিত্ব আছে তার সপক্ষে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এই সকল বাহককে পৃথক করা ও তাদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীরা বর্তমানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়নের বিভেদক চলন (differential movement) কাজে লাগায় এমন একটি তন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে। যেহেতু সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের পরিবহন প্রণালী (transport process) এটিপি থেকে শক্তি পায়, অতএব বিজ্ঞানীদের ধারণা একটি এটিপি এজ (ATP ase) 'পরিবাহক এনজাইম' (transporting enzyme) রূপে কাজ করে। বস্তুত পক্ষে, পৃথকীকৃত (isolated) কোষ পর্দা নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে পরীক্ষা লব্ধ তথ্যাদি এই ধারণা সপ্রমাণ করে।

কোষীয় পর্দার সুনির্দিষ্ট পারমিয়েজ তন্ত্রসমূহ বৃদ্ধি (growth), সাবস্ট্রেটের সদ্ব্যবহার (substrate utilisation), এনজাইমের প্রবৃত্তকরণ বা অবদমন (enzyme induction or repression) এবং এমনকি এনজাইমের ফীডব্যাক নিবারণের জন্যও বহুসংখ্যক নিয়ামক প্রণালীর (regulatory mechanisms) উদ্ভাবন করে। যদিও সক্রিয় পরিবহন এবং কিছু সুনির্দিষ্ট পদার্থের সুনির্দিষ্ট বাহক সমূহ সম্পর্কে আমাদের বিশদ ভাবেই জানা আছে, তবুও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আণবিক স্তরে এই প্রক্রিয়া সমূহের অন্তর্নিহিত প্রণালী পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় নি। কিন্তু কোষ পর্দার মধ্যে দিয়ে আয়ন পরিবহন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে পরিবহন প্রক্রিয়ায় এটিপির মতোই একটি ফসফোলিপিডের (Phospholipid)ও বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। যাহোক, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা পরিষ্কার যে কোষ পর্দার অনুঘটকীয় গুণাবলীর পরিবর্তনের দ্বারা কোষাভ্যন্তরের (cell interior) রাসায়নিক সংযুতি নিয়ন্ত্রণ করা (regulation) সম্ভব। বৃদ্ধি, কোষ-বিভাজন এবং কোষীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে পারমিয়েজ সক্রিয়তার (permease activity) পরিবর্তনও একটি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। কোষাভ্যন্তরের অন্যান্য পর্দার ক্রিয়া এবং তাদের পুষ্টিকারক দ্রব্য পরিবহন ও সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানোর সামর্থ্যও কোষীয় বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কতকাংশে গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

আরো, আরো অনেক বাকী। রবার্ট হুকের 'কোষ' নিয়ে গবেষণা হয়েছে অনেক, আমরা জেনেছি অনেক কিছু, তবুও অনেক প্রশ্নের উত্তর রয়ে গেছে ভবিষ্যতের গহ্বরে।

আমরা বলি, কোষীয় ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ, নিয়ামন আর সমন্বয় সাধনের নায়ক হল 'মাস্টার মলিকুল' ডি এন এ। কিন্তু ডি এন এর প্রভুত্ব ঠিক কিভাবে প্রযুক্ত হয়ে সমস্ত কার্য সম্পাদন করে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার নয়। যে হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা ক্ষারক জুটি গঠিত হয়, কি প্ররোচনায় আবার সেই হাইড্রোজেন বন্ধনীই খুলে গিয়ে ডি এন এ-র স্ট্র্যান্ড দুটো আলাদা হয়ে যায়? কোনটিই বা আবার সেন্স স্ট্র্যান্ড হবে, আর কোনটিই বা নন্‌সেন্স স্ট্র্যান্ড? অর্থাৎ কোন স্ট্র্যান্ডটি জেনেটিক নির্দেশ পাঠাবে, আর কোনটি নিষ্ক্রিয় থাকবে, কি করে তা নিদ্ধারিত হয়? কখন ডি এন এ স্ট্র্যান্ড ডি এন এ তৈরীর জন্য টেমপ্লেট হবে আর কখনই বা বার্তাবহ আর এন এ তৈরী করবে?

কোষ বিভাজনেরই বা মূল কারণ কি? জীবকোষের ক্রমবিকাশ কেন বা ঠিক কিভাবে ঘটে? ক্যান্সার কোষ আর সাধারণ কোষের পার্থক্যের অন্তর্নিহিত কারণ কি? সংস্পর্শ জনিত নিবারণের অভাবে ক্যান্সার কোষের যে অপ্রতিহত বৃদ্ধি হয়ে চলে তারই বা আভ্যন্তরীণ পদ্ধতি কি? ক্যান্সার কোষের ক্রিয়াকলাপ আর তার জেনেটিক্‌স্‌ সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিস্ময় বিমূঢ় করে রেখেছে।

ভাইরাসজীন কি অদ্ভুত উপায়ে ব্যাকটিরীয় কোষের ডি এন একে পর্যুদস্ত করে দখল করে তার রাজত্ব? আর কেনই বা কখনো কখনো ভাইরাস জীন আশ্রয়দাতা কোষের ডি এন এ-র অঙ্গীভূত হয়?

এতসব হাজারো প্রশ্ন নিয়ে জীববিদ্যা আরো বেগবতী হচ্ছে, নতুন নতুন গবেষণা ক্ষেত্র খুলে যাচ্ছে, নতুন নতুন বিষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে, একটি প্রশ্ন থেকে জন্ম নিচ্ছে আরো অনেক প্রশ্ন। সৃষ্টির সমস্ত রহস্যই হয়তো লুকিয়ে রয়েছে এর অভ্যন্তরে। তাই আরো, আরো অনেক এগোতে হবে।

চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি ··· ··· ···।

চিত্রসূচী

চিত্রসূচী

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী ও ব্যবহৃত পরিভাষা